তফসীরে নূরুল কোরআন

একাদশ পারা

১১

মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম (র.)

একাদশ খন্ড

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

তফসীরে নূরুল কোরআন

একাদশ খন্ড

১১

একাদশ পারা

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, মাসিক আল-বালাগ, তফসীরকার রেডিও বাংলাদেশ, প্রাক্তন সদস্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বোর্ড অফ গভর্ণরস, সদস্য বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ড, মরহুম ইমাম ও খতীব, লালবাগ শাহী মসজিদ এবং বহু দ্বীনি গ্রন্থ প্রণেতা

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রহ.)

আল-বালাগ পাবলিকেশন্স

ঢাকা

চতুর্থ প্রকাশ ঃ জমাদিউল আউয়াল-১৪৩৯
জানুয়ারি-২০১৮
চৈত্র-১৪২৩

প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম

সর্বস্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণে ঃ নিউ এস. আর. প্রিন্টিং প্রেস
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০

হাদিয়া ঃ ৩০০.০০

প্রাপ্তিস্থান

আল-বালাগ কার্যালয়
১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড,
মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭

আন-নূর পাবলিকেশন্স
৫২, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল ঃ ০১৭১৩০১৪৮৮৯

গাউসিয়া পাবলিকেশন্স
১১, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা

Tafseer-e Nurul Quran (11): By Hazrat Moulana Mohammed Aminul Islam (R). Published by Al-Balag Publications. 12/17, Sir Sayed Ahmed Road. Mohammedpur, Block-A, Dhaka-1207, Mobile : 01713014889
Price : 300.00

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم.

ভূমিকা

অনন্ত অসীম দয়াময় আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীনের মহান দরবারে অগণিত শোকর যে, তিনি তফসীরে নূরুল কোরআনের একাদশ খন্ড পেশ করার তৌফিক দান করেছেন। তফসীরে নূরুল কোরআনের সাধনার প্রতি মুহূর্তেই এ সত্য উপলব্ধি করি যে, পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাকের করুণা-বৃষ্টি না হলে এ মহান কাজ আদৌ সম্ভব হতো না। তাই তফসীরে নূরুল কোরআনের একাদশ খন্ড প্রকাশিত হওয়ার এ শুভ লগ্নে আল্লাহ্ পাকের দরবারে পেশ করি সেজদায়ে শোকরানা, যদিও সারা জীবন সেজদায় রত থাকলেও শোকর গুজারী হক্ব কোন দিনও আদায় হবে না।

কোটি কোটি দরূদ ও সালাম হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, যাঁর শুভ দৃষ্টির সৌজন্যে আল্লাহ্ পাক তফসীরে নূরুল কোরআনের এ সাধনার তৌফিক দান করেছেন। হে আল্লাহ্! দরুদ পেশ কর হরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং তাঁর আল আওলাদের প্রতি। দুনিয়ার শুরু থেকে কেয়ামত পর্যন্ত যতবার বাতাস প্রবাহিত হয়েছে এবং হবে, যত বৃক্ষ পত্র, ফল, ফুল এবং ফসল আন্দোলিত হয়েছে এবং হবে, এবং যা কিছু পৃথিবীতে তুমি সৃষ্টি করেছ এবং করবে সে সবের সংখ্যা অনুসারে।

এ পৃথিবীতে মানুষের জীবন একটা সুদীর্ঘ তবে সুনিদৃষ্ট ভ্রমণ, তাই মানুষ মাত্রই এখানে পথিক মুসাফির। কোন শহরে একজন আগন্তুক পর্যটক আসলে যেমন সে শহরের সবকিছুই থাকে তার অজানা, ঠিক এভাবে প্রতিটি মানুষই আসে এ পৃথিবীতে আগন্তুক পর্যটকের ন্যায়। পর্যটক মাত্রকেই পথ প্রদর্শনকারীর সাহায্য গ্রহণ করতে হয়, অন্যথায় পথহারা হয়ে সমূহ বিপদের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন মানব জাতির জন্যে প্রেরণ করেছেন লক্ষাধিক নবী রসূলগণকে। অবশেষে আগমন করেছেন তাঁদের দলপতি, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর প্রতি নাযিল করেছেন বিশ্বগ্রন্থ পবিত্র কোরআন। বিশ্বমানবের সামগ্রিক কল্যাণ লাভের সুনিদৃষ্ট কর্মসূচী বর্ণিত হয়েছে পবিত্র কোরআনে।

এ কর্মসূচীর সঠিক বাস্তবায়নের মধ্যেই রয়েছে মানব জীবনের পরম সাফল্য নিহিত। পবিত্র কোরআনে প্রদত্ত কর্মসূচীর বাস্তবায়ন হাতে কলমে বুঝিয়ে দিয়েছেন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। অতএব, সমগ্র মানব জাতির জন্যে পথ প্রদর্শক হলেন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। আর পথ-নির্দেশিকা হল পবিত্র কোরআন। আধুনিক বিশ্বের এ চন্দ্রবিজয়ী সভ্যতার যুগে মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যার সঠিক সমাধান শুধু বিশ্ব-গ্রন্থ পবিত্র কোরআনেই রয়েছে। কেননা, পবিত্র কোরআনই মানুষকে সরল সঠিক পথের সন্ধান দেয়। যুগ-সমস্যার সমাধান পেশ করে, মানবতার উৎকর্ষ সাধনের পথ-নির্দেশ করে। মানুষকে আত্ম পরিচিতি লাভের সুযোগ এনে দেয় এবং আত্মসংশোধন করে তথা মনের পবিত্রতা অর্জন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নির্দেশনা দেয়। এভাবে মানব জীবন হয় সাফল্য মন্ডিত। প্রাক-ইসলামী যুগে আরব জাতির অস্তিত্ব ইতিহাসের পাতায়, সভ্যতার তালিকায় কোথাও অনুসন্ধান করে

পাওয়া যায়না। কিন্তু প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব এবং পবিত্র কোরআনের নাযিল হওয়ার ফলশ্রুতিতে মৃত-প্রায় আরব জাহানে নব জীবনের স্পন্দন অনুভূত হয়, ইতিহাসের ধারা পরিবর্তন হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণে পবিত্র কোরআনের আলোকে সেদিন শুধু যে রোগী আরোগ্য লাভ করেছে তাই নয়, বরং অসুস্থ ব্যক্তি মানবতার অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও মহান শিক্ষকের মর্যাদা লাভ করেছে। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ "আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রতুল্য, তোমরা তাদের মধ্যে যাকেই অনুসরণ কর হেদায়েত লাভ করবে"। এ কারণেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে সনদ প্রাপ্ত হয়ে সাহাবায়ে কেরাম পবিত্র কোরআনের মশাল হাতে নিয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েন এবং দিকে দিকে পবিত্র কোরআনের আলো বিতরণ করেন। সমগ্র বিশ্ববাসী সেদিন তাঁদের নিকট থেকে লাভ করেছিলো সভ্যতার প্রথম সবক এবং মানবতার সুশিক্ষা। ফলে মরণোন্মুখ মানুষ বেঁচে উঠলো। জুলুম-অত্যাচার, অন্যায়-অবিচারের অবসান ঘটলো। সত্য ও ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত হল। উন্নতি-অগ্রগতি–সমৃদ্ধির নবদ্বার উন্মুক্ত হল। সভ্যতা-সংস্কৃতি, তাহজীব-তামাদ্দুনের গোড়াপত্তন হল।

মূলতঃ এজন্যেই প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি এরশাদ করেছেনঃ

خيركم من تعلم القران وعلمه

"তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম, যে কোরআন শিখে এবং অন্যকেও শেখায়"।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাকের ফরমান হল এইঃ যে ব্যক্তি কোরআন শরীফের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকার কারণে জিকর করার এবং দোয়া ও মুনাজাত করার অবসর পায়না, আমি তাকে মোনাজাতকারীদের থেকে অধিকতর দান করি। আর সকল নেক কাজের উপর আল্লাহর কালামের ফজিলত এমন যেমন আল্লাহ পাকের ফজিলত রয়েছে সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপর। (শোয়াবুল ঈমান)

হযরত আবুজর (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজী পেশ করলাম যে আমাকে কিছু নসিহত করুণ। তিনি এরশাদ করলেন, তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন কর, এটি হল সকল নেক আমলের মূল ভিত্তি। আমি আরজ করলাম, আমাকে আরো কিছু নসিহত করুন। তিনি এরশাদ করলেন, পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াতের দিকে মনোযোগ দাও। কেননা, পবিত্র কোরআন দুনিয়াতে তোমার জন্যে নূর এবং আখেরাতে সম্বল।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মানুষের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহ পাকের আহল, (পরিবারভুক্ত) তথা তাঁর নিতান্ত নৈকট্য-ধন্য এবং আপন। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, আল্লাহ পাকের আপন কারা? তখন তিনি এরশাদ করলেন, যারা পবিত্র কোরআন নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তারাই আল্লাহ পাকের আহল তথা বিশেষ, নিতান্ত আপন বন্দা।

মুসনাদে দারেমীতে এই বর্ণনা সংকলিত হয়েছে। সাত আসমান সাত জমীন তথা সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে আল্লাহ পাকের কাছে সবচেয়ে প্রিয় হল কোরআনে করীম। যে ঘরে পবিত্র কোরআন পাঠ করা হয় সেখানে যেন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নসিহত করছেন। আর যে ব্যক্তি পবিত্র কোরআন শ্রবণ করছে সে যেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নসিহত শ্রবণ করছে। আর যে ব্যক্তি পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করছে সে যেন স্বয়ং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের সাথে কথা বলছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ নামাযে পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত নামায ব্যতীত তেলাওয়াত থেকে উত্তম। আর নামায ব্যতীত তেলাওয়াতে কোরআন তসবীহ এবং তকবীর থেকে উত্তম। আর তসবীহ পাঠ করা সদকা করা থেকে উত্তম। আর সদকা করা (নফল) রোজা থেকে উত্তম। আর রোজা হল দোযখ থেকে আত্মরক্ষা করার ঢাল।

বর্ণিত আছে যে, যখন মানুষের মৃত্যু হয় এবং আপনজনেরা তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত হয় তখন এক অতি সুন্দর সুপুরুষ তার নিকট আসে, যখন মৃত ব্যক্তিকে কাফন দেয়া হয় তখনও সে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির বক্ষের কাছে থাকে। যখন তাকে দাফন করা হয় তখন মুনকীর নকীর আসে এবং ঐ ব্যক্তিকে সরিয়ে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সওয়াল জওয়াব করতে চায়। তখন ঐ ব্যক্তি বলে এ হল আমার সাথী, কোন অবস্থাতেই আমি তাকে একা ছেড়ে যেতে পারিনা, তোমরা সওয়াল জওয়াব করার জন্য আদিষ্ট হয়ে এসেছো অতএব, তোমরা তোমাদের কাজ কর। আমি জান্নাতে পৌছানোর পূর্বে তাকে ছেড়ে যেতে পারিনা। এরপর ঐ ব্যক্তি তার সাথীর দিকে মনোনিবেশ করে বলে, আমি হলাম পবিত্র কোরআন যাকে তুমি কখনও উচ্চস্বরে পাঠ করতে আর কখনও নিম্ন স্বরে।

অতএব, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। মুনকীর নকীরের সওয়াল জওয়াবের পর তোমার আর কোন দুশ্চিন্তা থাকবে না। মুনকীর নকীরের সওয়াল জওয়াবের পর তার জন্যে বেহেশতী বিছানাপত্রের ব্যবস্থা করা হয়।

বস্তুতঃ পবিত্র কোরআনের এমনি ফজিলত ও মাহাত্ম রয়েছে বলেই অনেক সাহাবায়ে কেরাম সারারাত পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করতেন। হযরত ওসমান (রাঃ) কোন কোন রাত্রে এক রাকাআতে সমগ্র পবিত্র কোরআন খতম করতেন। এভাবে হযরত আবদুল্লাহ এবনে যোবায়ের (রাঃ) এক রাত্রে পবিত্র কোরআন খতম করতেন। হযরত সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে দু' রাকাআতে একবার কোরআন শরীফে খতম করেছেন। আর হযরত সাবেত বানানী (রহঃ) দিন রাতে পবিত্র কোরআন একবার খতম করতেন। আউলিয়ায়ে কেরাম বুজুর্গানে দ্বীনের এমনি আমলের বহু বিবরণ বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে যা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে পেশ করা সম্ভব নয়। আর শুধু তেলাওয়াতই নয়; বরং পবিত্র কোরআনের মর্মবাণীর প্রতি লক্ষ্য করে অনেক বুজুর্গানে দ্বীন জীবন অতিবাহিত করেছেন। স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একবার শুধু বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পাঠ করছেন ২০ বার।

(এবনে আবদুল বার)

হযরত আবুজর গেফারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একখানি আয়াত তেলাওয়াত করে সারারাত অতিবাহিত করেন। আয়াত খানি হল—

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

"হে আল্লাহ! যদি তুমি তাদেরকে শাস্তি দাও, দিতে পার কেননা তারা যে তোমার বন্দা, আর যদি তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর, তাও করতে পার, কেননা নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়"।

হযরত তমীম দারী (রাঃ) اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ আয়াতখানি সারারাত পাঠ করেন। আর ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) সূরা ইয়াসীনের আয়াত وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ সারারাত বার বার পাঠ করতে থাকেন।

এতে একথা উপলব্ধি করা যায় যে, পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহ তাঁদের মনে কেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো! বস্তুতঃ পবিত্র কোরআন এক অদ্বিতীয় মহান গ্রন্থ, যার প্রতিটি কথা সুস্পষ্ট, যুক্তিপূর্ণ, নিখুঁত, নির্ভুল, সুবিন্যস্ত, সুসজ্জিত, যা সারা পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত।

এখানে একথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা অতি সংক্ষিপ্ত সময়ে পৃথিবীর বিরাট এলাকায় বিস্তার লাভ করলো। এশিয়া, আফ্রিকা, এবং ইউরোপে পর্যন্ত পবিত্র কোরআনের আলোর বিকীরণ হল, অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপ আলোয় ঝলমল করে উঠলো। আজ থেকে সোয়া চৌদ্দশ' বছর আগে মক্কায়ে মোয়াজ্জমার অদূরে অবস্থিত হেরা গুহা থেকে পবিত্র কোরআনের এ আলো যাত্রা শুরু করেছিল। মদীনায়ে মোনাওয়্যারায় তার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। দামেস্ক ও মিশর প্রভৃতি স্থানে তার শাখা গড়ে উঠেছে। এরপর এই উপমহাদেশে এ আলো তার স্থান করে নিয়েছে।

উপমহাদেশে পবিত্র কোরআন

শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) উপমহাদেশে সর্বপ্রথম হিজরী ১১৫০ সনে পবিত্র কোরআনের ফার্সী ভাষায় তরজমা করেন। এরপর শাহ আবদুল কাদের (রঃ) ১২০৫ হিজরীতে উর্দুতে অনুবাদ করেন। এরপর উর্দু ভাষায় শাহ রফিউদ্দিন (রহঃ) ১২৩৩ হিজরীতে তর্জমা করেন। এরপর সর্বপ্রথম ফার্সী ভাষায় তফসীর লিপিবদ্ধ করেন শাহ আবদুল আজীজ (রহঃ), অবশ্য তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এভাবে শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) এবং তাঁর পরিবারবর্গের সম্মানিত সদস্যগণ উপমহাদেশে পবিত্র কোরআনের মহান বাণীর প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

যেভাবে আল্লামা জালালুদ্দিন সয়ূতী (রহঃ) আরবী ভাষায় সংক্ষিপ্ত তফসীর রচনা করেন ঠিক তেমনি উপমহাদেশে হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) উর্দু ভাষায় সংক্ষিপ্ত তফসীর রচনা করেন। আল্লামা শিব্বির আহমদ ওসমানী (রহঃ) ফাওয়ায়েদে ওসমানী রচনা করেও এ পর্যায়ে বিশেষ অবদান রাখেন। এরপর হযরত মওলানা ইদ্রীস কান্দলভী (রঃ), হযরত মুফতি শফী সাহেব (রহঃ), মওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রহঃ) প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম উর্দু ভাষায় পবিত্র কোরআনের তফসীর রচনা করেন।

কিন্তু বাংলা ভাষায় কোন মৌলিক, বিস্তারিত এবং প্রামাণ্য তফসীর গ্রন্থ ইতিপূর্বে রচিত হয়নি, শুধু উর্দু ভাষায় লিখিত কয়েকখানি তফসীরের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ! বিগত শাবান ১৪০৪ হিজরী মোতাবেক মে ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দে তফসীরে নূরুল কোরআনের প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়। আল্লাহ পাকের মহান দরবারে অগণিত শোকর যে, তিনি আজ এ মহান গ্রন্থের একাদশ খন্ড পেশ করার তৌফিক দান করেছেন। এই শুভ মূহূর্তে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে পেশ করি এই আরজী।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"হে পরওয়ারদেগার! কবুল কর আমাদের তরফ থেকে, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত"। হে আল্লাহ! এই মহান গ্রন্থকে সম্পূর্ণ করার তওফিক দান কর, এর মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের আলো বিকীরণের তওফিক দান কর, আমীন।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.

বিনীত–
মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
২১-৬-৯১ ইং

তফসীরে নূরুল কোরআন

(একাদশ খন্ড)

সূচিপত্র

বিষয় : পৃষ্ঠা

তফসীরে নূরুল কোরআন ১১
তফসীরুল কোরআন ১২
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ১২
মুনাফেকদের সম্পর্কে নির্দেশ ১২
তফসীরুল কোরআন ১৫
তফসীরুল কোরআন ১৯
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ১৯
শানে নুযুল ১৯
প্রাচীন ও অগ্রবর্তী কারা? ২১
সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন কে? ২১
সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম জান্নাতী ২৪
সাহাবায়ে কেরামের উচ্চ মর্তবা ২৪
তফসীরুল কোরআন ২৭
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ২৭
মুনাফেকদের শাস্তি ২৯
"সালাত" শব্দের অর্থ ৩৩
"সালাত" শব্দের ব্যবহার ৩৩
তফসীরুল কোরআন ৩৭
শানে নুযুল ৩৭
আলোচ্য আয়াতে কোন্ মসজিদের কথা বলা হয়েছে ৪৪
তফসীরুল কোরআন ৫০
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ৫০
শানে নুযুল ৫০
মদীনাবাসীদের মধ্যে যাঁরা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করলেন ৫০
হিজরতের নির্দেশ ৫৩
মোমেনদের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য ৫৭
তফসীরুল কোরআন ৬১
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্কে ৬১
শানে নুযুল ৬১
শানে নুযুল ৬৬
তফসীরুল কোরআন ৬৮

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ৬৮
তফসীরুল কোরআন ৭৩
খাঁটি তওবা ৭৪
তফসীরুল কোরআন ৮০
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ৮০
সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক ৮২
শানে নুযুল ৮৭
দ্বীনি এলমের অন্বেষণ নফল এবাদতের চেয়ে উত্তম ৪৯
এলমের উদ্দেশ্য ৪৯
তফসীরুল কোরআন ৯২
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ৯২
তফসীরুল কোরআন ৯৭
আ'মালে কোরআন ১০০
তাবুকের যুদ্ধের আরো কিছু ঘটনা ১০১
সূরা ইউনুস প্রসঙ্গে ১১৫
নামকরণ ১১৫
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক ১১৫
তফসীরুল কোরআন ১১৮
পবিত্র কোরআনের মাহাত্ম ১১৮
শানে নুযুল ১১৯
মোমেনদের জন্যে সুসংবাদ ১২১
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ১২৩
তত্ত্বজ্ঞানীদের অভিমত ১২৪
তফসীরুল কোরআন ১২৯
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ১২৯
আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের আহ্বান ১৩১
মৃত্যুর পর পুনর্জীবন ১৩২
আল্লাহ্ পাকের বিস্ময়কর কুদরত ও অসীম নেয়ামতের বিবরণ ১৩৩
তফসীরুল কোরআন ১৩৭
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ১৩৭
বেঈমানদের চারটি বৈশিষ্ট্য ১৩৭
মোমেনের বৈশিষ্ট্য ১৩৯
আয়াতের মর্মবাণী ১৪০
ঈমানদারদের জন্যে খোশখবরী ১৪২
জান্নাতে একটি কথাই যথেষ্ট হবে ১৪৩
যারা সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন ১৪৪

তফসীরুল কোরআন.. ১৪৭
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক.. ১৪৭
শানে নুযুল.. ১৪৮
তফসীরুল কোরআন.. ১৫৫
শানে নুযুল.. ১৫৫
পবিত্র কোরআন অলৌকিক.. ১৫৮
প্রিয়নবী (সাঃ)-এর বয়স.. ১৫৮
তফসীরুল কোরআন.. ১৬০
তফসীরুল কোরআন.. ১৬৭
শানে নুযুল.. ১৬৭
তফসীরুল কোরআন.. ১৭৩
তফসীরুল কোরআন.. ১৮১
তফসীরুল কোরআন.. ১৮৭
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক.. ১৮৭
তফসীরুল কোরআন.. ১৯২
পবিত্র কোরআন অলৌকিক, জ্যোতির্ময়.. ১৯৬
তফসীরুল কোরআন.. ১৯৮
তফসীরুল কোরআন.. ২০৪
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক.. ২০৪
প্রিয়নবী (সা.)-কে সান্ত্বনা.. ২০৪
দ্বীনি শিক্ষার দৃষ্টান্ত.. ২০৫
কাফেরদের পরিতাপ.. ২০৭
দুনিয়ার সম্পদ অতি সামান্য.. ২০৯
তফসীরুল কোরআন.. ২১১
তফসীরুল কোরআন.. ২১৭
পবিত্র কোরআনের বৈশিষ্ট্য.. ২২০
তফসীরুল কোরআন.. ২২৫
কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী.. ২২৬
আল্লাহ্ পাক মানব জাতির প্রতি অত্যন্ত দয়াবান.. ২২৭
আল্লাহ্ পাকের নিকট কোন কিছু গোপন নেই.. ২২৯
আল্লাহ্ পাকের এ বৈশিষ্ট্য বর্ণনার দু'টি উদ্দেশ্য.. ২২৯
তফসীরুল কোরআন.. ২৩১
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক.. ২৩১
আল্লাহর ওলীর পরিচয়.. ২৩২
বেলায়েতের মর্তবা লাভের পন্থা.. ২৩৪
আল্লাহর প্রিয় কে?.. ২৩৫

আল্লাহর ওলীগণের চিহ্ন ২৩৬
কাশ্‌ফ ও কারামত ২৩৭
সাহাবায়ে কেরামের জন্যে সু-সংবাদ ২৩৮
তফসীরুল কোরআন ২৪৪
কাফের মুশরেকদের ব্যাপারে চিরন্তন ঘোষণা ২৪৬
তফসীরুল কোরআন ২৪৮
নূহ (আঃ)-এর তুফান কোথায় হয়েছে ২৫৩
যারা রক্ষা পেয়েছিলেন তাদের সংখ্যা ২৫৩
তফসীরুল কোরআন ২৫৫
তফসীরুল কোরআন ২৬০
তফসীরুল কোরআন ২৬৪
বিপদ-মুক্তির জন্যে নামায ২৬৫
হযরত মূসা (আঃ) কখন বদদোয়া করেছেন ২৬৭
হযরত মূসা (আঃ) কেন বদদোয়া করেছেন? ২৬৮
তফসীরুল কোরআন ২৭০
আল্লাহ্ পাকের কুদরত ২৭৩
একটি ঘটনা ২৭৩
তফসীরুল কোরআন ২৭৫
যাঁরা নাজাত লাভে ধন্য হবেন ২৭৬
বনী ইসরাঈল ময়দানে তীহে ২৭৭
তফসীরুল কোরআন ২৮৪
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ২৮৪
কখন ঈমান গ্রহণযোগ্য হয় না ২৮৬
হযরত ইউনুস (আঃ)-এর ঘটনা ২৮৭
মাছের উদরে ইউনুস (আঃ) ২৮৮
সৃষ্টি মাত্রই আল্লাহ পাকের কুদরতের জীবন্ত সাক্ষী ২৯১
সত্য অবশ্যই জয়ী হবে ২৯২
তফসীরুল কোরআন ২৯৩
ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের পার্থক্য ২৯৪
তফসীরুল কোরআন ২৯৬
সূরা হুদ ২৯৭
সূরা হুদ প্রসঙ্গে ২৯৮
তফসীরুল কোরআন ২৯৮
পবিত্র কোরআনের বৈশিষ্ট্য ২৯৯
পবিত্র কোরআন নাযিল করার উদ্দেশ্য ৩০০
পাপাচার বিপদের কারণ হয় ৩০১
শানে নুযুল ৩০৩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمده ونصلي على رسوله الكريم.

তফসীরে নূরুল কোরআন

একাদশ খন্ড　　　　একাদশ পারা

يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ ؕ قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا لَنْ
نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ؕ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ
وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٤﴾ سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا
عَنْهُمْ ؕ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ؕ اِنَّهُمْ رِجْسٌ ۫ وَّمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَآءً
بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٥﴾

তরজমা

(৯৪) (হে রসূল!) আপনি যখন তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবেন, তখন তারা আপনার নিকট বাহানা পেশ করবে। আপনি তাদেরকে বলে দিন, বাহানা বা অজুহাত পেশ করোনা, আমরা তোমাদেরকে কখনো বিশ্বাস করবো না, আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে তোমাদের হাল-চাল জানিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহ্ পাক তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন এবং তাঁর রসূলও, এরপর তোমরা তাঁরই নিকট ফিরে যাবে যিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই জানেন এবং তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন।

(৯৫) যখন তোমরা তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তোমরা যেন তাদেরকে পাকড়াও না কর সেজন্যে তারা তোমাদের সম্মুখে আল্লাহ্ পাকের নামে শপথ করবে, অতএব, তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর, তারা অপবিত্র। তাদের কার্যকলাপের পরিণামে দোযখই তাদের ঠাঁই।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে মুনাফেকদের আলোচনা ছিল, যারা তাবুকের যুদ্ধে রওয়ানা হবার সময় বিভিন্ন ওজর-আপত্তি, টাল-বাহানা পেশ করে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যে আবেদন করে। আলোচ্য আয়াতে সেই মুনাফেকদের সম্পর্কেই আলোচনা স্থান পেয়েছে এবং এতে ভবিষ্যতের একটি খবর রয়েছে অর্থাৎ তাবুকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মুনাফেকরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট মিথ্যা অজুহাত পেশ করবে, আল্লাহ পাক পূর্বেই আলোচ্য আয়াত সমূহের মাধ্যমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তা জানিয়ে দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনের এ আয়াত সমূহে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, মুনাফেকরা আল্লাহর রসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) মদীনা মোনাওয়্যারায় প্রত্যাবর্তনের পর মিথ্যে অজুহাত পেশ করবে, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ

যখন তোমরা তাবুকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন মুনাফেকরা হাযির হয়ে মিথ্যে অজুহাত রচনা করে বলবে, হে আল্লাহর রসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আপনি দয়া করে আমাদের কথা বিশ্বাস করুন, আপনার সাথী হয়ে দুশমনের বিরুদ্ধে জেহাদ করার প্রবল ইচ্ছা আমাদের ছিল, আমরা জেহাদের সৌভাগ্য লাভের জন্যে অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের চরম আকাঙ্খা থাকা সত্ত্বেও আপনার সঙ্গী হতে পারিনি। এরপর আল্লাহ পাক মুনাফেকদের সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ প্রদান করেছেনঃ

قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ

মুনাফেকদের সম্পর্কে নির্দেশ

(হে রসূল!) আপনি বলুন, অজুহাত তৈরী করোনা, আমরা কোন অবস্থাতেই তোমাদেরকে বিশ্বাস করবনা। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তোমাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ যে সব মুনাফেক মিথ্যা ওজর-আপত্তি পেশ করে তাবুকের যুদ্ধে যায়নি, তাদের সংখ্যা ছিল ৮০। আলোচ্য আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানদেরকে। এতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, হে নবী! আপনি মুনাফেকদেরকে জানিয়ে দিন যে, তোমরা কোন মিথ্যে অজুহাত আমার নিকট পেশ করবেনা। আমরা তোমাদের কোন কথা বিশ্বাস করবনা। এ বাক্যের মাধ্যমে মিথ্যা ওজর পেশ না করার কারণ বর্ণিত হয়েছে কেননা, কোন ওজর বা কৈফিয়ত পেশ করার উদ্দেশ্য হল তা গ্রহণ করা। কিন্তু

যেহেতু আল্লাহ পাক পূর্বেই আমাদেরকে তোমাদের সম্পর্কে অবহিত করেছেন, তাই তোমাদের মিথ্যা কথা আমরা বিশ্বাস করবনা। আর তোমাদের কোন কথা শ্রবণও করবনা।

অতএব, অনর্থক মিথ্যা ওজর-আপত্তি পেশ করার চেষ্টা করোনা। এভাবে মিথ্যের বেসাতির মাধ্যমে পাপের ফিরিস্তি দীর্ঘ করোনা।

وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ.

অতএব, এখন শুধু ভবিষ্যতের কথা চিন্তা কর, ভবিষ্যতে তোমাদের কার্যকলাপই তোমাদের কথার সত্যতা প্রমাণ করবে। আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূল তোমাদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করবেন, আল্লাহ পাক মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু জানেন। তোমরা যদি তওবা করে প্রকৃত মুসলমান হও, তবে ভাল কথা আর যদি তোমাদের মুনাফেকী চরিত্রই অব্যাহত থাকে তবে তার শাস্তি অবধারিত। অবশেষে তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হতে হবে, যিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, তখন তিনি তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করবেন। তোমাদের আমল অনুসারেই হবে তোমাদের প্রতিদান।

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ

আল্লাহ পাক একথাও ঘোষণা করেছেন, যখন তোমরা মদীনা মোনাওয়্যারায় ফিরে যাবে তখন মুনাফেকরা মুসলমানদেরকে খুশী করার জন্যে আল্লাহর নামে শপথ করে বলবেঃ "বিশ্বাস করুন, এ অসুবিধে না হলে অবশ্যই আমরা জেহাদে গমন করতাম"। শুধু মুসলমানদেরকে খুশী রাখার নিমিত্তেই তারা এমন কথা বলত।

فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ

হে মোমেনগণ! তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর, তাদেরকে পাকড়াও করোনা, তাদের অবস্থায় ছেড়ে দাও, তাদেরকে ভর্ৎসনাও করোনা, কেননা ভর্ৎসনার উদ্দেশ্য হল তারা যেন তওবা করে, কৃত অন্যায়ের জন্যে লজ্জিত অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ক্ষমা প্রার্থী হয় এবং সরল সঠিক পথ অবলম্বন করে। কিন্তু এ মুনাফেকদের ব্যাপারে হেদায়েত গ্রহণের সম্ভাবনাই নেই কেননা, সঠিক পথ অবলম্বনের যোগ্যতা তারা হারিয়ে ফেলেছে।

اِنَّهُمْ رِجْسٌ

তারা অপবিত্র, তারা নীচ এবং তারা এত জঘন্য যে, তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপ করাই অনুচিত।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ কথাটির তাৎপর্য হল তাদের সাথে সর্ব প্রকার সম্পর্ক বর্জন করা। যেভাবে মানুষ অপবিত্র জিনিস থেকে নিজেকে দূরত্বে রাখে ঠিক তেমনি

যেহেতু তাদের অন্তর অপবিত্র তাই তাদের থেকেও নিরাপদ দূরত্বে থাকা কর্তব্য, যাতে করে তাদের মন্দ চরিত্রের প্রতিক্রিয়া থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয়।[১] এ বাক্যটিতে কারণ বর্ণিত হয়েছে পূর্ববর্তী আদেশের, আদেশ ছিল তাদেরকে উপেক্ষা কর, তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করোনা কেননা, তারা অপবিত্র, তাদের আমল অপবিত্র হওয়ার কারণে তারাও হয়েছে অপবিত্র। এ বাক্যটির দৃষ্টান্ত হলঃ

"মুশরেকরা নাপাক" إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ শেরক ও কুফরের কারণে মুশরেকরা যেমন অপবিত্র এ মুনাফেকরাও তাদের মুনাফেকী, ছল-চাতুরীর কারণে অপবিত্র।[২] আর তাদের শাস্তি অবধারিত।

وَّمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ

তাদের ঠিকানা হল দোযখ, আর তা তাদের কীর্তিকলাপের কারণেই। তাদের মুনাফেকী প্রতারণা এবং নাফরমানীর শাস্তি হবে দোযখ। অতএব, তাদেরকে ঐ শাস্তির অপেক্ষায় থাকতে দাও।

يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى
عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٩٦﴾ اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّ نِفَاقًا وَّ اَجْدَرُ اَلَّا
يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٩٧﴾ وَ
مِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّ يَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ
عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٩٨﴾

তরজমা

(৯৬) তারা তোমাদের নিকট শপথ করবে যেন তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও, অতএব, তোমরা যদি তাদের প্রতি সন্তুষ্টও হও, কিন্তু আল্লাহ পাক অবাধ্য সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না।

(৯৭) বেদুঈনরা কুফরী, নাফরমানী ও মুনাফেকীতে কঠোরতর এবং আল্লাহ পাক তাঁর রসূলের প্রতি যা নাযিল করেছেন তার সীমারেখা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা অধিকতর। আর আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

---

[১]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪২১
তফসীরে কবীর খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-১৬৪

[২]। তফসীরে ফতহুল কাদীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৯০

(৯৮) আর কোন কোন বেদুঈন এমনও আছে যারা আল্লাহ্ পাকের রাহে ব্যয় করাকে জরিমানা স্বরূপ মনে করে এবং তারা তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের অপেক্ষা করে। ভাগ্য বিপর্যয় তাদেরই হোক। আর আল্লাহ্ পাক সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

তফসীরুল কোরআন

মুনাফেকরা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার নিমিত্ত শপথ করবে, যেন তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও এবং তাবুকের এ ঘটনার পূর্বে তাদের সাথে যে ব্যবহার করতে, যুদ্ধের পরও যেন তোমরা অনুরূপ ব্যবহার কর।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক মুনাফেকদের করুণ অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন যে, মুনাফেকরা মুসলমানদেরকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে মিথ্যার আশ্রয় নিতেও দ্বিধা বোধ করবেনা, বরং যে কোন ভাবে তোমাদের ভর্ৎসনা থেকে রক্ষা পাওয়ার লক্ষ্যে চেষ্টা করতে থাকবে এবং এজন্যে তোমাদের নিকট শপথ করবে যেন তোমরা তাদের মুনাফেকী, ধোকাবাজি, ছল-চাতুরী ভুলে গিয়ে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাক। কিন্তু হে মোমেনগণ! মুনাফেকদের গোপন অবস্থা সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণে যদি তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্টও হও, তবুও আল্লাহ্ পাককে তারা ধোঁকা দিতে পারবেনা এবং আল্লাহ্ পাকের নিকট কোনভাবেই তাদের প্রকৃত অবস্থাকে গোপন রাখতে পারবেনা। তাই তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না। আর আল্লাহ্ পাক অসন্তুষ্ট থাকলে তাদের প্রতি তোমাদের সন্তুষ্টি কোন কাজে আসবেনা এবং দুনিয়াতে তাদের অপমান ও আখেরাতে তাদের কঠিন শাস্তি অবধারিত।

অতএব, হে মোমেনগণ! মুনাফেকদের বারবার শপথ করার কারণে তোমরা তাদেরকে বিশ্বাস করোনা, তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়োনা।

বস্তুতঃ যারা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ, তারাই ফাসেক সম্প্রদায়, তাদের দ্বারা তোমরা প্রতারিত হয়োনা এবং তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়োনা।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় একথাও বলেছেনঃ এর অর্থ হল হে মোমেনগণ! তোমাদের সম্মুখে মুনাফেকরা বারে বারে শপথ করে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে চায়, এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হল শুধু এতটুকু যে, দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে তারা যেন তোমাদের দ্বারা কোন প্রকার কষ্ট না পায়।[১]

তফসীরকারগণ এ আয়াতের মর্ম সম্পর্কে একথাও বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য হল মুনাফেকদের সাথে মোমেনদের সর্ব প্রকার সম্পর্ক রাখা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা, যেন কোন অবস্থাতেই তাদের মিথ্যে অজুহাত এবং মিথ্যা শপথের কারণে মুসলমানগণ তাদের কাছেও না আসে। শাহ্ আবদুল কাদের (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি সম্পর্কে যদি একথা জানা যায় যে সে মুনাফেক, তখন তার ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপ না করা বৈধ, কিন্তু তার সাথে প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা বৈধ নয়।[২]

---

[১]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪২১

[২]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৯৭

اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا

পূর্ববর্তী আয়াতে মদীনা শরীফের অধিবাসী মুনাফেক এবং মোমেনদের অবস্থার বিবরণ দেয়ার পর আলোচ্য আয়াতে গ্রাম্য লোকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। যারা গ্রামে বাস করে তাদের মধ্যেও তিন প্রকার লোকই রয়েছে। প্রকৃত মোমেন, কাফের এবং মুনাফেক। যারা বেদুঈন, গ্রাম্য এলাকার অধিবাসী তারা সাধারণতঃ শিক্ষা সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সুবিধে কমই পায়; ক্ষেত্রবিশেষে সম্পূর্ণ বঞ্চিতও হয়। তাই স্বভাবগতঃ কারণে তাদের মেজাজ থাকে রুক্ষ, আর এ কারণে তাদের কুফরী, নাফরমানী ও মুনাফেকী হয় কঠিনতর, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا

বেদুঈনরা কুফরী ও নাফরমানীতে খুবই শক্ত এবং কঠিনতর। আর আল্লাহ্ পাক তাঁর রসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন সেই বিধি-নিষেধ সম্পর্কে অবগত না হওয়ার অধিকতর যোগ্য।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ এর দ্বারা আল্লাহ্ পাক গ্রাম্য বেদুঈনদের মেজাজের রুক্ষতা সম্পর্কে খবর দিয়েছেন। তারা আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ বিধান সমূহ সম্পর্কে যে অবগত নয়; একথাও আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে।

এ পর্যায়ে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। আ'মাশ ইব্রাহীমের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একজন গ্রাম্য বেদুঈন যায়েদ এবনে সওহানের নিকট উপবিষ্ট ছিল। তিনি তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে তাঁর হাত কেটে গিয়েছিল, ঐ বেদুঈন তাঁকে বলল, তোমার কথা বড়ই মধুর, মনে হয় তুমি বড় ভাল মানুষ, কিন্তু তোমার হাত দেখে তোমার সম্পর্কে আমি সন্দিহান। হযরত যায়েদ বললেন, আমার কাটা হাত দেখে তুমি সন্দিহান কেন হয়েছ, এটিতো বাম হাত। তখন বেদুঈন বলল, আল্লাহর শপথ! আমি জানিনা যে চুরির শাস্তিস্বরূপ বাঁ হাত কাটা হয় কি ডান হাত। তখন যায়েদ এবনে সওহান বলে উঠলেন ঃ আল্লাহ্ পাক সত্যই বলেছেনঃ

اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ

"বেদুঈনরা কুফরী এবং মুনাফেকীতে অত্যন্ত কঠোর, আর আল্লাহ্ পাক তাঁর রসূলের প্রতি যে বিধান নাযিল করেছেন সে সম্পর্কে অবগত না হওয়ারই অধিকতর যোগ্য"।

একবার এক বেদুঈন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট একটি হাদিয়া পেশ করল। তার অন্তর সে পর্যন্ত সন্তুষ্ট হলোনা যে পর্যন্ত তার প্রদত্ত বস্তুর কয়েক গুণ বেশী তার নিকট প্রেরিত না হলো। তখন তিনি এরশাদ করেছেনঃ আমি এখন ইচ্ছা করেছি কোরায়শী, সাকাফী আনসারী এবং দুসী গোত্র ব্যতীত আর কারো হাদিয়া গ্রহণ করবনা। কেননা, তাহজীব-তমদ্দুন তথা মার্জিত রুচি এবং বিনম্র স্বভাব তাদের মধ্যে রয়েছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, কয়েকজন গ্রামীন বেদুঈন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে বলল, আপনারা কি ছোট ছেলেমেয়েদেরকে আদর সোহাগ করে চুম্বন করেন? সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তখন তারা বলল, আল্লাহর শপথ! আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে চুম্বন করিনা। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আল্লাহ পাকই যদি তোমাদের হৃদয় থেকে দয়া মায়া, স্নেহ মমতা বিদায় করে দেন তবে আমি কি করতে পারি। আল্লাহ পাক সে সব লোকদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত যারা এলম এবং ঈমানের যোগ্য। আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের মধ্যে অত্যন্ত হেকমতের সঙ্গে বিতরণ করেছেন জ্ঞান এবং মূখর্তা, ঈমান এবং কুফরী ও মুনাফেকী। আল্লাহ পাক তাঁর হেকমত অনুসারে যা করেন তার উপর কেউ কথা বলতে পারেনা।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ

আল্লাহ পাক তাঁর সমস্ত সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

حَكِيْمٌ

তিনি প্রজ্ঞাময়, দুনিয়া এবং আখেরাতে তাঁর বন্দাদের সঙ্গে যা কিছু করেন তা হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের মনের কথা সবই জানেন এবং তিনি যেসব বিধানকে অবশ্য কর্তব্য করেছেন তা অত্যন্ত হেকমতপূর্ণ।[২]

কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যেহেতু আল্লাহ পাক عليم তথা মহাজ্ঞানী, حكيم তথা সুবিবেচক, সূক্ষদর্শী, তাই প্রত্যেকের অবস্থান অনুযায়ী তার সাথে হয় তাঁর ব্যবহার।

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ

গ্রাম্য লোকদের মধ্যে কিছু কিছু লোক এমনও আছে তারা যদি কোন সময় অগত্যা আল্লাহর রাহে কিছু ব্যয় করে তবে তাকে নিতান্ত জরিমানা স্বরূপ মনে করে। অকুণ্ঠচিত্তে দান করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়না।

তফসীরকার আতা (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হল তারা নিতান্ত দায়ে পড়ে ভয়ে, অথবা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান খয়রাত করে। এতে তারা সওয়াবের আশা করেনা, আর দান খয়রাত না করলে আযাব হবে একথাও ভয় করেনা।

وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ

---

[১]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩-৪

[২]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-১৬৬

একদিকে বেদুঈনরা আল্লাহর রাহে দান করাকে অপ্রিয় মনে করে অন্যদিকে মুসলমানদের সম্পর্কে তাদের আন্তরিক আকাঙ্খা হল এই যে, মুসলমানগণ কালের আবর্তের শিকার হোক, তাদের অবস্থা বিপন্ন হোক, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর মাধ্যমে বা মুশরেকদের বিজয়ের মাধ্যমে। তাহলে মুসলমানদের ভয়ে দান করার প্রয়োজন আর থাকবেনা। এর জবাবে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ط

"কালের আবর্তে তারাই নিপতিত হবে"। মুসলমানদের ব্যাপারে মুনাফেকরা যে বিপদের আকাঙ্খা করছে তারা নিজেরাই সে বিপদে পড়বে। তাদের এ অন্যায় আকাঙ্খা তাদেরই ধ্বংস ডেকে আনবে। কেননা, কাল বলতে যা কিছু রয়েছে তা হল আল্লাহ পাকের নির্দেশ। সুখ, দুঃখ, ভাল-মন্দ সবই আল্লাহ্ পাকের নির্দেশক্রমেই হয়।

وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

আল্লাহ পাক সর্বশ্রোতা, তারা যা কিছু বলে সবই তিনি শ্রবণ করেন, শুধু তাই নয়; বরং তিনি عليم তাদের অন্তরের গোপনতম প্রকোষ্ঠে তারা যা কিছু গোপন রাখে তিনি সে সম্পর্কেও সম্পূর্ণ অবগত। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের সকল চক্রান্ত সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিফহাল।[১]

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ
قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ؕ اَلَاۤ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ؕ سَيُدْخِلُهُمُ
اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۹۹﴾ وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ
الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ
اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۰۰﴾

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-১৬৬
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৯২

তরজমা

(৯৯) আর কোন কোন বেদুইন এমনও আছে যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে এবং তারা যা ব্যয় করে তাকে আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য ও রসূলের দোয়া পাওয়ার উপায় মনে করে। মনে রেখ, নিশ্চয় তা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়, অচিরেই আল্লাহ্ পাক তাদেরকে অবশ্যই তাঁর রহমতে প্রবেশ করার তৌফিক দান করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমা-প্রিয়, তিনি অতীব দয়াময়।

(১০০) মোহাজের এবং আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা অতি যত্ন সহকারে তাঁদের অনুসরণ করে আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তিনি তাদের জন্যে জান্নাত তৈরী করেছেন যার নিম্নদেশে নির্ঝর-মালা প্রবাহিত, তারা চিরদিন সেখানে থাকবে, এটি বিরাট সাফল্য।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে বেদুঈন মুনাফেকদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে যে, তারা আল্লাহর রাহে দান করাকে জরিমানা স্বরূপ মনে করে। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে গ্রামীন লোকদের মধ্যে সকলেই কাফের বা মুনাফেক নয়, বরং তাদের মধ্যে কিছু প্রকৃত মোমেনও রয়েছে যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। আল্লাহর রাহে দান করাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায় এবং আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দোয়া পাওয়ার উপায় মনে করে। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম যখন আল্লাহর রাহে দান করার জন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু পেশ করতেন তখন তিনি তাদের কল্যাণের জন্যে দোয়া করতেন। যেমন হযরত আবু আওফা (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট যখন সদকা নিয়ে হাযির হলেন, তখন তিনি এভাবে দোয়া করলেনঃ

اللهم صل على ال ابى اوفى

"হে আল্লাহ! আবু আওফার পরিবারের প্রতি রহমত নাযিল কর"।[১]

শানে নুযুল

বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে কবিলা মোযাইনা, আসলাম, গেফার এবং জুহাইনিয়া সম্পর্কে, এ গোত্র সমূহের লোকেরা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখতো এবং সওয়াবের নিয়তে আল্লাহর রাহে দান খয়রাত করতো।

আল্লামা বগভী লিখেছেনঃ এবনে জরীর মুজাহেদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াত মোযাইনা গোত্রের মাকরান নামক ব্যক্তির পরিবারবর্গের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

---

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-১৬৭
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৯৮

কালবী (রহঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে তামীম, আসাদ এবনে খোজায়মা, হাওয়াজেন এবং গাতফানের বনী আসলাম, বনী গেফার এবং বনী জোহায়না গোত্রের লোকদের সম্পর্কে।[১]

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক গেফার গোত্রকে মাফ করে দিয়েছেন। অথবা বলেছেন আল্লাহ পাক গেফার গোত্রকে মাফ করুক এবং আসলাম গোত্রকে আল্লাহ পাক হেফাজত করেছেন। অথবা বলেছেন, হেফাজত করুক। আর আসীয়া গোত্র আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের নাফরমানী করেছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কোরায়শ, আনসার, জুহাইনা, মোযাইনা, গেফার তারা পরস্পর বন্ধু এবং ভাই, আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূল ব্যতীত তাদের কোন বন্ধু নাই।

বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের মহান বাণী পবিত্র কোরআন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনিন্দ্য-সুন্দর আদর্শ তাঁদের জীবনে এক অভূতপূর্ব ইনকেলাব এনে দিয়েছিল, ফলে তাদের অন্তরকে আল্লাহর প্রেমে মুগ্ধ মত্ত মাতোয়ারা করে রেখেছিল, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ط

তারা আল্লাহর রাহে দান করাকে একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করতো এ মর্মে যে, এর দ্বারা আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করা সম্ভব হবে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দোয়া পাওয়া যাবে।

اَلَآ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ط

অবশ্যই আল্লাহর রাহে দান করা তাঁর নৈকট্য লাভের কারণ হয়। এ সম্পর্কে তাদের ধারণা সঠিক আর এ নৈকট্য লাভের বরকতে তারা আরও যে নেয়ামত লাভ করবে তা হলঃ

سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ط

আল্লাহ পাক অচিরেই তাদেরকে তাঁর রহমত তথা জান্নাতে প্রবেশ করার তৌফিক দেবেন। কেননা, তারা হবে আল্লাহর নৈকট্য-ধন্য। তাই আল্লাহ পাকের রহমতের প্রাণকেন্দ্র জান্নাত হবে তাদের স্থান। নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৯২
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৯৮

পূর্ববর্তী আয়াতে শহর এবং গ্রামের অধিবাসী মুনাফেকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে সর্বপ্রথম যারা ইসলামের জন্যে জান মাল কোরবান করেছেন, আল্লাহর রাহে সত্য-সাধনায় অমর অবদান রেখেছেন, যাঁরা জীবন ও জীবনের যথাসর্বস্ব ইসলামের জন্যে উৎসর্গ করতে এতটুকু কুণ্ঠিত হননি–তাঁদের কথা এরশাদ হয়েছে। মোহাজের এবং আনসারদের মধ্যে যাঁরা ইসলামের খেদমতে অগ্রনায়কের ভূমিকা পালন করেছেন, যাঁরা নিজেদের বাড়ী-ঘর, এমনকি আত্মীয়-স্বজন-প্রিয়জন ও মাতৃভূমি পর্যন্ত এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছেড়ে চলে গেছেন তাঁরাই হলেন মোহাজের এবং যাঁরা এই ত্যাগী, আত্মোৎসর্গকারী মোহাজেরদেরকে আপন সহোদরের মর্যাদায় আসীন করে বুকে টেনে নিয়েছেন মদীনাবাসী সেই পূণ্যাত্মা সাহাবীগণকে বলা হয় আনসার। এরাই হলেন ইসলামের ইতিহাসে প্রাচীন এবং অগ্রবর্তী দল।

আর যাঁরা যত্ন সহকারে তাঁদের অনুসারী হয়েছেন তাঁদের সকলের প্রতিই আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও আল্লাহ পাকের দানে ধন্য হয়েছেন।

আল্লাহ পাক তাদের জন্যে এমন জান্নাত তৈরী করেছেন যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত। এ জান্নাতে তারা চিরদিন থাকবে, আর এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য।

প্রাচীন ও অগ্রবর্তী কারা?

আলোচ্য আয়াতে السّٰبقون الاولون, তথা প্রাচীন এবং অগ্রবর্তী দল যাঁদেরকে বলা হয়েছে তাঁদের সম্পর্কে তফসীরকারদের একাধিক মত রয়েছে। সাঈদ এবনে মোসাইয়্যাব (রঃ), কাতাদা (রঃ), এবনে সীরিন (রঃ) এবং তাবেয়ীনদের একটি দলের মতে, "সাবেকীন" বলতে তাঁদেরকে বোঝানো হয়েছে যাঁরা উভয় কেবলার দিকে নামায পড়েছেন।

আতা এবনে আবি রোবাহ-এর মতে, এর দ্বারা বদরী সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর শা'বী (রঃ)-এর মতে, ষষ্ঠ হিজরীতে অনুষ্ঠিত হোদায়বিয়ার চুক্তিতে যাঁরা শরীক হয়েছিলেন তাদেরকেই বলা হয়েছে "সাবেকীন"।

আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর দ্বারা শুধু সেই আট জন সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যাঁরা সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেছেন, তাঁরা হলেন হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত যায়েদ এবনে হারেসা (রাঃ), হযরত ওসমান এবনে আফ্‌ফান (রাঃ), হযরত যোবায়ের এবনে আওয়াম (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ), হযরত সাদ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) (এবং) হযরত তালহা এবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)।

সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন কে?

আল্লামা বগভী লিখেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সহধর্মিনী হযরত খাদিজা (রাঃ) সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেছেন একথা প্রমাণিত এবং এর উপর ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত। তবে তাঁর পরে সর্বপ্রথম কে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে একাধিক মত প্রচলিত রয়েছে।

হযরত যাবের (রাঃ) বলেছেন, হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর পর সর্বপ্রথম হযরত আলী (রাঃ) ইসলাম কবুল করেন। আর এ মতের সমর্থনে হযরত আলী (রাঃ) রচিত কবিতার একটি পংক্তি পেশ করা হয়। পংক্তিটি হলঃ

سبقتكم الى الاسلام طرا = غلاما ما بلغت اوان حلم

"আমি যখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক তখন তোমাদের সকলের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছি"।

মুজাহেদ এবং এবনে এছহাক বলেছেনঃ দশ বছর বয়সে হযরত আলী (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর পর সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর (রাঃ) ইসলাম কবুল করেছিলেন। এ মত পোষণ করেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং ইব্রাহীম নখয়ী ও আমের শা'বী (রঃ)। এ মতের সমর্থনে হাস্যান এবনে সাবেত (রাঃ)-এর কবিতা পেশ করা হয় যা তিনি হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর প্রশংসায় রচনা করেছিলেন। আর ঐ কবিতার বক্তব্য স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অনুমোদন করেছিলেন।

জুহরী এবং ওরওয়া এবনে যোবায়েরের মতে, হযরত খাদিজার (রাঃ) পর হযরত যায়েদ এবনে হারেসা (রাঃ) ইসলাম কবুল করেছিলেন।

এছহাক এবনে ইব্রাহীম হানজেলী উপরোক্ত বিভিন্ন মতের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেছেন হযরত আবুবকর (রাঃ) আর মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত খাদিজা (রাঃ) এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) এবং আযাদ করা গোলামদের মধ্যে হযরত যায়েদ এবনে হারেসা (রাঃ) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

এবনে এছহাক লিখেছেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে শুধু যে তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার কথা প্রকাশ করেছেন তাই নয়; বরং অন্যদেরকেও ইসলাম গ্রহণের জন্যে আহ্বান জানান। তৎকালীন সমাজে তিনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। কোরায়শের বংশধারা এবং অন্যান্য অবস্থা সম্পর্কে অধিকতর অবগত ছিলেন। তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁর ব্যবহার ছিল মধুর। তিনি দানবীর এবং পরোপকারী ছিলেন। তাঁর বুদ্ধিমত্তা, উদারতা এবং অন্যান্য গুণাবলীর কারণে মানুষ তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে তাঁর নিকট আসত। তিনি এ সুযোগে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত যোবায়ের এবনে আওয়াম (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ), হযরত সা'দ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ), হযরত তালহা এবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) তাঁরই অনুপ্রেরণায় ঈমান এনেছিলেন।

যখন তাঁরা সকলে মুসলমান হলেন, তখন তাঁদেরকে নিয়ে হযরত আবু বকর (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলেন। তাঁরা একত্রে নামায আদায় করলেন, এরপর আরো কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করলেন। এভাবে সাত বছরে মুসলমানদের সংখ্যা হল ৩৯। এরপর হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম কবুল করলেন। তিনি ছিলেন ৪০তম মুসলমান। হযরত ওমর (রাঃ) মুসলমান হওয়ার পর মুশরেকরা বললো,

আজ আমাদের শক্তি অর্ধেক হয়ে গেছে। এদিকে হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ করার কারণে ইসলাম শক্তিশালী হলো এবং সম্প্রসারিত হতে লাগলো।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, "সাবেকীনে আনসার" বলতে তাঁদেরকে বোঝানো হয়েছে যাঁরা লাইলাতুল আকাবায় গোপনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাতে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের সংখ্যা ছিল ৬ বা ৭। দ্বিতীয় বছর এভাবেই মদীনা শরীফ থেকে আগমনকারী ১২ জন লোক বয়আত করেন। তৃতীয় বছর মদীনা শরীফ থেকে আগমনকারীর সংখ্যা ছিল ৭০ জন। তাঁরা বয়আত করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আবু হজারা (রাঃ) এবং হযরত মাসআব এবনে উমায়ের (রাঃ)। তাঁরা মদীনা শরীফে পৌঁছে ইসলামের তবলীগ করেন এবং মানুষকে কোরআন শিক্ষা দেন। তাঁদের চেষ্টায় অনেক নারী পুরুষ ইসলাম কবুল করেন।

وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ

অর্থাৎ-আর যারা যত্নসহকারে তাদের অনুসরণ করেছে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় দু'টি অভিমত রয়েছে।

১. এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে অবশিষ্ট মোহাজের এবং আনসারদেরকে।

২. কেয়ামত পর্যন্ত যত মোমেন তাদের অনুসরণ করবে সবাই এর অন্তর্ভুক্ত।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে "সাবেকীন" অর্থ আল্লাহ পাকের নৈকট্য ধন্য সেই ভাগ্যবানেরা যাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক কোরআনে করীমে এরশাদ করেছেনঃ

وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ. اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ. فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ. ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ

এ আয়াতে ثُلَّةٌ তথা এক দল বলতে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবয়ে তাবেয়ীনকে বোঝানো হয়েছে, আর এরপর وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ এরশাদ হয়েছে। অর্থাৎ খুব সামান্য সংখ্যক লোক পরবর্তীতে আল্লাহর নৈকট্য-ধন্য হবেন। পরবর্তীকাল বলতে কি বোঝানো হয়েছে- এ সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এক হাজার বছর পর যারা আসবেন তাদের মধ্যে আল্লাহর নৈকট্য-ধন্য লোকের সংখ্যা হবে কম।

হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রহঃ) লিখেছেন, সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম, অধিকাংশ তাবেয়ীন এবং কিছু সংখ্যক তাবয়ে তাবেয়ীনের মধ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ হয়েছে।

وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ

সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম জান্নাতী

আবু সখর হোমায়েদ এবনে যিয়াদ বর্ণনা করেন, আমি মোহাম্মদ এবনে কা'ব কারযীর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আপনার কি ধারণা? তিনি বললেন, সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম জান্নাতী। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এর কোন দলিল আছে কি? তখন তিনি আলোচ্য আয়াত পাঠ করে বললেন, আলোচ্য আয়াতে মোহাজের ও আনসার সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে এরশাদ হয়েছেঃ

رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

(আল্লাহ সকলের প্রতি সন্তুষ্ট) তাঁদের ব্যাপারে কোন শর্তারোপ করা হয়নি। অতএব, তাঁরা সকলেই জান্নাতী। অবশ্য তাবেয়ীনদের ব্যাপারে এ শর্তারোপ করা হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ

অর্থাৎ যারা যত্ন সহকারে ভাল কাজে সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ করে। আবু সখর বললেন, আমার মনে হল আমি যেন সর্বপ্রথম এ আয়াত পাঠ করলাম। ইতিপূর্বে এ আয়াতের এ ব্যাখ্যা আমার জানা ছিল না।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের জান্নাতী হওয়ার আরো সুস্পষ্ট দলিল কোরআনে করীমে রয়েছে–

لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ اُولٰٓئِكَ

اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ط وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى

"যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে আল্লাহর রাহে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে এবং জেহাদ করেছে তাদের সমান সে সব লোক নয় যারা মক্কা বিজয়ের পর ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে এবং জেহাদ করেছে, প্রথম দল দ্বিতীয় দলের উপর উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ পাক উভয় দলের সঙ্গে জান্নাতের ওয়াদা করেছেন"।

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় (মর্তবায় পার্থক্য সত্ত্বেও) সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম জান্নাতী। আল্লাহ পাক সকলের সঙ্গে জান্নাতের অঙ্গীকার করেছেন। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে।

সাহাবায়ে কেরামের উচ্চ মর্তবা

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার সাহাবাদেরকে মন্দ বলোনা, শপথ সেই আল্লাহ পাকের! যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণ আল্লাহর রাহে দান করে তবে তা সওয়াবের দিক থেকে সাহাবাদের এক সের বা আধাসের খেজুর প্রভৃতির সমান হবেনা।

তিরমিজী শরীফে হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লাম এরশাদ করেছেন, সেই মুসলমানকে অগ্নি স্পর্শ করবেনা যে আমাকে দেখেছে অথবা যে আমার সাক্ষাত লাভকারীকে দেখেছে। তিরমিযী শরীফে হযরত বোবায়দা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার সাহাবাদের মধ্যে কেউ যদি শহরে বা গ্রামে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তবে কেয়ামতের দিন তাকে সেই এলাকাবাসীর নেতা এবং নূর বানিয়ে উঠানো হবে।

রাজীন হযরত ওমর (রাঃ) থেকে হাদীস সংকলন করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার সাহাবাগণ নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায়, তোমরা তাঁদের মধ্যে যাঁরই অনুসরণ করবে, হেদায়েত লাভ করবে।

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

আল্লাহ পাক তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

অর্থাৎ তাঁদের এবাদত বন্দেগী তিনি কবুল করেছেন এবং তাঁদের আমল সমূহ তিনি পছন্দ করেছেন।

وَرَضُوْا عَنْهُ

আর তাঁরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন অর্থাৎ আল্লাহ পাক সকলের প্রতিপালক এবং মালিক, ইসলাম তাঁদের জন্যে পরিপূর্ণ দ্বীন এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদের নবী ও রসূল– এসব কথা তাঁরা আন্তরিক ভাবে পছন্দ করেছেন, আল্লাহ পাক তাঁদের অন্তর সমূহে তাঁর নিজের, ইসলামের এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহব্বত ঢেলে দিয়েছেন, আর আল্লাহ পাক দুনিয়া এবং আখেরাতের যে সব নেয়ামত তাঁদেরকে দান করেছেন, তা পেয়েও তাঁরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন।

وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ

আর আল্লাহ পাক তাঁদের জন্যে এমন জান্নাত সমূহ তৈরী করেছেন যার নিম্নদেশে নির্ঝর-মালা প্রবাহিত, যেখানে তাঁরা চিরদিন থাকবে, এটি সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য, আর এভাবেই জীবন-সাধনা হবে পরিপূর্ণ ভাবে সার্থক, সুন্দর এবং সফলকাম।[১]

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৯৪-৯৭
তফসীরে কবীর খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-১৭০

﴿١٠٠﴾ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ؕ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ۛ
مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ۛ لَا تَعْلَمُهُمْ ؕ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ؕ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ
ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ﴿١٠١﴾ وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ
خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٠٢﴾ خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ
بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٠٣﴾
اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ
اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٤﴾ وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ
وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٥﴾ ع

তরজমা

(১০১) তোমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামীন লোকদের মধ্যে কেউ কেউ মুনাফেক রয়েছে এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও কেউ কেউ মুনাফেকীতে তৎপর। (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে জানেন না, আমি তাদেরকে ভালভাবেই জানি, আমি তাদেরকে দু'বার শাস্তি দেব, এরপর তারা মহা আযাবের প্রতি প্রত্যাগত হবে।

(১০২) এবং অপর কিছু এমন লোক রয়েছে, যারা নিজেদের গুনাহ্ স্বীকার করেছে, তারা একটি ভাল কাজের সঙ্গে একটি মন্দ কাজ মিশ্রিত করেছে। আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ক্ষমা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

(১০৩) তাদের ধন-সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন, এর দ্বারা তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং তাদেরকে এর দ্বারা সংশোধন করবেন আর তাদের জন্যে দোয়া করুন। (হে রসূল!) আপনার দোয়া তাদের জন্যে সান্ত্বনা, আর আল্লাহ্ পাক সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

(১০৪) তারা কি জানেনা যে, আল্লাহ্ পাক নিজেই তাঁর বন্দার তওবা কবুল করেন, যাকাত গ্রহণ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তওবা গ্রহণকারী, পরম করুণাময়।

(১০৫) (হে রসূল!) আপনি বলে দিন তোমরা আমল করতে থাক, ভবিষ্যতে আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূল ও মোমেনগণ তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন এবং অতি সত্ত্বর তোমরা তাঁর দরবারে প্রত্যাবর্তিত হবে, যিনি গোপন প্রকাশ্য সবকিছু সম্পর্কে অবগত। তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে তখন তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে শীর্ষস্থানীয় মোমেনগণের উল্লেখ ছিল। আর এ আয়াতে মুনাফেকদের কথা স্থান পেয়েছে যারা মুনাফেকীতে পারদর্শী এবং অটল ছিল, তারা মদীনা শরীফ ও তার উপকণ্ঠেই বাস করতো। মুনাফেকীতে তাদের দক্ষতা এত বেশী ছিল যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ন্যায় মহান জ্ঞানী সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিও তাদের সম্পর্কে অবগত হতে পারেননি। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

لَا تَعْلَمُهُمْ ط نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ

"(হে রসূল!) আপনি তাদেরকে জানেন না, আমি জানি"।

যেভাবে সে যুগের মোমেনগণ, কি মোহাজের কি আনসার, ইসলামের খেদমতে অগ্রনায়কের ভূমিকা পালন করেছেন ঠিক তেমনি এই মুনাফেকরাও ইসলামের শত্রুতায় সর্বাগ্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।[১]

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে আলোচ্য আয়াতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, প্রথমে মদীনা শরীফের মুনাফেকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, এরপর বেদুঈন মুনাফেকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এরপর এরশাদ হয়েছে, বেদুঈনদের মধ্যেও কিছু খাঁটি মুসলমান রয়েছে। এরপর মোমেনদের মধ্যে যারা শীর্ষস্থানীয়, যারা ইসলামী আন্দোলনের অগ্রনায়ক ছিলেন এবং ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে জীবন ও সম্পদ দিয়ে জেহাদ করেছেন, এমনকি সত্য ও ন্যায়ের জন্যে, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরা তাঁদের বাড়ী-ঘর তথা মাতৃভূমি ছেড়ে দিয়ে হিজরত করেছেন, তাঁদের কথা রয়েছে।

আর আলোচ্য আয়াতে মদীনা শরীফ ও তার উপকণ্ঠে যে সব মুনাফেক বাস করতো এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো তাদের আলোচনা স্থান পেয়েছে। এরা যেমন মুনাফেকীতে ছিল অটল তেমনি ছিল পারদর্শী, তারা এমনভাবে কথা বলতো যে, তাদের সঠিক পরিচয় পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল।[২]

আল্লামা এবনে কাসীর (রহঃ) হাফেজ এবনে আসাকেরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হারমালা নামক এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে

---

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪০১

[২]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-১৭৩

বলে, ঈমানতো এখানে, সে ইঙ্গিত করে তার রসনার দিকে আর মুনাফেকী হয় এখানে, সে ইঙ্গিত করে তার কলবের দিকে। আর আল্লাহ পাকের নাম সে এমনিতেই উচ্চারণ করে। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এভাবে দোয়া করেন– হে আল্লাহ! তার রসনাকে তোমার জিকরে মশগুল করে দাও। তার অন্তরকে তোমার শোকর গুজার বানাও। আর তাকে আমার মহব্বত দান কর। আর আমাকে যারা মহব্বত করে তাকে তাদের মহব্বতও দান কর, তার যাবতীয় বিষয় কল্যাণকর করে দাও। এ দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ব্যক্তির মুনাফেকী দূর হয়ে যায়, সে তখন বলে ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমার অধিকাংশ সাথীই মুনাফেক, আমিই ছিলাম তাদের নেতা, আমি কি তাদেরকে আপনার দরবারে পাকড়াও করে নিয়ে আসবো? তিনি এরশাদ করলেন, যে নিজে আসবে আমি তার মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করবো। আর যে মুনাফেকীতে অটল থাকবে তাকে আল্লাহ পাক দেখে নেবেন, তুমি কারো রহস্য উদঘাটন করোনা।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে মুনাফেকদের কথা বলা হয়েছে তারা হলো মোযায়না, যোহায়না, আসজায়া, আসলাম এবং গেফার গোত্রের মুনাফেক দল, এবনুল মুনজের একরামার সূত্রে একথাই লিখেছেন। এ গোত্রগুলো মদীনা শরীফের উপকণ্ঠে বাস করতো। আর মদীনা শহরেও কিছু মুনাফেক ছিল। আওস এবং খাজরাজ গোত্রের মধ্যে এ মুনাফেকরা ছিল। মুনাফেকীর ব্যাপারে এরা ছিল সিদ্ধহস্ত, দক্ষ তাই এরশাদ হয়েছেঃ মুনাফেকীতে তারা ছিল অটল– مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ। এবনে যায়েদ বাক্যটির অনুবাদ করেছেন, মুনাফেকীর উপর এরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তারা তওবা করেনি। আরবী ভাষাবিদদের মতে, যখন মানুষ কোন বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন তার সম্পর্কে এ বাক্যটি ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ হল মুনাফেকীতে তারা এমনভাবে অটল, অবিচল রয়েছে যে, সকল কল্যাণ তাদের থেকে দূরে সরে পড়েছে তথা সার্বিক কল্যাণ থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে।

لَا تَعْلَمُهُمْ

(হে রসূল!) আপনি অতি বুদ্ধিমান এবং অসাধারণ ধীশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এ মুনাফেকদেরকে চিনতে পারেননি।

نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ

আমি তাদেরকে জানি, কেননা আল্লাহ পাক মানুষের মনের গোপন প্রকোষ্ঠের খবর রাখেন, তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নাই। তাই তারা আল্লাহ পাককে ধোকা দিতে পারেনা।

سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ

"অচিরেই আমি তাদেরকে দু'বার শাস্তি দেব"।

---

[১]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১১, পৃষ্ঠা-৬

মুনাফেকদের শাস্তি

তফসীরকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একাধিক মত পোষণ করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, দু'বার শাস্তির ব্যাখ্যা হল, দুনিয়াতে রুগ্ন হওয়ার শাস্তি ও আখেরাতের আযাব। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, দুনিয়াতে মোমেনও রুগ্ন হয়, কিন্তু এ রোগের কারণে মোমেনের গুনাহ মাফ হয়। পক্ষান্তরে, মুনাফেক বা কাফেরদের ব্যাপারে এমন ব্যবস্থা নেই।

কালবী এবং সুদ্দী (রহঃ) হযরত আনাস এবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমআর খোৎবা দেয়ার সময় প্রত্যেকটি মুনাফেকের নাম ধরে ডাক দিয়ে বলেছেন, হে অমুক! মসজিদ থেকে বের হয়ে যাও, কেননা তুমি মুনাফেক। এভাবে সকলের সামনে দিয়ে অপমানিত হয়ে মসজিদে নববী থেকে তাদেরকে বের হতে হয়। এটি হলো প্রথম শাস্তি, আর দ্বিতীয় শাস্তি হবে কবরের আযাব।

তফসীরকার মুজাহেদ (রহঃ) বলেছেন, তাদের প্রথম শাস্তি হল বন্দী হওয়া এবং তাদেরকে হত্যা করা, আর দ্বিতীয় শাস্তি হল কবরের আযাব।

এবনে যায়েদ (রহঃ) বলেছেন, দুনিয়াতে তাদের জান ও মালের উপর যে বিপদ হয় তা হল প্রথম শাস্তি। মুজাহেদ (রঃ) থেকে আরেকটি কথাও বর্ণিত আছে। মুনাফেকদেরকে দু'বার দুর্ভিক্ষের আযাব ভোগ করতে হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে এ আযাবদ্বয়কেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আর কাতাদা (রহঃ) বলেছেন, মুনাফেকদের শরীরে ফোঁড়া দেখা দিয়েছিল। এটি ছিল প্রথম আযাব আর দ্বিতীয় আযাব হল কবরের আযাব।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে আরও একটি কথা বর্ণিত আছে। দুনিয়াতে শরীয়ত মোতাবেক যে শাস্তি তাদের উপর জারি হয় এটি হল প্রথম আযাব, আর দ্বিতীয়টি হল কবরের আযাব।

এবনে এসহাক বলেছেন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইসলামে প্রবেশ করা এবং ইসলামের সাথে শত্রুতা রাখা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে ইসলামে প্রবেশ করার কথা ছিল প্রথম আযাব আর কবরে হবে দ্বিতীয় আযাব।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, ফেরেশতাগণ যখন তাদের রুহ কবজ করবেন তখন তাদের চেহারা এবং পৃষ্ঠদেশে আঘাত করবেন, এটি হবে প্রথম আযাব। আর দ্বিতীয়টি হবে কবরের আযাব। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, মুনাফেকরা ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার জন্যে যে মসজিদে জেরার তৈরী করেছিল তা জ্বালিয়ে দেয়া ছিল প্রথম আযাব, আর দোযখের শাস্তি হবে দ্বিতীয় আযাব।[১]

সাঈদ কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত হোযায়ফা (রাঃ)-এর নিকট গোপনে ১২ জন মুনাফেকের পরিচয়

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-১৭৩-৭৪
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৯৯

দিয়েছিলেন, তাদের ছয় জনের সম্পর্কে তিনি এরশাদ করেছেনঃ তাদের জন্যে ফোঁড়া যথেষ্ট যা দোযখের অগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ হবে। এ স্ফুলিঙ্গটি তাদের কাঁধকে স্পষ্ট করে বক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, অর্থাৎ পেটের ব্যথা এবং অন্যান্য রোগে তাদের মৃত্যু হবে। আর অবশিষ্ট ছয় জনের স্বাভাবিক মৃত্যু হবে।

সাঈদ বর্ণনা করেন, (সে যুগে) যখন কোন লোকের মৃত্যু হতো এবং হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট সে ব্যক্তি সন্দেহ ভাজন হতো তখন তিনি হযরত হোযায়ফা (রাঃ)-এর দিকে দৃষ্টিপাত করতেন। হযরত হোযায়ফা (রাঃ) যদি জানাযার নামায আদায় করতেন তবে তিনিও নামায আদায় করতেন এই বিশ্বাসে যে, এই মৃত ব্যক্তি সেই ১২ জনের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যদি হযরত হোযায়ফা (রাঃ) জানাযার নামায আদায় না করতেন তবে তিনিও ঐ ব্যক্তির উপর জানাযা পড়তেন না।

ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ

এরপর তারা মহা আযাব তথা দোযখের আযাবের দিকে প্রত্যাগত হবে অর্থাৎ দোযখের আযাবে তারা নিপতিত হবে যা সময় এবং আযাবের কঠোরতার দিক থেকে মারাত্মক হবে।[১]

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ

পূর্ববর্তী আয়াত পর্যন্ত সে সব লোকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যারা তাবুকের যুদ্ধে মুনাফেকীর কারণে শরীক হয়নি। আর আলোচ্য আয়াত থেকে সেই মোমেনদের আলোচনা শুরু হয়েছে যারা মুনাফেকীর কারণে নয়, বরং সাহসিকতার অভাবে এবং মানবীয় দুর্বলতা, অলসতার কারণে তাবুকের যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। নিজেদের এ অনুপস্থিতির কারণে ছিলেন অত্যন্ত অনুতপ্ত ও লজ্জিত। যারা অলসতা বা গাফলতের কারণে তাবুকের যুদ্ধ শরীক হতে পারেননি তাদেরকে দু' ভাগে বিভক্ত করা যায়।

প্রথম ভাগ

সে সব লোক যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তাবুকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে নিজেদেরকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে এ শপথ করেছিলেন যে, যে পর্যন্ত স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর দস্তে মোবারকে আমাদের বাঁধন খুলে না দেবেন সে পর্যন্ত আমরা বাঁধা অবস্থাতেই থাকবো, আর এভাবেই আমরা শেষ হয়ে যাব।

দ্বিতীয় ভাগ

সেই সাহাবায়ে কেরাম, যাঁরা মুনাফেকদের মত কোন অজুহাতও পেশ করেননি এবং অন্য সাহাবায়ে কেরামের ন্যায় নিজেদেরকে খুঁটির সাথে বেধে নেননি, বরং যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাবুকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাঁর পবিত্র দরবারে হাযির হয়ে সত্য কথা আরজ করেন যে, আমরা তাবুকের যুদ্ধে শরীক না

---

[১]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১১, পৃষ্ঠা-৭

হয়ে অন্যায় করেছি, এজন্যে আমরা লজ্জিত। এ পর্যায়ে যে কোন আদেশ দান করুন, আমরা তা পালনে প্রস্তুত আছি। আলোচ্য আয়াত–

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ

প্রথম দলের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তাঁদের অবস্থা দেখে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, আল্লাহর শপথ! যে পর্যন্ত আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে আমাকে আদেশ দেয়া না হয় সে পর্যন্ত আমি তাদের বাঁধন খুলবো না। যখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হল তখন তিনি তাদের বাঁধন খুলে দিয়ে তওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ দিলেন। এরপর তাঁরা কিছু অর্থ-সম্পদ এনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির করলেন যেন তা আল্লাহর রাহে তিনি ব্যয় করেন। আর দ্বিতীয় দলের সম্পর্কে নাযিল হয়েছেঃ

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ. الاية

অর্থাৎ তাদের বিষয় এখন মুলতবী থাকবে, আল্লাহ্ পাক তাদের সম্পর্কে আদেশ দেবেন, ইচ্ছা করলে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন অথবা আযাব দেবেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে প্রথম দলে দশজন লোক ছিলেন। আর কেউ কেউ বলেছেন, আটজন ছিলেন, আর কেউ বলেন তিনজন ছিলেন। তবে সকলেই একমত যে, এঁদের মধ্যেই ছিলেন আবু লোবাবা এবনে আবদুল মুনজের (রাঃ)।[১]

প্রথম দল অনতিবিলম্বে তওবা করেছেন। তাই তাদের তওবা অবিলম্বে কবুল হয়েছে। আর দ্বিতীয় দল আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় ছিলেন। তাই তাঁদের সম্পর্কে পঞ্চাশ দিন পর আদেশ জারি হয়েছে। এই পঞ্চাশ দিন তাঁদের সাথে সালাম কালাম নিষিদ্ধ ছিল, এরা তিন ব্যক্তি ছিলেন, যাঁদের সম্পর্কে এ আয়াত–

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ

নাযিল হয়েছে। তাঁরা ছিলেন কা'ব এবনে মালেক, হেলাল এবনে উমাইয়া এবং মোরারা এবনে রাবী। তাঁরা নিতান্ত গাফলত বা অলসতার কারণেই তাবুকের জেহাদে শরীক হননি এবং তাঁদের ভুলের জন্যে তারা অনুতপ্ত ছিলেন এবং আল্লাহ্ পাকের দরবারে তওবা এস্তেগফার করে ক্রন্দন করতে থাকেন। এভাবে তাঁদের তওবা আল্লাহ্ পাকের দরবারে কবুল হয়।

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ

প্রথম দলের ব্যাপারে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, আর কিছু লোক এমনও আছে যারা তাদের গুনাহ স্বীকার করেছে অর্থাৎ তাবুকের যুদ্ধে শরীক না হওয়ার অপরাধকে স্বীকার করে নিয়েছে। তারা নিজেদের নেক আমলের সাথে মন্দ কাজকে মিশ্রিত করেছে।

---

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪০৩
তফসীরে রুহুল মা'আনী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১১

আলোচ্য আয়াতে নেক আমল বলতে ঈমান, নামায এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথী হয়ে যুদ্ধ করার কথাকে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। আর মন্দ কাজ বলতে তাবুকের যুদ্ধের অনুপস্থিতিকে বোঝানো হয়েছে।

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ط

"আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ পাক তাদের তওবা কবুল করবেন"।

اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়"।

এবনে জরীর, এবনুল মুনজের, এবনে আবি হাতেম, এবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী দালায়েলে হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাসের (রাঃ) সূত্রে এবং বায়হাকী সাঈদ এবনে মোসাইয়্যাবের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এরা ছিলেন ১০ জন। তন্মধ্যে আবু লোবাবাও ছিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যাবর্তন করলে তারা নিজেদেরকে মসজিদের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গমন পথেই তাঁরা ছিলেন। তিনি তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন এরা আবু লোবাবা এবং তাঁর সাথীগণ, যারা আপনার সঙ্গে জেহাদে গমন করেননি। তাঁরা আল্লাহ পাকের সঙ্গে অঙ্গীকার করেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাজী না হবেন এবং দস্তে মোবারকে আমাদেরকে খুলে না দেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এ অবস্থায়ই থাকবো। তাঁদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।

সাঈদ এবনে মোসাইয়্যাব (রঃ) বর্ণনা করেন, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবু লোবাবার বাঁধন খোলার জন্যে লোক প্রেরণ করলেন, তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, যে পর্যন্ত হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বহস্তে বাঁধন না খুলবেন সে পর্যন্ত আমি এ অবস্থায় থাকবো। অবশেষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদের বাঁধন খুলে দিলেন। এরপর তারা কিছু অর্থ সম্পদ সদকা হিসেবে পেশ করে এ আবেদন করলেন যে, আমাদের মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করুন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আমাকে তোমাদের অর্থ-সম্পদ গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়নি, তখন নাযিল হলো–

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

(হে রসূল!) তাদের নিকট থেকে সদকা গ্রহণ করুন, এ সদকা তাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্র করবে আর সদকা গ্রহণ করে তাদেরকে আত্ম সংশোধনে ব্রতী করুন, সদকা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের নেকী বৃদ্ধি পাবে, খাঁটি মোমেনদের মর্তবা বুলন্দ হবে।

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ط

(আর আপনি তাদের মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করুন) আল্লামা বগভী লিখেছেন, সদকা গ্রহণের সময় ইমামের কর্তব্য হল সদকা দাতার জন্যে দোয়া করা। আর কোন

কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এটি ওয়াজিব নয়; বরং মোস্তাহাব বা উত্তম। আর কেউ কেউ বলেছেন, যদি সদকা ওয়াজিব হয় তবে দোয়া করাও ওয়াজিব। আর যদি সদকা নফল হয় তবে দোয়া করাও মোস্তাহাব।

"সালাত" শব্দের অর্থ

এ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল দোয়া, রহমত, এস্তেগফার। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রশংসা। যখন সালাত শব্দের সম্পর্ক বন্দার সাথে হয় তখন তার অর্থ দোয়া এবং এস্তেগফার হয়। আলোচ্য আয়াতে শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একজন স্ত্রীলোক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার স্বামীর জন্যে দোয়া করুন। এ পর্যায়ে তিনি صـل শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। তার জবাবে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছিলেন।

'সালাত' শব্দটির সম্পর্ক যদি আল্লাহ পাকের সাথে হয় তবে এর অর্থ হবে রহমত এবং সন্তুষ্টি। যেমন হযরত কায়েস এবনে সা'দ বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ! সা'দ এবনে ওবাদার পরিবারের উপর তোমার সালাত এবং রহমত নাযিল কর। এমনিভাবে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ফেরেশতাগণ মোমেনের রূহকে বলেন, তোমার প্রতি এবং তোমার দেহের প্রতি আল্লাহর রহমত হোক। এভাবে এখানেও সালাত শব্দটি রহমত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

"সালাত" শব্দের ব্যবহার

এ শব্দটির ব্যবহার শুধু আম্বিয়ায়ে কেরামের জন্যে অথবা শুধু আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে খাছ। এজন্যে ইমাম মালেক (রহঃ) বলেছেন, আমার মতে আম্বিয়ায়ে কেরাম ব্যতীত আর কারো জন্যে সালাত শব্দটির ব্যবহার মকরূহ। আমাদের ইমাম সাহেব ইমামে আজম আবু হানিফা (রহঃ) এবং তত্ত্বজ্ঞানী ওলামাদের এক বিরাট দলের মতে, আম্বিয়ায়ে কেরাম ব্যতীত অন্য কারো জন্যে সালাত শব্দটির ব্যবহার জায়েয নয়। বিশেষতঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্মের কারণে শুধু তাঁর জন্যেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এজন্যে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আর কারো প্রতি সালাত প্রেরণ করা জায়েয নয়।

বায়হাকী বলেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) একথার অর্থ হল এই– শব্দটির ব্যবহার আম্বিয়ায়ে কেরামের শানে সম্মান সূচক হতে পারে, আর কারো সাথে নয়।

إِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ

"নিশ্চয় আপনার দোয়া তাদের জন্যে হবে সান্ত্বনা, তাদের জন্যে হবে রহমতের কারণ"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) "সাকান" শব্দটির অর্থ করেছেন রহমত। আর আবু ওবায়দা (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল মনের শান্তি ও সান্ত্বনা।

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি যদি তাদের জন্যে দোয়া করেন তবে তাদের ব্যথিত প্রাণ সান্ত্বনা পাবে। তারা এ সান্ত্বনা লাভ করবে যে, আল্লাহ্ পাক তাদের তওবা কবুল করেছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, যখন কোন নেককার ব্যক্তির দ্বারা কোন প্রকার গুনাহর কাজ হয় তখন তার অন্তর গুনাহর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সে ঐ অন্ধকার নিজেও উপলব্ধি করে, কিন্তু যখন আল্লাহ্ পাকের প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করেন, তখন তার মনের অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং তার অস্থিরতা ও ব্যাকুলতাও বিদায় নেয়।[১]

وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

আর আল্লাহ্ পাক সর্বশ্রোতা, তিনি তাদের অন্যায় স্বীকার করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং তাদের পক্ষে আল্লাহর রসূলের দোয়া সবই শ্রবণ করেন।

عَلِيْمٌ

কৃত অন্যায়ের জন্যে তাদের অন্তরে যে অনুতাপ রয়েছে সে সম্পর্কেও তিনি সম্পূর্ণ অবগত।

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, যারা গাফলতের কারণে তাবুকের যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি, যখন তাঁদের তওবা কবুল হল তখন মুনাফেকরা বলতে লাগলো গতকাল পর্যন্ত এরাও আমাদের সঙ্গে ছিল, কেউ তাদের সাথে কথা বলতো না এবং কেউ তাদের সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ রাখতো না অথচ হঠাৎ নতুন কি হল যে তারা আবার আপন হয়ে গেলেন, তারই জবাবে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا

অর্থাৎ তারা কি জানেনা যে, আল্লাহ্ পাক তাঁর বন্দাদের তওবা কবুল করেন আর তাদের থেকে সদকা কবুল করেন এবং তাঁর বন্দাকে স্বীয় রহমতের কোলে টেনে নেন, এটি তাঁর দয়া এবং করুণা মাত্র।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ শপথ তাঁর, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ! যে ব্যক্তি তার হালাল উপার্জন থেকে এক টুকরা সদকা করে আল্লাহ্ পাক তা তার ডান হাতে কবুল করেন এবং তাকে লালন-পালন করেন এমনকি, সদকার একটি খেজুর কেয়ামতের দিন ওহোদ পাহাড়ের সমান হয়ে আসবে। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াত—

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪০৪-০৫

اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ

পাঠ করেন। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফেও এই হাদীস সংকলিত হয়েছে।[১]

وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

আল্লাহ পাকই তওবাকারীর তওবা কবুল করেন, তিনি অত্যন্ত দয়াবান, দয়া মায়া এবং রহম করা তাঁরই শান, তাঁরই বৈশিষ্ট্য।

এ আয়াত সম্পর্কে এবনে আসাকের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। হযরত মাবিয়া (রাঃ)-এর যুগে লোকেরা জেহাদ করেছে, যাদের সেনাপতি ছিলেন আবদুর রহমান এবনে খালেদ এবনে ওয়ালিদ। তাঁদের মধ্যে এক ব্যক্তি যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ থেকে ১০০ দিনার সরিয়ে ফেলেছিলেন। যখন সৈন্যরা প্রত্যাবর্তন করে এবং সকলে নিজ নিজ বাড়ী-ঘরে চলে যায় তখন ঐ ব্যক্তি অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় এবং সেনাপতি আবদুর রহমানের নিকট ঐ ১০০ দিনার পৌঁছে দেয়। কিন্তু তিনি ঐ দিনার গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, লোকেরা বাড়ী-ঘরে চলে গেছে যাদের মধ্যে এ দিনার বিতরণ করা যেত। এখন তুমি এ দিনারগুলো কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের দরবারেই পেশ করবে।

অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের নিকটও সে এ ব্যাপারে আবেদন করে কিন্তু সকলে একই কথা বলেন। এরপর লোকটি আমীরে মাবিয়া (রাঃ)-এর নিকট হাযির হয়। কিন্তু তিনিও ঐ দিনার গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। তখন লোকটি ক্রন্দনরত অবস্থায় বের হলো। দেখা হলো আবদুল্লাহ এবনে সায়েফ আসসিকসির সঙ্গে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তোমার ক্রন্দনের কারণ কি?

সে ঘটনা বর্ণনা করলো। তখন আবদুল্লাহ বললেন, তুমি আমার কথা শ্রবণ করবে? সে বললো, অবশ্যই। তখন আবদুল্লাহ বললেন, তুমি আমীরে মাবিয়ার (রাঃ) নিকট পুনরায় যাও এবং এই আবেদন কর যে, এই ১০০ দিনারের এক পঞ্চমাংশ বায়তুল মালের অংশ হিসেবে আপনি গ্রহণ করুন আর বাকী ৮০ দিনার যা মুজাহেদদের মধ্যে বিতরণ করা হতো তা আল্লাহর রাহে তাঁদের পক্ষ থেকে দান করুন। কেননা আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ "তিনি বন্দাদের তওবা কবুল করেন"। আর আল্লাহ পাক ঐ মুজাহেদদের নাম ঠিকানা সবই জানেন। তিনি তাঁদেরকে সওয়াব পৌঁছে দেবেন। লোকটি তাই করলো। হযরত মাবিয়া (রাঃ) এরপর বলেছিলেন, যদি আমি এ ফতোয়া দিতাম তবে তা আমার এ ক্ষমতা প্রভাব-প্রতিপত্তি সব কিছু থেকে প্রিয় হতো। তিনি এ পন্থার অত্যন্ত প্রশংসা করেন।

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে সে সব লোকদের জন্যে যারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে, তাদের সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে

[১]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১১, পৃষ্ঠা-৯
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫ পৃষ্ঠা-৪০৬

ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা যা ইচ্ছা আমল করতে থাক, আল্লাহ্ পাক তোমাদের আমলকে পর্যবেক্ষণ করছেন। তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই। আল্লাহর রসূলও তোমাদের আমল দেখবেন এবং মোমেনগণও। তোমরা যা কিছু গোপন রাখছো সবই আল্লাহ্ পাক প্রকাশ করে দেবেন এবং সকল মুসলমান তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হবে।

وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ

আর অবশেষে তোমরা অচিরেই ফিরে যাবে আল্লাহ্ পাকের নিকট, যিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই জানেন এবং তিনিই তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে অবহিত করবেন।

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَاللّٰهُ
عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠٦﴾ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا
بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ۗ وَلَيَحْلِفُنَّ
اِنْ اَرَدْنَاۤ اِلَّا الْحُسْنٰى ۗ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٠٧﴾ لَا تَقُمْ فِيْهِ
اَبَدًا ۗ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ۗ فِيْهِ
رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴿١٠٨﴾ اَفَمَنْ اَسَّسَ
بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا
جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ
﴿١٠٩﴾ ﴿١٠٩﴾ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِىْ بَنَوْا رِيْبَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلَّاۤ اَنْ
تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١١٠﴾

তরজমা

(১০৬) এবং আল্লাহ্ পাকের আদেশের অপেক্ষায় কিছু লোকের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রইল, হয় তিনি তাদেরকে আযাব দেবেন অথবা তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ পাক মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

(১০৭) আর যারা একটি মসজিদ নির্মাণ করেছে জেদের ভিত্তিতে কুফরী ও নাফরমানীর কারণে, মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এবং যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের সঙ্গে পূর্ব থেকে যুদ্ধরত রয়েছে তাদের জন্যে গোপন ঘাঁটি স্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, তারা অবশ্য শপথ করে বলবে, আমরা অত্যন্ত মহৎ উদ্দেশ্যেই তা করেছি। আর আল্লাহ পাক সাক্ষী, নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।

(১০৮) (হে রসূল!) আপনি কখনও তাতে দাঁড়াবেন না, বস্তুতঃ যে মসজিদটি প্রথম দিন থেকেই তাকওয়া পরহেযগারীর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত সে মসজিদই আপনার দাঁড়াবার উপযুক্ত স্থান, তাতে এমন লোক রয়েছে যে, তারা পবিত্রতাকে অত্যন্ত বেশী পছন্দ করে। আর আল্লাহ পাক পবিত্রতা-প্রিয় লোকদেরকে ভালবাসেন।

(১০৯) যে ব্যক্তি তার গৃহের ভিত্তি স্থাপন করে তাকওয়া পরহেযগারীর উপর সে-ই উত্তম নাকি সে ব্যক্তি, যে তার গৃহ তৈরী করেছে এমন একটি গর্তের কিনারায় যা এখনই ভেঙে পড়তে চায় এবং তাকে নিয়ে জাহান্নামের অগ্নিতে পতিত হয়, আল্লাহ পাক জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।

(১১০) তাদের তৈরী ইমারতের দ্বন্দ্ব তাদের অন্তরে চিরকাল থাকবে। কিন্তু যদি তাদের অন্তরই বিদীর্ণ হয়ে যায় তবে তা স্বতন্ত্র কথা, আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ।

তফসীরুল কোরআন

মোমেনদের মধ্যে যারা অলসতার কারণে তাবুকের যুদ্ধে শরীক হননি তাঁদের দ্বিতীয় দলের কথা আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে। প্রথম দলের ন্যায় তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে মসজিদের খুঁটির সাথে নিজেকে বেঁধে নেননি। আর মুনাফেকদের মত মিথ্যা ওজর-আপত্তিও পেশ করেননি, বরং সত্য কথা বলেছেন, অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছেন।

শানে নুযুল

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, তাঁরা ছিলেন তিনজন, কা'ব এবনে মালেক, মোরারা এবনে রাবী এবং হেলাল এবনে উমাইয়া। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন তাবুকের যুদ্ধের জন্যে রওয়ানা হলেন তখন কা'ব বলেছিলেন, আমি দ্রুত সফর করে যে কোন সময় হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে একত্রিত হতে পারবো। এভাবে আজ-কাল করে সফর শুরু করলেন না এবং অবশেষে আর তাঁর পক্ষে তাবুক যাওয়া সম্ভব হলোনা। তাঁর অপর দু' সাথীও তাবুকের যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন হযরত কা'বকে বলা হল তুমি তোমার ওজর পেশ কর। তিনি বললেন, কি ওজর পেশ করবো? কোন ওজরই নেই, অন্যায় করেছি আল্লাহ পাক যেদিন তওবা কবুল করবেন সেদিনই দরবারে নববীতে হাযিরী দেব। অবশিষ্ট দু'জন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলেন। তিনি জিজ্ঞাসা

করলেন, কি কারণে তোমরা জেহাদ থেকে বিরত রইলে? তারা বললেন, কোন কারণ বা ওজর কিছুই নেই, আমাদের দ্বারা গুনাহ্ হয়ে গেছে তখন এ আয়াত–

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ

নাযিল হয়। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সকল মুসলমানকে নির্দেশ দিলেন, এই তিনজনের সাথে বয়কট করতে এমনকি, তাঁদেরকে আদেশ দিলেন যে, তাঁদের স্ত্রীগণও তাঁদের সঙ্গে থাকবেনা। তখন হেলাল এবনে উমাইয়ার স্ত্রী এসে আরজ করলেন, আমি কি তাঁর নিকট তাঁর খাবার পৌঁছাতে পারবো? তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ মানুষ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিশেষভাবে অনুমতি দান করলেন। এ অবস্থায় তাঁরা তিনজন আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্রন্দন করতে থাকলেন। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ দিন যাবত তাদেরকে অনিশ্চয়তার মধ্যে অতিবাহিত করতে হয়। এরপর তাঁদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করা হয়।[১] নাযিল হল–

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ এবং وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ ط خُلِّفُوْا حَتّٰٓى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ

পরবর্তী রুকুতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ

"আর কিছু লোক রয়েছে যাদের ব্যাপার আল্লাহ্ পাকের আদেশের অপেক্ষায় মুলতবী রয়েছে, হয় তিনি তাদেরকে আযাব দেবেন অথবা তাদেরকে ক্ষমা করবেন"।

মূলতঃ আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করলে যে কোন ক্ষুদ্র গুনাহর জন্যে শাস্তি দিতে পারেন আর ইচ্ছা করলে বড় গুনাহও মাফ করে দিতে পারেন। সব কিছুই তাঁর ইচ্ছা এবং মর্জির উপর নির্ভর করে। অতএব, বন্দার কর্তব্য হল আল্লাহ্ পাকের রহমতের আশা করতে থাকা এবং তাঁর আযাবকে ভয় করতে থাকা।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

আর আল্লাহ্ পাক বন্দাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, তিনি প্রত্যেক বন্দার সাথে যে ব্যবহার করেন তা হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا

পূর্ববর্তী আয়াতে যারা খাঁটি মোমেন কিন্তু অলসতার কারণে তাবুকের জেহাদে শরীক হননি তাদের কথা বর্ণিত হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে আলোচিত হয়েছে সে সব লোকের কথা, যারা ছিল প্রকৃত মুনাফেক, কপট-হৃদয়, ইসলাম বিদ্বেষী। তারা মুখে

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-১৯১

ঈমানদার হওয়ার দাবীদার ছিল, কিন্তু প্রকৃত অবস্থায় ঈমানদার ছিলনা। তারা সর্বদা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো। এমনি একটি ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায়ে মোয়াজ্জমা থেকে হিজরত করলেন তখন মদীনা মোনাওয়্যারার উপকণ্ঠে বনী আমর বিন আওফ নামক গোত্রের মহল্লায় কয়েক দিন অবস্থান করেন। এরপর মদীনা মোনাওয়্যারায় আগমন করেন এবং ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মসজিদ "মসজিদে নববী" নির্মাণ করেন। বনী আমর বিন আওফের যে মহল্লায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অবস্থান করেছিলেন সে স্থানে মুসলমানগণ একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, এরই নাম মসজিদে কোবা। আজও সেই মসজিদে জেয়ারতকারীগণ হাযির হয়। মসজিদে নববী থেকে মসজিদে কোবার দূরত্ব প্রায় তিন মাইল। হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সপ্তাহে একবার সেই মসজিদে গমন করে দু' রাকাআত নামায আদায় করতেন। তিনি মসজিদে কোবার উচ্চ মর্যাদার কথা বর্ণনা করেন।

এদিকে ইসলামের শত্রু মুনাফেকরা এ সম্পর্কে একটি ষড়যন্ত্র করে। তারা সেখানে আরো একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আসলে তা ছিল মুনাফেকদের একটি গোপন ঘাঁটি। সরল প্রাণ মুসলমানদেরকে সেখানে তারা নিয়ে যেত এবং মুসলমানদের মধ্যে কলহ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হত।

এবনে জরীর, এবনুল মুনজের, এবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী দালায়েলে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে এ ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ এভাবে দিয়েছেন। আমর এবনে আওফের গোত্র একটি মসজিদ নির্মাণ করলো এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট দাওয়াত নিয়ে প্রতিনিধি প্রেরণ করলো যেন তিনি আগমন করেন এবং এই মসজিদে নামায আদায় করেন। গনম এবনে আওফের গোত্র এ অবস্থা দেখে ঈর্ষা কাতর হল। তারাও একটি মসজিদ নির্মাণ করলো। আবু আমের নামক এক দূরাত্মা ছিল এ ষড়যন্ত্রের হোতা। এই লোকটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হিজরতের পূর্বে ছিল খৃষ্টান। একজন সাধু মানুষ হিসেবে খাজরাজ গোত্রের লোকদের নিকট সে ছিল শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমনের পর তার সকল ভন্ডামির অবসান ঘটে। এ কারণে আবু আমের অত্যন্ত রাগান্বিত হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে ইসলামের প্রতি এবং মিল্লাতে ইব্রাহীমের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে আহ্বান জানান। জবাবে সে বলে, আমি মিল্লাতে ইব্রাহীমের প্রতি বিশ্বাসী কিন্তু আপনি অনেক কিছু নতুন সংযোজন করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার এ মিথ্যা দাবীর প্রতিবাদ করলে সে বলে বসলো, আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী হবে তার মৃত্যু যেন হয় প্রবাসে, অসহায় অবস্থায়, শোচনীয়ভাবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, আমীন। এমনই যেন হয়।

বদরের যুদ্ধের পর আবু আমের লক্ষ্য করলো যে, ইসলামের উত্থান শুরু হয়ে গেছে। ইসলামের উন্নতি-অগ্রগতি তার কাছে ছিল অসহনীয়। তাই সে মক্কায় গমন করলো এবং

কাফেরদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে প্ররোচিত করলো। পরিণামে তৃতীয় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধ হল। এ যুদ্ধে কাফেরদের সঙ্গী হয়ে আবু আমেরও উপস্থিত হল এবং মুসলিম ও কাফের সৈন্যের মধ্যখানে একটি গোপন পরিখা খনন করে রাখলো। ঐ গোপন পরিখাতে পড়েই হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আহত হয়েছিলেন।

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, ৩য় হিজরীতে অনুষ্ঠিত ওহোদের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে আবু আমের তার পরিচিত মদীনাবাসীকে ইসলামের বিরুদ্ধে একত্রিত করার চেষ্টা করে কিন্তু মদীনাবাসীগণ তাকে নিরাশ করে। নিরাশার আঘাতে তার মন আহত হয়, সে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলে যেখানেই যুদ্ধ হোক আমি আপনার বিরুদ্ধে থাকবো এবং সর্বশক্তি নিয়োগ করে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।

অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর হোনায়েনের যুদ্ধ হয় তখন পর্যন্ত সে ইসলামের বিরোধিতায় তৎপর ছিল। হোনায়েনের যুদ্ধের পর সে এ সত্য উপলব্ধি করলো যে, ইসলামকে প্রতিহত করার মত শক্তি আরবদের মধ্যে কারোই নেই। তাই সে সিরিয়া চলে গেল এবং মদীনার মুনাফেকদেরকে এ মর্মে চিঠি লিখলো যে, আমি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোকাবেলা করার জন্যে রোমের বাদশাহর সঙ্গে দেখা করেছি। আমি এমন একটি বিরাট দুর্ধর্ষ সৈন্য বাহিনী নিয়ে আসছি যারা ক্ষণিকের মধ্যে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর সঙ্গী মুসলমানদেরকে শেষ করে দেবে।

বর্তমানে তোমরা একটি কাজ কর আর তা হলো মসজিদের নামে একটি গৃহ নির্মাণ কর যা মূলতঃ আমাদের গোপন ঘাঁটি হিসেবে কাজে লাগবে। তোমরা সেখানে নামাযের নামেই একত্রিত হবে এবং কর্মসূচী নিয়ে পরামর্শ করবে, আমার প্রেরিত দূত সেখানেই তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করবে এবং আমার চিঠি পত্র তোমাদের নিকট পৌঁছাবে আর আমি নিজেও যদি আসি তবে একটি সঠিক স্থানে অবস্থান করতে পারবো।

বস্তুতঃ আলোচ্য আয়াতে যে মসজিদের কথা বলা হয়েছে তা এই কুখ্যাত আবু আমেরের নির্দেশ মোতাবেকই ইসলামের বিরুদ্ধে একটি ঘৃণ্য চক্রান্ত স্বরূপ নির্মাণ করা হয়।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা মোতাবেক আবু আমের এ নির্দেশও দিয়েছিল যে, ঐ মসজিদ নামক ঘরটিতে যথাসাধ্য (গোপনে) অস্ত্র শস্ত্র একত্রিত কর। যাহোক মসজিদে কোবার কাছেই মসজিদ নামক এ ঘরটি নির্মিত হলো যাকে পবিত্র কোরআন মসজিদে যেরার বলেছে। মুনাফেকরা এই মসজিদটি তৈরী করেছিল, এবনে এসহাক তাদের সংখ্যা লিখেছেন ১২ জন।

১. কবিলায়ে বনী ওবায়েদ এবনে যায়েদের হোজাম এবনে খালেদ। এ ব্যক্তি ছিল বনী আমর এবনে আওফের একজন প্রতিনিধি।

২. বনী উমাইয়া এবনে যায়েদ গোত্রের সা'লাবা এবনে হাতেব,

৩. বনী সবীয়া এবনে যায়েদ গোত্রের মা'তাব এবনে কোশায়ের,

---

[১]। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-২৬৪

৪. আর হাবিবা এবনে আজআর,

৫. নাস্তাল এবনে হারেস,

৬. নাজাদ এবনে ওসমান,

৭. বনী আমর এবনে আওফ গোত্রের এবাদ এবনে হানিফ, যে সাহাল এবনে হানিফের ভাই ছিল।

৮. হারেসা এবনে আমের এবং তার পুত্রদ্বয়।

৯. মজমা এবনে হারেসা,

১০. যায়েদ এবনে হারেসা,

১১. ওদীয়া এবনে সাবেত,

১২. বখরাজ। এরা সকলে মিলে ইসলাম এবং মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের লক্ষ্যে মসজিদে কোবার অনতি দূরে মসজিদে যেরার নির্মাণ করেছিল।[১]

وَّكُفْرًا

এটি ছিল আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের নাফরমানী।

وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

এটি ছিল আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের নাফরমানী এবং মুসলমানদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির একটি ঘৃণ্য প্রয়াস।

الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ

যারা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের সঙ্গে পূর্ব থেকে যুদ্ধরত রয়েছে তাদের জন্যে একটি ঘাঁটি স্থাপনের উদ্দেশ্য। এ বাক্য দ্বারা আবু আমেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা আবু আমেরই ইসলামের বিরুদ্ধে তথা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ রত ছিল।

এখানে এ-ও উল্লেখ্য, মসজিদে "যেরার" নির্মাণের পর মুনাফেকরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরজী পেশ করলো যে, যারা রুগ্ন বা বৃদ্ধ তারা মসজিদে কোবায় পৌঁছতে পারেন না। এতদ্ব্যতীত, মসজিদে কোবায় স্থানও সংকুলান হয় না তাই আমরা এই মসজিদটি তৈরী করেছি। যদি আপনি দয়া করে তশরীফ আনেন এবং আমাদের এই মসজিদে দু' রাকাআত নামায আদায় করেন তবে বরকত হবে।

মূলতঃ এভাবে তারা মুসলমানদেরকে প্রতারিত করতে চেয়েছিল। এটি ছিল তাদের একটি ষড়যন্ত্র। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জবাব দিলেন, আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলে তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন কালে দেখা যাবে। তাবুকের যুদ্ধ থেকে

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪০৮-০৯

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন প্রত্যাবর্তন করে মদীনা শরীফের কাছে পৌছেছিলেন তখন এ আয়াত নাযিল হলো এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এই মসজিদে গমনের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলো এবং মুনাফেকদের সকল চক্রান্ত ফাঁস করা হলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দু'জন সাহাবীকে নির্দেশ দিলেন যে, এই ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রটিকে তথা যাকে পবিত্র কোরআন মসজিদে যেরার নামকরণ করেছে তাকে পুড়িয়ে দাও। তাঁর নির্দেশ মোতাবেক তাই করা হলো। এভাবে ইসলামের দুশমন আবু আমের এবং তার অনুসারী মুনাফেকদের সকল ঘৃণ্য প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। আবু আমের তার নিজের জন্যে যে দোয়া করেছিল এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার ওপর আমীন বলেছিলেন তা কবুল হলো। সিরিয়ার কান্দশরীন এলাকায় আপনজনদের থেকে বহু দূরে অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় আবু আমেরের মৃত্যু হয়।[১]

وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ط

মুনাফেকরা শপথ করে বলবে এই মসজিদ তৈরীর ব্যাপারে আমাদের নিয়ত অত্যন্ত সৎ এবং মহৎ। শীতে বা বৃষ্টিতে মসজিদে কোবায় হাযির হওয়া কষ্টকর হয় বিশেষতঃ যারা রুগ্ন বা বৃদ্ধ তাদের পক্ষে মসজিদে হাযির হওয়া অত্যন্ত কঠিন হয় বলে আমরা এই মসজিদ নির্মাণ করেছি, যাতে করে মুসল্লিদের জন্যে মসজিদে যাওয়া সহজ হয়।

وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

আর আল্লাহ পাক সাক্ষী যে, মুনাফেকরা তাদের কথায় এবং শপথে মিথ্যাবাদী। তারা নামাযীদের জন্যে মসজিদে উপস্থিতি সহজ করার লক্ষ্যে আদৌ এ কাজ করেনি; বরং ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার উদ্দেশ্যেই তারা এ কেন্দ্রটি তৈরী করেছে। তাই পরবর্তী বাক্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মুনাফেকদের তথাকথিত মসজিদে গমন না করা নির্দেশ দিয়ে এরশাদ হয়েছেঃ

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ط

(হে রসূল!) আপনি কখনও মুনাফেকদের তৈরী এই ঘরে দাঁড়াবেন না।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য বাক্যের এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। মুনাফেকরা মসজিদে কোবার মোকাবেলায় এ ঘরটি তৈরী করেছে। তারা সেখানে একত্রিত হয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সমালোচনা করতো, বিদ্রুপ করতো। তিনি যখন তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, জিআওয়ান নামক স্থানে পৌছলেন তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। এতে মুনাফেকদের সকল ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেয়া হয় এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সেখানে গমন করতে নিষেধ করা হয়।

---

[১]। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-২৬৪

এবনে এসহাক হযরত আবু রহমের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বনী সালেম এবনে আওফ গোত্রের মালেক বিন দখসম এবং আসেম এবনে আদী গোত্রের মাআন বিন আদীকে এই নির্দেশ দিলেন যে, মুনাফেকদের এই আড্ডাকে পুড়িয়ে দাও। তাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশ কার্যকর করলেন। মুনাফেকদের এ ঘাঁটি এভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়।

মোহাম্মদ এবনে ইউসুফ সালেহী বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মদীনা মোনাওয়্যারায় আগমন করেন তখন তিনি আসেম এবনে আদীকে বললেন, তুমি এ স্থানটি গ্রহণ কর এবং নিজের বাড়ী নির্মাণ কর। হযরত আসেম আরজ করলেন, ইঁয়া রসূলাল্লাহ! এই মসজিদ সম্পর্কে আল্লাহ পাক যে আদেশ দিয়েছেন এরপর এ স্থানে আমি বাড়ী নির্মাণ করতে পারিনা। অবশ্য সাবেত এবনে আকরামকে এ স্থানটি দান করুন। তার বাড়ী-ঘর নেই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাবেতকে এই স্থানটি দান করলেন, সাবেত সেখানে বসবাস করলেন। কিন্তু তার কোন সন্তান-সন্ততি সেখানে জন্ম গ্রহণ করেনি, এমনকি কবুতরের বাচ্চাও সেখানে পয়দা হয়নি আর মুরগীর ডিমেও সেখানে বাচ্চা হয়নি।

আল্লামা বগভী লিখেছেন, বর্ণিত আছে যে, বনী আমর বিন আওফ যারা মসজিদে কোবা তৈরী করেছিলেন, তারা হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করলেন, মাজমা এবনে হারেসাকে যেন মসজিদে কোবার ইমাম নিযুক্ত করা হয়। হযরত ওমর (রাঃ) তাতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি বললেন, তার নয়ন যুগল শীতল না হোক। সে কি মসজিদে যেরারের ইমাম ছিল না? মাজমা আরজ করলো, হে আমিরুল মোমেনীন! আমার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাড়াহুড়া করবেন না। তাদের নিয়ত কি? যদি আমি তাদের গোপন ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত হতাম তবে আমি সেখানে নামায পড়তাম না। আমি অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলাম কিন্তু পবিত্র কোরআন পাঠ করেছিলাম, আর এ লোকগুলো ছিল বৃদ্ধ এবং মূর্খ, এজন্যে আমি নামায আদায় করেছি। আমি মনে করেছি মসজিদ নির্মাণে তাদের উদ্দেশ্য ছিল সওয়াব হাসিল করা। তাদের মনের গোপন কথা সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর ওজর কবুল করলেন এবং মসজিদে কোবায় তাঁকে ইমাম নিযুক্ত করলেন।

لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ط

মূলতঃ যে মসজিদটি প্রথম দিন থেকেই তাকওয়া পরহেযগারীর উপর প্রতিষ্ঠিত সেই মসজিদই আপনার দাঁড়াবার উপযুক্ত স্থান।

اَوَّلِ يَوْمٍ

এই প্রথম দিন বলতে কোন্ দিনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? এর একটি অর্থ হল মসজিদ নির্মাণের প্রথম দিন। অথবা হিজরতের পর মদীনা মোনাওয়্যারায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবস্থানের প্রথম দিন।

আলোচ্য আয়াতে কোন্ মসজিদের কথা বলা হয়েছে

এ আয়াতে মসজিদ বলতে মসজিদে কোবাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে তা সুস্পষ্ট। তবে এ মসজিদ বলতে যে মসজিদ নববীকে বোঝানো হয়েছে সে সম্পর্কেও বহু সহীহ হাদীস রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ), হযরত যায়েদ এবনে সাবেত (রাঃ) এবং হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে মসজিদের উল্লেখ রয়েছে তা হল মসজিদে নববী।

ইমাম আহমদ (রহঃ), এবনে আবি শায়বা, তিরমিযী, নেসায়ী, এবনে জরীর, এবনুল মুনজের, এবনে আবি হাতেম, আবুশ শেখ, হাকেম, এবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী দালায়েলে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেছেন, আমি উম্মাহাতুল মোমেনীনের মধ্যে কোন একজনের গৃহে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করি-ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! যে মসজিদ সম্পর্কে এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে তার ভিত্তি তাকওয়া পরহেযগারীর উপর রাখা হয়েছে সে মসজিদ কোন্‌টি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এক মুষ্টি কাঁকর হাতে নিয়ে বললেন, এটি তোমাদের মসজিদ, মদীনার মসজিদ।

তেবরানী হযরত যায়েদ এবনে সাবেতের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সেই মসজিদ কোন্‌টি যার ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়া পরহেযগারীর উপর, তখন তিনি এরশাদ করেন, এটি আমার মসজিদ।

এবনে আবি শায়বা এবং এবনে মরদবিয়ার বর্ণনা হল এই যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমরকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করা হয় সেই মসজিদ কোন্‌টি যার বুনিয়াদ রাখা হয়েছে তাকওয়ার উপর? তখন তিনি বলেন, তা হল হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মসজিদ। মসজিদে নববীর ফজিলতে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে। এতে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার গৃহ এবং আমার মিম্বরের মধ্যে জান্নাতের বাগান সমূহের একটি বাগান রয়েছে। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ, মুসনাদে আহমদ এবং নেসায়ী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে যায়েদ মাজালীর সূত্রেও এই হাদীস সংকলিত হয়েছে।

ইমাম তিরমিজি (রহঃ) এই হাদীস সংকলন করেছেন হযরত আলীর (রাঃ) সূত্রে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার এই মসজিদে একটি নামায মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্য মসজিদের হাজার নামাযের চেয়েও উত্তম।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, যে মসজিদের ভিত্তি তাকওয়ার উপর রাখা হয়েছে তা হলো মসজিদে কোবা।

আতীয়্যার (রাঃ) বর্ণনা মোতাবেক হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ মতই পোষণ করতেন। ওরওয়া এবনে যোবায়ের, সাঈদ এবনে যোবায়ের একথাই বলেছেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে কোবার বুনিয়াদ রেখেছিলেন, তিনি হিজরত করে যখন মদীনা মোনাওয়্যারায় আগমন করলেন তখন সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত কোবা নামক স্থানেই অবস্থান করেন। আর এ সময় এখানেই নামায আদায় করেন।

এবনে জরীর, এবনুল মুনজের, এবনে আবি হাতেম এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) সূত্রে এবং আবুশ শেখ যাহ্যাকের সূত্রে একথা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বোখারী আবদুল্লাহ এবনে দিনারের সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমরের (রাঃ) কথা বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক শনিবার পদব্রজে অথবা আরোহী অবস্থায় মসজিদে কোবায় তশরীফ নিয়ে যেতেন। হযরত এবনে ওমরও (রাঃ) তাই করতেন।

নাফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমরের (রাঃ) কথায় আরও একটি বাক্য সংযোজন করে উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে কোবায় দু' রাকাআত নামায আদায় করতেন।

দাউদী, সোহায়লী, হাফেজ এবনে হাযর বলেছেন, কোন্ মসজিদ সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে তা তফসীরের ক্ষেত্রে কোন মতভেদ নয়, কেননা আলোচ্য দু'টি মসজিদের বুনিয়াদই তাকওয়া পরহেযগারীর উপর রাখা হয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন, যদিও আলোচ্য আয়াতে মসজিদের শব্দটি অনির্দৃষ্ট তবে তার বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে, মসজিদটির ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়া পরহেযগারীর উপর। কিন্তু আয়াতের বর্ণনা-শৈলি দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, এটি হলো মসজিদে কোবা। আর মসজিদে কোবা সম্পর্কেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে। কেননা মসজিদে যেরার মসজিদে কোবার ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যেই নির্মাণ করা হয়। আর পরবর্তী আয়াতও এ বক্তব্যের সমর্থন করে যে, আলোচ্য আয়াতে যে মসজিদের উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো মসজিদে কোবা।

فِيهِ رِجَالٌ يُّحِبُّونَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا، وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ،

"তাতে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা অত্যন্ত পবিত্রতা-প্রিয়। আর আল্লাহ পাক পবিত্রতা প্রিয় লোকদেরকে পছন্দ করেন"।

আল্লামা বগভী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত কোবাবাসীর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কেননা, তারা পানি দ্বারা খুব ভালভাবে পবিত্রতা অর্জন করতেন।

এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যখন এ আয়াত নাযিল হয় তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মোহাজেরীনদের এক দল নিয়ে পদব্রজে রওয়ানা হন এবং মসজিদে কোবার দুয়ারে পৌছে দাঁড়ান, মসজিদে উপবিষ্ট আনসারদেরকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি মোমেন? আনসারগণ নীরব ছিলেন। এরপর তিনি পুনরায় এ প্রশ্ন করলেন তখন হযরত

ওমর (রাঃ) আরজ করলেনঃ নিশ্চয় তারা মোমেন এবং আমিও তাদের সঙ্গে রয়েছি, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমরা আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর রাজি রয়েছ তো?

তারা বললেনঃ জ্বী-হ্যাঁ।

এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমরা কি বিপদাপদে সবর কর? তাঁরা বললেনঃ জ্বী-হ্যাঁ।

কোন প্রকার বিশ্রামের সুযোগ পেলে আল্লাহর শোকর আদায় কর?

তাঁরা বললেনঃ জ্বী-হ্যাঁ।

এরপর তিনি এরশাদ করলেনঃ শপথ কা'বার মালিকের! তোমরা মোমেন, অতঃপর তিনি তাদের নিকট বসে গেলেন এবং বললেনঃ হে আনসারের দল! আল্লাহ পাক তোমাদের প্রশংসা করেছেন, তোমরা অজু এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজনের সময় কি কর?

তাঁরা আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা প্রাকৃতিক প্রয়োজনের পর তিনটি পাথরের কুলুখ ব্যবহার করি। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াত- فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا তেলাওয়াত করেন।

এবনে খোজায়মা হযরত উয়াইমার এবনে সায়াদার সূত্রে লিখেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে কোবায় তশরীফ নিয়ে গেলেন। কোবাবাসীকে তিনি বললেন, আল্লাহ পাক তোমাদের পবিত্রতা অর্জনের প্রশংসা করেছেন, তোমরা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন কর? তখন তাঁরা আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আল্লাহর শপথ, আরতো কিছু নয় কথা শুধু এতটুকু যে আমাদের প্রতিবেশী ইহুদীরা শৌচকার্য পানি দ্বারা সম্পন্ন করে আমরাও তা করি। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, আমরা পাথর ব্যবহারের পর পানি দ্বারা শৌচক্রিয়া সম্পন্ন করি। তিনি এরশাদ করলেন, তা হলো এই- তোমরা অবশ্যই এরূপ করবে।

এবনে জরীর আতার (রঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কোবাবাসী সম্পর্কেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ

আল্লাহ পাকের ভয় এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উপর যে তার ইমারতের ভিত্তি রেখেছে সে ব্যক্তি উত্তম? অথবা যার গৃহের ভিত্তি রয়েছে এমন একটি গর্তের কিনারায় যা এখনই ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে এবং তাকে নিয়ে দোযখের আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়, আল্লাহ পাক জালেমদের হেদায়েত করেন না। মূলতঃ যে কাজের ভিত্তি হয় তাকওয়া পরহেযগারীর উপর, এখলাস বা আন্তরিকতার উপর, আর যে কাজের উদ্দেশ্য হয় এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ সে কাজই হয় সুদৃঢ় এবং স্থায়ী। পক্ষান্তরে, যে কাজ করা হয় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং সন্দেহের ভিত্তিতে, মুনাফেকী ছল চাতুরী ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্তের ভিত্তিতে, এহেন অন্যায় কাজ কখনও টিকে থাকেনা, থাকতে পারেনা। এমনি কাজের দৃষ্টান্ত হল এমন একটি ইমারত যা কোন গর্তের কিনারায় নির্মাণ করা হয় যা পতনোন্মুখ

থাকে। একটু বাতাসের ধাক্কায় বা ঢেউয়ের দোলায় তা ভেঙে নদীগর্ভে বিলীন হয়। এর সঙ্গে সে গৃহের অধিবাসীরাও ধ্বংস হয়। মুনাফেকরা যে ঘরটি নির্মাণ করেছিল তা করেছিল দোযখের প্রান্তে। অবশেষে তা দোযখেই নিপতিত হয়। প্রকাশ্যে তারা বলে আমরা মসজিদ নির্মাণ করেছি কিন্তু তাদের অন্তরে রয়েছে মুনাফেকী নাফরমানী। এ মুনাফেকী নারফমানীর কারণে তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে, এমন জালেম বা কাফেরদেরকে আল্লাহ্ পাক হেদায়েত করেন না।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, এ আয়াতের অর্থ হল যে ব্যক্তি দৃঢ় ভিত্তির উপর তথা আল্লাহ্ পাকের ভয় এবং আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উপর তার ইমারতের ভিত্তি রেখেছে সে উত্তম? অথবা সে ব্যক্তি, যে তার ইমারতকে দুর্বল বুনিয়াদের উপর তথা মুনাফেকীর উপর ভিত্তি করে তৈরী করেছে? জবাব সুস্পষ্ট, তাই উল্লেখ করা হয়নি।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল তাদের মুনাফেকী তাদেরকে দোযখে নিপতিত করেছে।

আল্লামা বগভী লিখেছেন, মুনাফেকদের নির্মিত মসজিদের বুনিয়াদ ইসলামের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্য রাখা হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত হল দোযখের শেষ প্রান্তে কেউ যদি ইমারত নির্মাণ করে তবে তা ইমারতের অধিবাসীদেরকে নিয়ে দোযখে নিপতিত হওয়াই স্বাভাবিক। আর এটিই হয়েছে মুনাফেকদের পরিণাম।

মোহাম্মদ এবনে ইউসুফ সালেহী এবনে আতিয়্যার কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, "যে মসজিদের বুনিয়াদ রাখা হয়েছে তাকওয়ার উপর" এর দ্বারা মসজিদে নববীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে–

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল মসজিদে কোবা। আর

أَمْ مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল মসজিদে যেরার।

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক এমন জালেমদেরকে তথা কাফেরদেরকে হেদায়াত করেন না অর্থাৎ তাদেরকে নাজাতের পথ প্রদর্শন করেন না।

এবনুল মুনজের সাঈদ এবনে যোবায়ের এবং কাতাদা যোরাইহের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, মসজিদে জেরারের একটি স্থানে যখন মাটি খোঁড়া হয় তখন সেখান থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। আল্লামা বগভী হযরত যাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেন, আমি মসজিদে জেরার থেকে ধোয়া বের হতে দেখেছি।

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِىْ بَنَوْا رِيْبَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ

মুনাফেকরা যে ঘরটি নির্মাণ করে তার কারণে তাদের অন্তরে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব চির বর্তমান থাকবে। তবে যদি তাদের অন্তরই বিদীর্ণ হয়ে যায় তা ভিন্ন কথা। আলোচ্য আয়াতে ريبة শব্দের অর্থ হল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তথা মুনাফেকী। মসজিদের নামে এই ঘরটি নির্মাণের কারণে তাদের অন্তরে মুনাফেকী চিরতরে বসে গেল। মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধানের কারণে তথা যমদূতের আঘাতে তাদের অন্তর বিদীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মুনাফেকী থেকে তারা মুক্তি পাবে না। কেননা, তারা ধারণা করবে যে তারা একটা ভাল কাজ করেছে। যেভাবে হযরত মূসা (আঃ)-এর সম্প্রদায় যখন বাছুর পূজা করেছিল তখন তারা এ অপরাধকে অত্যন্ত ভাল কাজ মনে করেছিল। ঠিক এভাবে যারা মসজিদে যেরার নির্মাণ করেছিল তারাও এ কাজকে ভাল কাজ মনে করেছিল। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

কালবী (রঃ) বলেছেন, ريبة অর্থ হল আক্ষেপ এবং লজ্জা কেননা, তথাকথিত মসজিদটি নির্মাণ করার পর নির্মাতারা লজ্জিত ও দুঃখিত হয়েছিল। আর সুদ্দী (রঃ) বলেছেন–ريبة এর অর্থ হল غيضا অর্থাৎ এ মসজিদকে ধ্বংস করা তাদের ক্রোধের কারণ হয়েছিলো। আর এ ক্রোধ সব সময় তাদের অন্তরে অব্যাহত থাকবে।

اِلَّآ اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ

তবে যখন তাদের অন্তর বিদীর্ণ হয়, তখন এ সন্দেহ এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্ব শেষ হয়ে যাবে। তত্ত্বজ্ঞানীগণ এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ অন্তর বিদীর্ণ হওয়ার তাৎপর্য হল তাদের নিহত হওয়া, তাদের কবরে চলে যাওয়া বা দোযখে নিপতিত হওয়া।

যাহ্যাক এবং কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হল আমৃত্যু তারা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে থাকবে, যখন তাদের মৃত্যু হবে তখন তাদের সন্দেহ দূর হবে এবং প্রকৃত সত্যের উপর একীন আসবে। এজন্যে হযরত আলী (রাঃ) বলেছেনঃ

الناس نيام فاذا ماتو انتهبوا

সমস্ত মানুষ পৃথিবীতে নিদ্রিত অবস্থায় রয়েছে, যখন তাদের মৃত্যু হবে তখনই তারা জাগ্রত হবে অর্থাৎ জীবনের মর্মার্থ তখনই তারা সত্যিকার ভাবে উপলব্ধি করবে কেননা, মৃত্যুর পর মানুষ শুধু তার কর্মফলই ভোগ করবে।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

আর আল্লাহ পাক তাদের নিয়ত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত এবং মসজিদে জেরার ধ্বংস করার যে আদেশ তিনি দিয়েছেন, তার কল্যাণ সম্পর্কেও তিনি অবহিত।[১] অথবা এর

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪১৪-১৬

অর্থ হল আল্লাহ পাক মুনাফেকদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত এবং তাদের ব্যাপারে তিনি যে আদেশ দিয়েছেন, তা তাৎপর্যবহ।[১]

অথবা এর অর্থ হল আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত এবং তাদের ভাল-মন্দ আমলের বদলা দেয়ার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী।[২]

অথবা এর অর্থ হল– আল্লাহ পাক সকলের প্রতিটি অবস্থা এবং কর্মতৎপরতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত এবং তিনি প্রত্যেককে তার অবস্থা মোতাবেক বদলা দেবেন।[৩]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, وَاللّٰهُ عَلِيۡمٌ অর্থাৎ আল্লাহ পাক মসজিদে যেরার নির্মাণের ব্যাপারে তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে ওয়াকেফহাল।

حَكِيۡمٌ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক মসজিদে যেরার ধ্বংস করার যে আদেশ দিয়েছেন তা ছিল অত্যন্ত হেকমত পূর্ণ।[৪]

اِنَّ اللّٰهَ اشۡتَرٰی مِنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ اَنۡفُسَهُمۡ وَ اَمۡوَالَهُمۡ بِاَنَّ لَهُمُ الۡجَنَّةَ
یُقَاتِلُوۡنَ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ فَیَقۡتُلُوۡنَ وَ یُقۡتَلُوۡنَ۟ وَعۡدًا عَلَیۡهِ حَقًّا فِی
التَّوۡرٰىةِ وَ الۡاِنۡجِیۡلِ وَ الۡقُرۡاٰنِ ؕ وَمَنۡ اَوۡفٰی بِعَهۡدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسۡتَبۡشِرُوۡا
بِبَیۡعِكُمُ الَّذِیۡ بَایَعۡتُمۡ بِهٖ ؕ وَ ذٰلِكَ هُوَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِیۡمُ ﴿۱۱۱﴾ اَلتَّآئِبُوۡنَ
الۡعٰبِدُوۡنَ الۡحٰمِدُوۡنَ السَّآئِحُوۡنَ الرّٰكِعُوۡنَ السّٰجِدُوۡنَ الۡاٰمِرُوۡنَ
بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَالنَّاهُوۡنَ عَنِ الۡمُنۡكَرِ وَ الۡحٰفِظُوۡنَ لِحُدُوۡدِ اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ
الۡمُؤۡمِنِیۡنَ ﴿۱۱۲﴾

তরজমা

(১১১) নিশ্চয় আল্লাহ পাক মোমেনদের নিকট থেকে ক্রয় করে নিয়েছেন তাদের জীবন ও সম্পদ, এর বিনিময়ে তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত, তারা আল্লাহর রাহে লড়াই করে (দুশমনকে) হত্যা করে অথবা প্রাণ দেয়। তওরাত, ইঞ্জিল ও পবিত্র কোরআনে

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-১৯৮
[২]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১১, পৃষ্ঠা-১৭
[৩]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪২৫
[৪]। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-১১৬

আল্লাহ পাকের এ প্রতিশ্রুতি সত্য হয়ে রয়েছে। প্রতিশ্রুতি পালনে আল্লাহ পাকের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কে আছে? অতএব, তোমরা আল্লাহ পাকের সঙ্গে যে সওদা করেছ তার জন্যে আনন্দিত হও, বস্তুতঃ এটিই মহান সাফল্য।

(১১২) তারা তওবাকারী, আল্লাহর বন্দেগীকারী, তাঁর প্রশংসাকারী, রোজাব্রত পালনকারী, রুকুকারী, সেজদাকারী, যারা সৎ কাজের নির্দেশদাতা এবং অন্যায় কার্যে নিষেধকারী এবং আল্লাহ পাকের নির্ধারিত সীমারেখার হেফাজতকারী, (হে রসূল!) আপনি মোমেনদেরকে সুসংবাদ দান করুন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে মুনাফেকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যারা জেহাদ থেকে বিরত রয়েছে। আর এ আয়াতে মুজাহেদীনদের ফজিলত ও উচ্চ মর্যাদার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, যারা জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাহে জেহাদ করেছেন, এর দ্বারা আল্লাহর রাহে জেহাদে অংশ গ্রহণে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

শানে নুযুল

তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের একাদশ বছরে হজ্বের সময় তিনি মক্কা শহর থেকে বের হলেন এবং হজ্বের জন্যে আগত বিভিন্ন গোত্রের সম্মুখে তাঁর নবুওয়্যতের দাওয়াত পেশ করলেন। একদিন খাজরাজ গোত্রের একদল লোকের সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। তিনি তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বললো, আমরা খাজরাজ গোত্রের লোক। তিনি বললেনঃ আপনারা কিছুক্ষণ বসতে পারেন? আমি আপনাদের সঙ্গে কিছু কথা বলবো, তারা বললোঃ অবশ্যই। এরপর তারা তাঁর নিকট বসে পড়লো, তিনি তাদেরকে এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের আহ্বান জানালেন, ইসলামের কথা বললেন এবং পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করে শোনালেন।

আল্লাহ পাকের মহিমা কে বুঝবে? খাজরাজ গোত্রের প্রতিবেশী ছিল ইহুদী সম্প্রদায়। আওস এবং খাজরাজ সংখ্যায় ইহুদীদের চেয়ে অধিক ছিল। যখন ইহুদীদের সঙ্গে তাদের ঝগড়া হতো তখন ইহুদীরা বলতো, অচিরেই একজন নবীর আবির্ভাব হবে। তাঁর আগমনের সময় ঘনিয়ে গেছে। তিনি যখন আগমন করবেন, আমরা তাঁর সাথে একত্রিত হয়ে তোমাদেরকে হত্যা করবো।

মদীনাবাসীদের মধ্যে যাঁরা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করলেন

ইহুদীদের মাধ্যমে তারা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর গুণাবলী সম্পর্কে কিছুটা অবগত হয়েছিল। যখন তারা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথা

বললো তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী লক্ষ্য করে তাঁকে চিনে ফেললো এবং পরস্পর বলতে লাগলো, ইহুদীরা যেন তোমাদের পূর্বে তাঁর নিকট না পৌছে সেদিকে লক্ষ্য রেখো। তাই তারা সকলে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আহ্বানে সাড়া দিলেন। তখন খাজরাজ গোত্রের ছয় ব্যক্তি মুসলমান হলেন। তারা ছিলেন আসআদ এবনে জোরারা, আওফ এবনে হারেস, রাফে এবনে মালেক, কোৎবা এবনে আমের এবনে জদীদা, আকাবা এবনে আমের এবনে নাবি, যাবের এবনে আবদুল্লাহ এবনে রোবাব।

কোন কোন বর্ণনায় যাবেরের স্থলে ওবাদা এবনে সামেতের নাম এসেছে। আর কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, তখন সাত জন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাঁরা হযরত যাবের এবং ওবাদা উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ করলেনঃ তোমরা কি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবে? যেন আমি আমার প্রতিপালকের বাণী মানুষের নিকট পৌছাতে পারি। তাঁরা আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! গত বছরই আমাদের মধ্যে বোয়াসের যুদ্ধ হয়েছিল। পরস্পরের মধ্যে অনেক হত্যাকান্ড হয়েছে। এমন অবস্থায় আপনি যদি আমাদের মধ্যে তশরীফ আনেন তবে আমাদের সমস্ত লোক আপনার সাথী হবে না। এখন আমাদেরকে অনুমতি দিন, আমাদের গোত্রের লোকদের নিকট প্রত্যাবর্তন করি। হয়তো আল্লাহ পাক আমাদের পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা করার তৌফিক দান করবেন, এমনি অবস্থায় আমরা অন্যদেরকেও সেই আহ্বান জানাবো যে আহ্বান আপনি আমাদেরকে জানিয়েছেন। আশা করা যায় তখন আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে আপনার সহায়তায় একত্রিত হওয়ার তৌফিক দান করবেন, এমন অবস্থায় সকলেই আপনার অনুসারী হয়ে যাবে, কেউ আপনার বিরোধী থাকবে না। আগামী বছর হজ্বের সময় আমরা আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করব।

এ আলোচনার পর তারা সকলে মদীনা শরীফ প্রত্যাবর্তন করলেন। এরপর মদীনার ঘরে ঘরে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আলোচনা হতে লাগলো। পরবর্তী বছর অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের দ্বাদশ বছরে বারো জন লোক আসলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত যাবের (রাঃ) ব্যতীত সেই পাঁচজন ছিলেন যাঁরা গত বছর এসেছিলেন। অবশিষ্ট সাত জন হলেন আওফ এবনে হারেসের ভাই মুআজ এবনে হারেস, জাকোয়ান, ওবাদা এবনে সামেত, ইয়াজীদ এবনে সালাবা, আব্বাস এবনে ওবাদা। এ পাঁচ জনই খাজরাজ গোত্রের লোক ছিলেন। আর আওস গোত্রের দু' জন ছিলেন বনিল আশহালের আবুল হাইসম এবনে তাইহান এবং উয়াইমার এবনে সায়েদা। তারা সকলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাতে বয়আত করলেন। একথার উপরে যে, আমরা আল্লাহ পাকের সঙ্গে শেরক করবো না, চুরি করবো না প্রভৃতি। এভাবে তারা সকলে মুসলমান হয়ে মদীনা শরীফ প্রত্যাবর্তন করলেন। এ সময় আসআদ এবনে জোরারা মদীনা শরীফে তাদেরকে একত্রিত করলেন, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আওস ও খাজরাজ গোত্রের লোকেরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ আরজী পেশ করলেন যে, আমাদের নিকট এমন একজন লোক প্রেরণ করুন যিনি আমাদেরকে পবিত্র কোরআন শিক্ষা দেবেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়াসাল্লাম মাসআব এবনে ওমায়রকে (রাঃ) প্রেরণ করলেন। এ সময় মদীনা শরীফে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৪০ জন।

মাসআব এবনে ওমায়রের (রাঃ) প্রচেষ্টায় আরো অনেক লোক মুসলমান হলেন। সাদ এবনে মুআজ এবং উসাউদ এবনে হোযায়েরও ইসলাম কবুল করলেন, তাদের দু'জন মুসলমান হওয়ার ফলে বনী আবদুল আশহাল গোত্রের সকল নারী পুরুষ মুসলমান হলেন। পরবর্তী বছর মদীনা শরীফ থেকে ৭০ জনের একটি দল হজ্বের মওসুমে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় হাযির হয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাতে বয়আত করলেন।

এবনে জরীর মোহাম্মদ এবনে কা'ব কারযীর সূত্রে লিখেছেন, আবদুল্লাহ এবনে রওয়াহা (রাঃ) আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি আপনার প্রতিপালক ও নিজের ব্যাপারে যে কোন শর্ত আমাদের দ্বারা মানিয়ে নিতে পারেন। তিনি এরশাদ করলেনঃ আমি আমার প্রতিপালকের সম্পর্কে এ শর্ত পেশ করি যে, তোমরা শুধু তাঁরই বন্দেগী করবে, কোন কিছুকে তাঁর সঙ্গে শরীক করবে না। আর আমার নিজের ব্যাপারে এ শর্ত পেশ করি যে জিনিস থেকে তোমরা নিজেদের জান-মালের হেফাজত কর সে জিনিস থেকে আমাকেও হেফাজত করবে। তাঁরা বললেনঃ আমরা যদি তা করি তবে তার বিনিময়ে কি পাব? তিনি এরশাদ করলেনঃ জান্নাত। আনসারগণ বললেনঃ এ ব্যবসা লাভজনক। আমরা এ ব্যবসা থেকে বিমুখ হবো না।[১] তখন নাযিল হয় আলোচ্য আয়াত–

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى

(নিশ্চয় আল্লাহ পাক মোমেনদের থেকে তাদের জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে) মোমেনের জন্যে এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে! মানুষের প্রাণ, মানুষের ধন-সম্পদ সবই আল্লাহ পাকের মহান দান, আর সেই মহান দাতা আল্লাহ পাকই ক্রয় করে নিচ্ছেন মানুষ থেকে তাঁর দান সমূহ বেহেশতের অনন্ত অসীম নেয়ামতের বিনিময়ে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ বেহেশতে এমন সব নেয়ামত রয়েছে যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কর্ণ শ্রবণও করেনি, এমনকি কোন অন্তর কল্পনাও করেনি। লক্ষ্যণীয় বিষয় এই, মোমেনের জানমাল যথা সর্বস্ব আল্লাহ পাকেরই দান। এই দানকে স্বয়ং দাতা নিজেকে ক্রেতারূপে অভিহিত করেছেন এবং জানমালের বিনিময়ে জান্নাত প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ পাক মোমেনদের জানমাল ক্রয় করেছেন–একথা আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, এখনই জানমাল তাঁর নিকট অর্পণ করতে হবে; বরং জান এবং মাল তার কাছেই থাকবে। শুধু এতটুকু কথা যে, প্রয়োজনের সময় আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক জানমাল উৎসর্গ করার জন্যে মোমেনকে প্রস্তুত থাকতে হবে। এ আয়াত শ্রবণের পর সর্বপ্রথম যিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দস্তে মোবারকে নিজের হাত রেখেছেন তিনি হলেন বরা এবনে মাবুর অথবা আবুল হাইসম অথবা আসআদ। তখন তিনি অঙ্গীকার করেছেন যে, যে বিপদ থেকে তিনি নিজের পরিবার বর্গের হেফাজত করবেন সে বিপদ থেকে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪১৬-১৮

আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হেফাজত করবেন এবং সমস্ত মানুষের মোকাবেলায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহায্য করবেন। সর্বপ্রথম জেহাদের ব্যাপারে এ আয়াতই নাযিল হয়। এরপর নাযিল হয়–

أُذِنَ لِلَّذِيۡنَ يُقٰتَلُوۡنَ

হিজরতের নির্দেশ

হযরত আবদুল্লাহ এবনে রওয়াহার (রাঃ) নেতৃত্বে সত্তরজন মদীনাবাসী যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাতে গোপনে বয়আত করলেন; তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথীদেরকে মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফ হিজরত করে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সর্বপ্রথম আবু সালামা এবনে আসাদ যিনি আবিসিনিয়া থেকে এসেছিলেন এবং মক্কাবাসী দ্বারা নির্যাতীত হয়েছিলেন, তিনি মদীনা শরীফ হিজরত করেছেন। এরপর আমের এবনে রবীয়া এবং তাঁর স্ত্রী লায়লা হিজরত করেছেন। এরপর আবদুল্লাহ এবনে যাহ্যাস (রাঃ) এবং অতঃপর অন্যান্য মুসলমান যথা আবদুল্লাহ এবনে জাহ্যাস (রাঃ), এরপর হযরত ওমর (রাঃ) এবং তাঁর ভাই যায়েদ এবং বিশ জন অশ্বারোহীর সঙ্গে আব্বাস এবনে রবীয়া। এরপর হযরত ওসমান এবনে আফফান (রাঃ) হিজরত করেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) বার বার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট হিজরতের অনুমতির জন্যে আবেদন করেন, কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একই কথা বলেন তাড়াহুড়া করোনা। হয়তো আল্লাহ পাক কোন ব্যক্তিকে তোমার সাথী করে দেবেন অর্থাৎ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গে হিজরত করবেন। এরপর মক্কাবাসী দূরাত্মারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে শহীদ করার গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

يُقَاتِلُوۡنَ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ فَيَقۡتُلُوۡنَ وَيُقۡتَلُوۡنَ

যাদের জান মাল আল্লাহ পাক ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে, তাদের কাজ হলো আল্লাহর রাহে জেহাদ করা এবং দুশমনকে হত্যা করা ও নিজের প্রাণ উৎসর্গ করা। এর অর্থ হলো তোমাদের কাজ হলো আল্লাহর রাহে নিজের জান-মাল দিয়ে জেহাদ করা। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হাদীস সংকলিত হয়েছে, যে আল্লাহর রাহে বের হয় আর এ বের হওয়ার উদ্দেশ্য আল্লাহর রাহে জেহাদ করা অথবা আল্লাহর রসূলের সত্যতা ঘোষণা করা ব্যতীত আর কিছু না হয়, এ অবস্থায় যদি তার মৃত্যু আসে তবে আল্লাহ পাকের এ দায়িত্ব যে; তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যদি তার মৃত্যু না হয় তবে আল্লাহ পাকের দায়িত্ব হলো সে যেখান থেকে রওয়ানা হয়েছে সেখানে পৌছে দেয়া এবং যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদসহ পৌছে দেয়া।[১]

فَيَقۡتُلُوۡنَ وَيُقۡتَلُوۡنَ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪১৮-১৯

এ বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রঃ) বলেছেন, মোমেনদের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করে এবং এই জেহাদ তাদের অব্যাহত থাকে, এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে তারা নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করে শাহাদাত বরণ করে। কোন অবস্থাতেই তারা জেহাদ থেকে বিরত হয় না।

ইমাম রাজী (রঃ) আরো লিখেছেন যে, যদি মুসলমানদের এক বিরাট দলও শাহাদাত বরণ করে তবুও তারা জেহাদ থেকে বিরত হয়না; বরং জেহাদ অব্যাহত রাখে।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যদিও বাক্যগুলো আদেশমূলক নয় কিন্তু এর অর্থ আদেশ মূলক অর্থাৎ তোমরা দুশমনের বিরুদ্ধে জেহাদ কর, আল্লাহর দুশমনদেরকে নিপাত কর এবং অকুণ্ঠ চিত্তে সত্যের জন্যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে প্রাণ উৎসর্গ কর।[২]

وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا

মোমেনদের থেকে আল্লাহ পাক তাদের জান-মাল ক্রয় করার বিনিময়ে জান্নাত প্রদানের যে অঙ্গীকার করেছেন তা সত্য। এর মধ্যে ব্যতিক্রমের কোন প্রকার সম্ভাবনা নেই।

فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ط

অর্থাৎ মুজাহেদীনদের জন্যে জান্নাত প্রদানের এ অঙ্গীকারের কথা আল্লাহ পাক ইতিপূর্বে তওরাত ইঞ্জিলেও ঘোষণা করেছিলেন। যেমন কোরআনে করীমেও রয়েছে এ ঘোষণা। অথবা এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক তওরাত এবং ইঞ্জিলে এ ঘোষণা করেছেন যে, তিনি উম্মতে মোহাম্মদীয়ার জান এবং মাল ক্রয় করেছেন জান্নাতের বিনিময়ে।

এ পর্যায়ে তৃতীয় ব্যাখ্যা হলো এই, অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদের এ বিধান সকল শরীয়তেই ছিল।[৩]

আর এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাক ইহুদী এবং ঈসায়ীদেরকেও কুফরী ও নাফরমানীর বিরুদ্ধে জেহাদের আদেশ দিয়েছিলেন এবং এ জেহাদের বিনিময়ে তাদেরকে জান্নাত প্রদানের ওয়াদা করেছিলেন।

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যদিও তওরাত এবং ইঞ্জিলে ইহুদী নাসারারা অনেক পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছে কিন্তু এতদসত্ত্বেও আলোচ্য আয়াতের ঘোষণা এখনও তওরাত ইঞ্জিলে বর্তমান, এটি পবিত্র কোরআনের সত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ব্যতীত আর কিছুই নয়।[৪]

---

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-২০০
[২]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪১৯
[৩]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-২০১
[৪]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪২৬

وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ

আল্লাহ পাকের চেয়ে অধিকতর ওয়াদা পূর্ণকারী কে হবে? অর্থাৎ কেউ নয়। কোন ওয়াদার বরখেলাফ করা মন্দ কাজ। আর এমন কাজ আল্লাহ পাকের দরবার থেকে হতে পারেনা। আর ওয়াদা পূর্ণ করা হল শরাফত বা ভদ্রতা, আর এটি আল্লাহ পাকেরই একটি শান। এতদ্ব্যতীত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা মন্দ স্বভাব। আল্লাহ পাক এমন কিছু থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

ইমাম রাজী (রঃ)-এর ভাষায়–

ان نقض العهد كذب ومكر وكل ذالك من القبائح فالغنىّ عن كل الحاجات اولى ان يكون منزّها عنها

ওয়াদা ভঙ্গ করা হলো মিথ্যাবাদীতা এবং প্রতারণা, আল্লাহ পাক এসব কিছু থেকে পবিত্র। কেননা কারো কাছে তাঁর কোন ঠেকা নেই, তিনি সর্বশক্তিমান।[১]

فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ

অতএব, তোমরা আল্লাহ পাকের সঙ্গে যে ব্যবসা করেছ তার জন্যে আনন্দিত হও। আয়াতের পূর্ববর্তী অংশে মুজাহেদীনদের সম্পর্কে পরোক্ষভাবে কথা হয়েছে আর এ আয়াতাংশে সরাসরি তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে যে তোমরা আনন্দিত হও এজন্যে যে, সামান্য জিনিষের বিনিময়ে বিরাট এবং মহান বিনিময় পেয়েছ, ক্ষণস্থায়ী বস্তুর বিনিময়ে চিরস্থায়ী পুরস্কার পেয়েছে। এর চেয়ে লাভজনক ব্যবসা আর কি হতে পারে! এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ পাক তোমার সঙ্গে ক্রয় এবং বিক্রয় উভয়টিই করেছেন, আর উভয় অবস্থায় লাভ তোমাকেই দিয়েছেন। কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ পাক তাঁর মুজাহেদ বন্দাকে তার জান ও মালের মূল্য দিয়েছেন এবং অনেক বেশী দিয়েছেন। হাসান বসরী (রঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ পাক তোমাকে দুনিয়া দান করেছেন আর এ দান থেকে কিছু দিয়ে তুমি জান্নাত ক্রয় কর।

وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

আর এটি বিরাট সাফল্য। এ সাফল্য অর্জনই জীবন সাধনার উদ্দেশ্য।

অর্থাৎ জান্নাত লাভের নিশ্চয়তা, চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে চিরশান্তি লাভের এ নিশ্চিত ব্যবস্থাই হল সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য, মানব জীবনের এর চেয়ে বড় কোন সাফল্য নেই। আর জান্নাত লাভের এ অঙ্গীকার আর কারো নয়; বরং সর্বশক্তিমান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের তরফ থেকে। প্রত্যেক মোমেন যখন আল্লাহ পাকের তৌহিদ বা একত্ববাদের এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তার উপর সাক্ষ্য দেয় তখন আলোচ্য আয়াতে যে ব্যবসার কথা বলা হয়েছে পরোক্ষভাবে তারও অঙ্গীকার করে। এজন্যে হযরত হাসান বসরী (রঃ) শপথ করে বলেছেনঃ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-২০১

والله ما على الارض مؤمن الا يدخل فى هذه البيعة

আলোচ্য আয়াতে ঘোষিত সুসংবাদ উম্মতে মোহাম্মদীয়ার প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, এতে বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ করার লক্ষ্যে দশটি তাগিদ ব্যবহৃত হয়েছেঃ

১. আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ

(নিশ্চয় আল্লাহ পাক মোমেনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করেছেন।)

২. মোমেনদেরকে জেহাদের বিনিময়ে যে অশেষ সওয়াব দান করবেন, তাকে ক্রয়-বিক্রয় বলে আখ্যা দিয়েছেন।

৩. وعدا শব্দটি ব্যবহার করেছেন, আর আল্লাহ পাকের ওয়াদা চিরসত্য।

৪. عليه শব্দ ব্যবহার করেছেন যা দ্বারা অবশ্য কর্তব্য বোঝায়।

৫. حقا শব্দটি ব্যবহার করেছেন যা বিশেষ তাগিদের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৬. فى التورٰة والانجيل والقران অর্থাৎ আল্লাহর রাহের মুজাহেদীনদেরকে জান্নাত প্রদানের এ অঙ্গীকার তৌরাত, ইঞ্জিল এবং পবিত্র কোরআন তথা সমস্ত নবী রসূলগণের মাধ্যমে এ ঘোষণা প্রচারিত হয়েছে।

৭. وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ আর আল্লাহ পাকের চেয়ে অধিকতর ওয়াদা পূর্ণকারী কে হবে? এ বাক্যটির মাধ্যমে বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

৮. فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ অতএব, আল্লাহ পাকের সঙ্গে তোমরা যে ব্যবসা করলে তার জন্যে আনন্দিত হও, সরাসরি মুজাহেদীনদেরকে এ বাক্যে আনন্দিত হওয়ার যে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তা-ও বিষয়টিকে আরো সুনিশ্চিত করে তুলেছে।

৯. وذٰلك هو الفوز এটিই সাফল্য।

১০. العظيم আর এ সাফল্য কোন সাধারণ বা সামান্য সাফল্য নয়; বরং মহান এবং বিরাট সাফল্য, অসামান্য এবং অসাধারণ সাফল্য।[২]

اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ

[১]। তফসীরে মাজেদী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪২৬
[২]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-২০১

মোমেনদের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন যে, মোমেনদের জান-মাল তিনি জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। আর এ আয়াতে এমন মোমেনদের নয়টি গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে।

التَّائِبُونَ দ্বারা তওবাকারী অর্থাৎ যারা শেরক থেকে তওবা করেছে এবং মুনাফেকী থেকে পবিত্র হয়েছে তথা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাতে বয়আত করেছে যে, ইসলামের যাবতীয় বিধি-নিষেধ তারা পরিপূর্ণভাবে পালন করবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য শব্দটি দ্বারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা শেরক থেকে তওবা করেছে। আর হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, যারা শেরক এবং মুনাফেকী থেকে তওবা করেছে।

অন্যান্য তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, শুধু শেরক এবং মুনাফেকী নয়; বরং যারা যাবতীয় পাপাচার থেকে তওবা করেছে আলোচ্য বাক্যে তাদেরই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর তওবা সম্পূর্ণ হয় চারটি কাজের মাধ্যমে।

১. কোন প্রকার গুনাহর কাজ কারো দ্বারা হয়ে গেলে এজন্যে তার অন্তর দগ্ধ হওয়া, অন্তরে ব্যথা বেদনা সৃষ্টি হওয়া।

২. কৃত অন্যায়ের জন্যে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া।

৩. ভবিষ্যতে এমন অন্যায় কাজ না করার সংকল্প গ্রহণ করা।

৪. আলোচ্য তিনটি কাজের উদ্দেশ্য হতে হবে শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করা। অতএব, যদি কারো এ উদ্দেশ্য হয় যে, এর দ্বারা সমাজের বদনাম থেকে আত্মরক্ষা করা যাবে এবং মানুষ প্রশংসা করবে তাহলে তাকে তওবাকারী বলা যাবে না।[১]

الْعٰبِدُوْنَ

যারা প্রকাশ্য ও গোপন যাবতীয় শেরক বর্জন করে এবং শুধু এক আল্লাহ্ পাকের এবাদতে মশগুল থাকে।

الْحٰمِدُوْنَ

অর্থাৎ যারা সুখে দুঃখে এক কথায় সকল অবস্থায় আল্লাহ্ পাকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকে। হাদীস শরীফে উল্লেখিত আছে, সর্বপ্রথম তাদেরকে জান্নাতের দিকে ডাকা হবে। (তেবরানী, হাকেম, বায়হাকী)

ইমাম রাজী (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ পাকের শোকর আদায়ে মশগুল থাকে এবং শোকর গুজারী তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়, তাদের শেষ কথা হয় আল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

---

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-২০২-০৩

السَّائِحُون

অর্থাৎ যারা রোজাদার। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, পবিত্র কোরআনে এ শব্দটি রোজা অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

سياحة امتى الصوم

অর্থাৎ আমার উম্মতের সেয়াহাত হলো রোজা। এবনে জরীর হযরত ওবায়েদ এবনে ওমরের সূত্রে লিখেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এই শব্দটির অর্থ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এরশাদ করেছেনঃ যারা রোজাব্রত পালন করে।

আল্লামা বগভী হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকেও একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সুফিয়ান এবনে উয়াইনাহ বলেছেন, রোজাদারকে সায়েহ বলা হয় এজন্যে যে, সে পানাহার সহ যাবতীয় আনন্দ-উল্লাস পরিহার করে থাকে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ আদম সন্তানের প্রত্যেকটি নেক আমলের সওয়াব দশ থেকে ৭০০শ' গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় রোজা ব্যতীত কেননা, রোজা শুধু আমারই জন্যে এবং আমিই এর বিনিময় দান করবো। কেননা বন্দা আমারই জন্যে তার পানাহার এবং অন্যান্য আনন্দ-উল্লাস পরিহার করে।[১]

তফসীরকার আতা (রহঃ) বলেছেন, السَّائِحُون এর অর্থ গাজী। যারা আল্লাহর রাহে জেহাদ করেন, যেমন এবনে মাজাহ, হাকেম এবং বায়হাকী হযরত আবু উমামার (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আমার উম্মতের সেয়াহত হল আল্লাহর রাহে জেহাদ করা।

আল্লামা বগভী লিখেছেন, বর্ণিত আছে যে হযরত ওসমান (রাঃ) আরজ করেছিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে আল্লাহর এবাদতের জন্যে পৃথিবীতে ঘোরাফেরার অনুমতি দান করুন। তিনি এরশাদ করেন, আমার উম্মতের সেয়াহত (আল্লাহর এবাদতের জন্যে ঘোরাফেরা করা) হল আল্লাহর রাহে জেহাদ করা।

একরামা سَائِحُون শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এরা হল তালেবে এলম, যারা দ্বীনি এলমের অন্বেষণে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নিজে শুনেছি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দ্বীনি এলমের অন্বেষণে পথ চলে আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতের পথে পরিচালনা করবেন। আর এমন তালেবে এলমের জন্যে ফেরেশতাগণ পাখা বিছিয়ে দেন এবং আলেমদের মাগফেরাতের জন্যে ফেরেশতাগণ দোয়া করতে থাকেন। এই ফেরেশতা আসমানে থাকুক কি জমীনে, পানির ভেতর অবস্থানকারী মাছেরাও আলেমদের জন্যে দোয়া করতে থাকে। একজন আবেদ ব্যক্তির উপর আলেমের ফজিলতের দৃষ্টান্ত হল

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪২০-২১

যেমন অন্যান্য নক্ষত্রের উপর চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের ফজিলত রয়েছে। আলেমগণ আম্বিয়ায়ে কেরামের (এলমের) উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ কোন ধন-সম্পদ উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যাননি, বরং তাঁরা এলমের উত্তরাধিকার রেখে গেছেন। অতএব, যে আম্বিয়ায়ে কেরামের ওয়ারিষ তথা উত্তরাধিকারী হবে সে অত্যন্ত ভাগ্যবান। (আহমদ, তিরমিযী, এবনে মাজা, আবু দাউদ)

الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ

রুকুকারী এবং সেজদাকারী তথা যারা নামাযী, নামায আদায়কারীদের জন্যে দু'টি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা নামাযের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কেননা সমস্ত এবাদতের উপর নামাযের বিশেষ ফজিলত রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম আল্লাহ্ পাকের দরবারে কোন্ আমল সর্বাধিক পছন্দনীয়? তিনি এরশাদ করলেন, সঠিক সময় নামায আদায় করা। আমি আরজ করলাম এরপর কোন্ আমল আল্লাহ পাকের নিকট সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয়, তিনি এরশাদ করলেন, মাতা-পিতার কথা মেনে চলা। আমি আরজ করলাম, এরপর কোন্ আমল? তিনি এরশাদ করলেন, আল্লাহর রাহে জেহাদ। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, নামায হল দ্বীনের খুঁটি। এবনে আসাকের হযরত আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, নামায মোমেনের নূর। কাজায়ী হযরত আলী (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, পরহেযগার মাত্রের জন্যে নামায আল্লাহ্ পাকের নৈকট্যের মাধ্যম।

মুসলিম, আবু দাউদ এবং নেসায়ী হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বন্দা যখন সেজদারত থাকে তখন সে আল্লাহ্ পাকের সর্বাধিক নৈকট্য লাভে ধন্য হয়। অতএব, তোমরা অধিক পরিমাণে দোয়া করতে থাক।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, নামাযে দন্ডায়মান অবস্থায় সর্বপ্রথম আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে মিনতি প্রকাশ করা হয়। এরপর রুকুতে আরও অধিক পরিমাণে মিনতি প্রকাশ করা হয়, আর সেজদা অবস্থায় চরম ও পরম মিনতি প্রকাশিত হয়।

الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ

যারা মানুষকে ভাল কাজের নির্দেশ দেয়, আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের আদেশ দেয়।

وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

যারা মানুষকে শেরক ও যাবতীয় মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। যেমন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের মধ্যে যারা মন্দ কাজ দেখবে তাদের কর্তব্য হল শক্তি দ্বারা তাকে রুখে দাড়ানো, যদি তাতে সক্ষম না

হয় তবে কর্তব্য হল মন্দ কাজের বিরুদ্ধে মৌখিক প্রতিবাদ করা, যদি সেই শক্তিও না থাকে তবে মনে মনে সেই কাজকে মন্দ জানা। আর এটি দুর্বল ঈমানের পরিচয়।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে الْمَعْرُوْفِ অর্থাৎ সুন্নত আর المنكر অর্থ বেদআত। এর অর্থ হল তারা নিজেরা ভাল কাজ করে ক্ষান্ত হয়না; বরং অন্যকেও ভাল কাজে অনুপ্রাণিত করে। এমনিভাবে অন্যকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। এভাবে তারা যেমন আল্লাহর এবাদতে মশগুল থাকে তেমনি আল্লাহর বন্দাদের খেদমতেও নিয়োজিত হয়।

وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ط

অর্থাৎ আল্লাহ পাক ভাল ও মন্দের, নেক ও বদের মধ্যে একটা সীমা নিদৃষ্ট করে দিয়েছেন। যারা এই সীমাকে সযত্নে সংরক্ষণ করে তথা আল্লাহ পাকের নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করেনা, শরীয়ত বিরোধী কোন কাজে অংশ গ্রহণ করেনা। পূর্ববর্তী আয়াতে যে মোমেনদের সম্পর্কে খোশ খবরী রয়েছে যে, তাদের জান-মাল আল্লাহ পাক জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করেছেন তারা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত গুণাবলীর অধিকারী হয়। আর এমন মোমেনের জন্যেই খোশ খবরী রয়েছে পরবর্তী বাক্যে।

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

আর (হে রসূল!) মোমেনদেরকে সুসংবাদ দিন যারা পরিপূর্ণ ঈমানদার, যারা আলোচ্য গুণাবলীতে গুণান্বিত, তাদের জন্যেই এই খোশ খবরী। কিন্তু কি খোশ খবরী? এবং কোন্ নেয়ামতের খোশখবরী? তার উল্লেখ করা হয়নি, কেননা তা এমন বিরাট এবং মহান নেয়ামত তা শুধু যে বর্ণনাতীত তাই নয়; বরং কল্পনাতীতও।

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ
قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿١١٣﴾ وَمَا كَانَ
اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ
اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ؕ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ﴿١١٤﴾ وَمَا كَانَ اللّٰهُ
لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١١٥﴾

তরজমা

(১১৩) আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরেকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মোমেনদের জন্যে উচিত নয়, যখন নিশ্চিত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে তারা দোযখী।

(১১৪) আর ইব্রাহীমের পিতার জন্যে ইব্রাহীমের ক্ষমা প্রার্থনা শুধুমাত্র একটি প্রতিশ্রুতির কারণে যা তাকে দেয়া হয়েছিল, এরপর যখন ইব্রাহীমের নিকট একথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় যে, সে আল্লাহর দুশমন তখন তিনি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। নিশ্চয় ইব্রাহীম ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়, অতীব সহনশীল।

(১১৫) আর আল্লাহ পাক কোন জাতিকে পথে আনার পর পথভ্রষ্ট করেন না, যে পর্যন্ত না তাদের আত্মরক্ষার বিষয় সমূহ তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বলে না দেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক সব বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্কে

এ সূরার শুরু থেকেই কাফের মুশরেকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের নির্দেশ রয়েছে। আর কাফের মুশরেকদের সাথে জীবত অবস্থায় যেমন আন্তরিক সম্পর্ক অবৈধ, ঠিক তেমনি মৃত্যুর পরও তাদের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা বৈধ নয়, এটি ঈমানের বৈশিষ্ট্য। মুশরেক, মুনাফেকদের জানাযা আদায় করা বৈধ নয়, আর তাদের কবরে দন্ডায়মান হওয়াও বৈধ নয়, এমনকি যদি কাফের নিকটাত্মীয়ও হয় তবুও তাদের জন্যে এস্তেগফার করা তথা ক্ষমা প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। কেননা, আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ....

(নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁর সাথে শেরক করাকে মাফ করবেন না, তবে শেরক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি মাফ করতেও পারেন।)[১]

শানে নুযুল

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পিতৃব্য আবু তালেবের মৃত্যুর সময় তার নিকট আগমন করেন। সেখানে পূর্বেই আবু জেহেল এবং আবদুল্লাহ এবনে উবাই, উমাইয়া এবনে মুগীরা উপস্থিত ছিল। তিনি আবু তালেবকে বললেন, চাচা! আপনি একবার অন্ততঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলুন যেন আমি আল্লাহ পাকের দরবারে দলিল হিসেবে পেশ করতে পারি। ঐ

---

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-২০৮
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪১৩-১৪

মুহূর্তে আবু জেহেল বললো, ভাই তুমি কি আবদুল মোত্তালেবের ধর্ম পরিত্যাগ করবে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বার বার কলেমায়ে তওহীদের কথা আবু তালেবকে বলতে থাকেন। এদিকে আবু জেহেলরা বার বার তাকে বাধা দিতে থাকে। অবশেষে আবু তালেব বললো, "আবদুল মোত্তালেবের ধর্মের উপর"।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, আবু তালেব লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আল্লাহর শপথ! যতক্ষণ আমাকে নিষেধ না করা হয় ততক্ষণ আমি আপনার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবো তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।[১]

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর পিতা-মাতার সম্পর্কে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

শেখ জালালুদ্দিন সয়ুতি (রহঃ) একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পিতা-মাতাকে জীবিত করা হয় এবং তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনেন, এরপর পুনরায় ইন্তেকাল করেন। অবশ্য তত্ত্বজ্ঞানীদের এক বিরাট দল এ বিষয়ে নীরবতা পালন করেছেন। তফসীরকারগণ বলেছেন, এ সম্পর্কে নীরবতা পালন করাই সর্বোত্তম পন্থা।[২]

والله اعلم

আলোচ্য আয়াতে মুশকেদের ব্যাপারে এস্তেগফার অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অবশ্য এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, জীবিত মুশরেকদের ব্যাপারে মাগফেরাতের দোয়া করা বৈধ। কেননা এমন দোয়ার তাৎপর্য হল সেই মুশরেকদের জন্যে ঈমানের তৌফিকের আরজী পেশ করা, আর এতে কোন ক্ষতি নেই; বরং ভাল কাজ।

মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি রয়েছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর পিতৃব্য আবু তালেবকে বলেছিলেনঃ আপনি লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন, আমি কেয়ামতের দিন এর সাক্ষ্য প্রদান করবো। তখন আবু তালেব বলেছিল, যদি এই ভয় না থাকতো যে, কোরায়শরা এজন্যে আমাকে লজ্জা দেবে তবে আমি এ কলেমা পাঠ করতাম। তখন নাযিল হয়–

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

"(হে রসূল!) যাকে আপনি অত্যন্ত বেশী ভালবাসেন তাকে যে আপনি হেদায়েত করতে পারেন না, কিন্তু আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করেন"।

---

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-২০৮
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪২২-৪২৩

[২]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪১৪

বোখারী শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি রয়েছে, হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, আমি নিজে শুনেছি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আবু তালেবের আলোচনার সময় বলেছিলেন, হয়তো কেয়ামতের দিন আমার শাফাআত তার জন্যে কিছু উপকারী হবে। আর তার পায়ের টাখনু পর্যন্ত দোযখের অগ্নিতে থাকবে যে কারণে তার মগজ পর্যন্ত বের হয়ে আসতে থাকবে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য আয়াত আবু তালেব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيَّاهُ ج

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কোন মুশরেকের জন্যে দোয়া করা নবীর শানের খেলাফ। কারো মনে এ প্রশ্ন হতে পারে যে, কোরআনে করীমেই রয়েছে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পিতার জন্য দোয়া করেছেন পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

وَاغْفِرْ لِاَبِیْۤ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ.

"আমার পিতাকে মাফ করুন, সে ছিল পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত"।

তাই আলোচ্য আয়াতে এ প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে যে, ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পিতার জন্যে যে দোয়া করেন তা ছিল একটা ওয়াদার কারণে। এ কথাটির দু'টি অর্থ হতে পারে–

১. ওয়াদাকারী ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অর্থাৎ তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে ওয়াদা করেছিলেন এ মর্মে যে, যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে আমি আল্লাহ পাকের দরবারে আপনার মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করব। আর এ ওয়াদার কারণেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পিতার জন্যে দোয়া করেছিলেন।

অধিকাংশ তফসীরকারগণ আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

২. কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, ওয়াদাকারী ছিল হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতা অর্থাৎ সে ওয়াদা করেছিল ইব্রাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে যে, সে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। এ ওয়াদার কারণে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পিতার জন্যে দোয়া করেছিলেন যেন সে ঈমানের তওফিক পায় এবং আল্লাহ পাক তাকে মাফ করেন।

তফসীরকারগণ বলেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর তাঁর পিতার জন্যে এস্তেগফারের তাৎপর্য হল তার ইসলাম গ্রহণের তওফিকের জন্যে দোয়া করা।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতা যখন তার কুফরী ও নাফরমানী বর্জনে অস্বীকৃতি জানায়, এমনকি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে হত্যা করার হুমকি দেয় তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেছিলেন, "আমি বিদায় নিলাম তবে আপনার জন্যে আমি আল্লাহ পাকের দরবারে এস্তেগফার করব"। এটিই ছিল তাঁর ওয়াদা। আর এ ওয়াদার কারণেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পিতার জন্যে এস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। এখানে একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য আল্লাহ পাক যেন তাঁর পিতাকে কুফর ও শেরকের নাফরমানী থেকে মুক্ত করেন এবং দ্বীন ইসলাম গ্রহণের তওফিক দান করে তাকে ক্ষমা করেন, এটিই ছিল হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পিতার জন্যে দোয়া করেছেন একথা শ্রবণ করে কোন কোন সাহাবী তাদের মুশরেক পিতা-মাতার জন্যে দোয়া করতে শুরু করেন। যেমন হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে তার মুশরেক পিতা-মাতার জন্যে দোয়া করতে শুনি। আমি তাকে বলি তুমি কি তোমার পিতা-মাতার জন্যে দোয়া করছো? অথচ তারা ছিল মুশরেক। তখন সে বলল, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-ও তাঁর মুশরেক পিতার জন্যে দোয়া করেছিলেন। তখন তাঁদেরকে মুশরেক আত্মীয়-স্বজনদের জন্যে দোয়া করতে নিষেধ করে বলা হয় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যতক্ষণ তাঁর পিতার পরিণাম সম্পর্কে জানতে পারেননি ততক্ষণই তিনি তাঁর পিতার জন্যে এস্তেগফার করতে থাকেন। কিন্তু যখন তাঁর নিকট এ সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, তাঁর পিতা ঈমান আনবে না, মুশরেক অবস্থায়ই তার মৃত্যু হবে, এরপর তিনি তাঁর পিতার জন্যে এস্তেগফার করা বর্জন করেন। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ

"যখন ইব্রাহীমের নিকট এ সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হল যে, তার পিতা আল্লাহর দুশমন তখন তিনি তার সাথে অসন্তোষ প্রকাশ করে তার জন্যে দোয়া বন্ধ করে দিলেন"।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ আয়াতের সম্পর্ক আখেরাতের সাথে অর্থাৎ আখেরাতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট একথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হবে যে, তাঁর পিতা আল্লাহর দুশমন, তখন তিনি তার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করবেন।

ইমাম বোখারী (রহঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন: কেয়ামতের দিন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে তাঁর পিতা আজরের সাক্ষাত হবে। তার চেহারা তখন অত্যন্ত মলিন হবে। ইব্রাহীম (আঃ) তাকে বলবেন আমি কি তোমাকে বলিনি যে আমার হেদায়েতের বরখেলাফ কাজ করোনা। তাঁর পিতা বলবে, আজ আমি তোমার কথা অমান্য করবো না। তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর দরবারে এভাবে আরজী পেশ করবেন, হে আমার মালিক, তুমি যে বলেছিলে তুমি আমাকে লজ্জিত করবেনা, আজ আমার পিতা দোযখে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, এর চেয়ে বড় লজ্জা এবং অপমান আর কি হতে পারে! আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ আমি কাফেরদের জন্যে জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। এরই মধ্যে আল্লাহ পাকের হুকুমে ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতাকে একটি বিশেষ জন্তুতে পরিণত করা হবে। ইব্রাহীম (আঃ)-কে আল্লাহ পাক আদেশ দেবেন, ইব্রাহীম! তুমি তোমার পায়ের দিকে লক্ষ্য কর। ইব্রাহীম (আঃ) দেখবেন, কাঁদামাটির মধ্যে একটি বিশেষ জন্তু পড়ে আছে। তখন আল্লাহ পাকের হুকুমে তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন, যদি মানবরূপে মানব পরিচয়ে ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতা আজরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হত তবে তা ছিল হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্যে

অপমান এবং লজ্জার ব্যাপার। কিন্তু যখন মানবরূপ এবং মানব পরিচয়ই রইলোনা তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর লজ্জা এবং অপমানের প্রশ্নও ওঠে না।[১]

إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ

"নিশ্চয় ইব্রাহীম ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়, সহনশীল"।

اواه

শব্দটির ব্যাখ্যায় কা'বে আহবার বলেছেন, "আওয়াহুন" তাকে বলা হয় যে আল্লাহ পাকের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে 'আহ' 'আহ' করতে থাকে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর জীবনে তাই করতেন।

তফসীরকার আতা (রহঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, যে ব্যক্তি দোযখের ভয়ে ভীত হয় এবং আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ থেকে তওবা করে তাকে বলা হয় "আওয়াহুন"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, এ শব্দটির অর্থ হল অধিক পরিমাণে মুনাজাতকারী।

আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল সেই মোমেন ব্যক্তি যে অধিক পরিমাণে তওবা করে।

হাসান এবং কাতাদা (রহঃ) বলেছেন, এ শব্দটি সে ব্যক্তির সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় যে মানুষের উপর অধিক পরিমাণে দয়া করে।

আর মুজাহেদ (রহঃ) বলেছেন, এ শব্দটির অর্থ হল সে ব্যক্তি যার অন্তরে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পরিপূর্ণ একীন থাকে।

একরামা (রহঃ) বলেছেন, এ শব্দটি ব্যবহৃত হয় পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনকারীর জন্যে।

আকাবা এবনে আমের বলেছেন, (আওয়াহুন) اواه বলা হয় অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণকারীকে।

সাঈদ এবনে যোবায়ের বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর এবাদতের জন্যে পৃথিবীতে অধিক পরিমাণে ঘোরাফেরা করে তাকেই বলা হয় 'আওয়াহুন'। অন্য একটি বর্ণনায় সাঈদ এবনে যোবায়েরের কথার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যে, এর অর্থ হলো "কল্যাণকর কথার শিক্ষক"।

নখয়ী (রহঃ) বলেছেন, এ শব্দটির অর্থ হলো বুদ্ধিমান। আরবী অভিধান গ্রন্থ কামুসে রয়েছে, এ শব্দটির অর্থ হলো একীন বা পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনকারী, মুনাজাতকারী অথবা মানুষের প্রতি যে অতি মেহেরবান, অথবা বুদ্ধিমান, ঈমানদার।

আবু ওবায়দা (রহঃ) এর অর্থ সম্পর্কে বলেছেন, এ শব্দ দ্বারা সে ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যে আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে আর্তনাদ করতে থাকে, আল্লাহর প্রতি একীনের কারণে কাঁদতে থাকে এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে।

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪২৭

যুযাজ (রহঃ) বলেছেন, আবু ওবায়দার কথা এ ব্যাপারে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। কেননা তাতে সকল দিকের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়েছে।

حليم

"হালীম" শব্দটির অর্থ হলো সহনশীল অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্যের তরফ থেকে কষ্ট পেলে সহনশীলতার পরিচয় দেয়। আর এ গুণটি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য ছিল। কেননা তিনি ছিলেন অত্যন্ত সহনশীল। তাঁর পিতা তাঁকে বলেছিল যদি তুমি তওহিদের প্রচার থেকে বিরত না হও তবে আমি তোমাকে পাথর মেরে মেরে ধ্বংস করবো। কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তার জবাবে বলেছেনঃ দোযখ থেকে আপনার নিরাপত্তা নসিব হোক, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আপনার মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করবো।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "হালীম" শব্দের অর্থ হলো সরদার। আরবী ভাষার অভিধান কামুসে রয়েছে, হেলম্ শব্দের অর্থ হল সহ্য করা, বুদ্ধিমত্তা।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যে কারণে তাঁর পিতার মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করেছেন তা এ বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে অর্থাৎ ইব্রাহীম (আঃ) অত্যন্ত কোমল হৃদয় এবং সহনশীল ছিলেন, তাই তিনি তাঁর পিতার মাগফেরাতের দোয়া করেছেন।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا

শানে নুযুল

মোকাতেল এবং কালবীর বর্ণনা হলো, কিছু লোক নিজ নিজ গোত্রের তরফ থেকে মদীনা মোনাওয়্যারায় হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলো, তখন মদ্যপান নিষিদ্ধ হয়নি। আর বায়তুল মোকাদ্দাসের স্থলে কা'বা শরীফের দিকে ফিরে নামাযের হুকুমও নাযিল হয়নি। এরা ইসলাম গ্রহণ করে এ অবস্থায়ই বাড়ী ফিরে যায়। আর তাদের চলে যাওয়ার পর মদ্যপান নিষিদ্ধ হয় এবং কেবলা পরিবর্তেনের আদেশ জারী হয়। কিন্তু তাদের নিকট এ খবর আসেনি। কিছু দিন পর যখন তারা মদীনা শরীফ এসে এ আদেশ সমূহ সম্পর্কে অবগত হন তখন তারা আরজ করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমরা এ সময়ে আপনার পথের অনুসারী ছিলাম না। এর মধ্যে আমরা মদ্য পান করেছি আর বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে নামায আদায় করেছি, এখন আমাদের কি হবে? তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেন।[১]

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا

"আর আল্লাহ পাক কোন জাতিকে পথে আনার পর পথভ্রষ্ট করেন না, যে পর্যন্ত না তাদের আত্মরক্ষার বিষয় সমূহ তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বলে না দেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী"।

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪২৯

পূর্ববর্তী আয়াতে মোমেনদেরকে তাদের মুশরেক আত্মীয়-স্বজনের জন্যে এস্তেগফার করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর অবস্থা এই যে, মুসলমানগণ এ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে নিজ নিজ কাফের পূর্ব পুরুষদের জন্যে দোয়া করছিলেন। যখন এ আয়াত নাযিল হলো এবং কাফেরদের জন্যে দোয়া করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো, তখন তারা ভীত সন্ত্রস্ত হলেন যে, আমাদের কি অবস্থা হবে, আমরা যে ইতিপূর্বে নিষিদ্ধ কাজ করে ফেলেছি! তাই আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ পাক তাদের ভয় দূর করে দিলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে যারা মুশরেক আত্মীয়-স্বজনের জন্যে দোয়া করেছিল তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে না। তবে এ নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরও যদি কেউ কাফের আত্মীয়-স্বজনের জন্যে দোয়া করে তবে সে অপরাধী হবে।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর পিতৃব্য সম্পর্কে এরশাদ করেছিলেনঃ যতক্ষণ আমাকে নিষেধ না করা হয় ততক্ষণ আমি আপনার মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করতে থাকবো। আলোচ্য আয়াত দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবু তালেব সম্পর্কে দোয়া করার যে কথা বলেছিলেন তা মুশরেকদের ব্যাপারে দোয়া নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার পূর্বেকার ছিল।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতে বিশেষ করে সেই মোমেনদের সম্পর্কে হুকুম নাযিল হয়েছে যারা তাদের কাফের আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে দোয়া করছিলেন, তবে এ হুকুম সকল ব্যাপারেই প্রযোজ্য অর্থাৎ কোন ব্যাপারে আদেশ জারী হওয়ার পূর্বের কোন কাজ অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে না, এটি একটি সাধারণ নীতি হিসেবে ঘোষিত হল।

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক সব বিষয়ে মহাজ্ঞানী"। অর্থাৎ না জানা অবস্থায় কে এমন কাজ করেছে, আর কে আল্লাহর নাফরমানী করে এ কাজ করেছে, কে পথভ্রষ্ট বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য, আর কে পথভ্রষ্ট নয় এসব বিষয়ে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত, তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই।

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَمَا لَكُم مِّن
دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١١٦﴾ لَقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ
الْمُهٰجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا
كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ
رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾

তরজমা

(১১৬) আসমান জমীনের সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যুমুখে পতিত করেন, আর তোমাদের জন্যে আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কোন অভিভাবক নেই, কোন সাহায্যকারীও নেই।

(১১৭) নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সদয় হয়েছেন নবীর প্রতি এবং মোহাজের ও আনসারদের প্রতি, যারা সংকট মুহূর্তে তাঁর অনুগমন করেছিল এমনকি, যখন তাদের কারো মন ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, অতঃপর আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি তাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াদ্র, পরম করুণাময়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের নির্দেশ ছিল এমনকি, মৃত কাফের আত্মীয়-স্বজনের জন্যে এস্তেগফার করা পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, আসমান জমীনের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ পাক। নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সার্বভৌম ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই, তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান। আসমান জমীনের সব কিছু তথা সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি তাঁর কর্তৃত্বাধীন, নিয়ন্ত্রণাধীন। আর তিনি যখন তোমাদের সাহায্যকারী এমন অবস্থান কাফেররা তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হবেনা। তাই কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ হলে, কাফের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলে তোমাদের ক্ষতির কোন আশঙ্কা নেই। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ط

নিশ্চয় আসমান জমীনের মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই, জীবন দান করা এবং মৃত্যুমুখে পতিত করা আল্লাহ্ পাকেরই কাজ।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ এতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কেননা, জীবন ও মৃত্যু আল্লাহ্ পাকেরই হাতে। জেহাদে অংশ গ্রহণ করলেই যে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হবে তা নয়; আর জেহাদ থেকে বিরত থাকলেই যে মৃত্যু থেকে আত্মরক্ষা করা যাবে তাও নয়; বরং জীবিত রাখা এবং মৃত্যু ঘটানো-এক আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জিরই ব্যাপার। অতএব, তোমাদের কর্তব্য হল আল্লাহ্ পাকের প্রতি ভরসা করা। আর একথা চিরসত্য হিসেবে জেনে রাখা যে–

وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

"আল্লাহ্ পাক ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং কোন সাহায্যকারীও নেই, যে তোমাদেরকে আল্লাহ্ পাকের আযাব থেকে রক্ষা করবে"।

অতএব, তোমাদের কর্তব্য হল সর্বক্ষণ আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, তাঁর যাবতীয় হুকুম মেনে চলা, তাঁর দুশমনদের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক না রাখা, তাদের জীবদ্দশায় এমনকি, মৃত্যুর পরও তাই তাদের জন্যে এস্তেগফার করারও কোন যৌক্তিকতা নেই।

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ

যেহেতু তাবুকের যুদ্ধের সময় মুসলমানদের কঠিন সংকটের মোকাবেলা করতে হয়েছে, পথ ছিল সুদীর্ঘ এবং দুর্গম, তাপমাত্রা ছিল অত্যধিক, সফরের আসবাবপত্র ছিল নামে মাত্র।

বিশেষতঃ রসদের অভাব ছিল অত্যন্ত প্রকট। প্রত্যেক দু'জনের জন্যে দৈনিক একটি করে খেজুর বরাদ্দ ছিল, অবশেষে তাও সম্ভব হয়নি, তাই কয়েক ব্যক্তি একটি মাত্র খেজুরের দানা চুষে নিতেন, এরপর একটু পানি পান করতেন। কিন্তু সংকট আরও প্রকটতর হল যখন পানির অভাব দেখা দেয়, তখন সাহাবায়ে কেরাম প্রাণ রক্ষার্থে উষ্ট্রের ভুড়ি নিংড়িয়ে পর্যন্ত পান করতে বাধ্য হয়েছেন। অন্যদিকে যানবাহনের যে অভাব ছিল তা আরও কষ্টদায়ক। একটি উষ্ট্রের পৃষ্ঠে দশজন সাহাবায়ে কেরাম পালাক্রমে আরোহন করেছেন। এমনি করুণ পরিস্থিতিতে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশ পালনে সাহাবায়ে কেরাম যে ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

মূলতঃ তাবুক অভিযান ছিল মুসলিম জাতির জীবনে এক কঠিন পরীক্ষা, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সহজ কাজ ছিলনা। ঐ কঠিন মুহূর্তে মানবিক দুর্বলতার কারণে কারো কারো মন দমে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এমন সংকটময় মুহূর্তে আল্লাহ পাকই তাঁদেরকে রক্ষা করেছেন। এটি ছিল আল্লাহ পাকের.করুণা এবং মেহেরবানী। এ করুণা এবং মেহেরবানী হলো অনন্ত অসীম।

আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে সেই সংকটময় মুহূর্তে তাঁর দয়া এবং মেহেরবানীর কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং এমন অবস্থায় মানব মনের দমে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয় কিন্তু আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য লোকদের শানের খেলাফ, তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন–

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ

নিশ্চয় আল্লাহ পাক সদয় হয়েছেন তাঁর নবীর প্রতি এবং মোহাজের ও আনসারদের প্রতি, যাঁরা কঠিন সংকটময় মুহূর্তে নবীর অনুগমন করেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত করুণাময়, অতীব দয়াবান, তাঁর দয়া এবং মেহেরবানীর কারণেই সেদিন মোমেনগণ রক্ষা পেয়েছেন।

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং মোহাজের ও আনসারদের অবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করেছেন, মুনাফেকদেরকে তাবুকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার যে অনুমতি দিয়েছেন তা আল্লাহ পাক মাফ করে দিয়েছেন। অথবা বাক্যটির অর্থ হল আল্লাহ পাক তাঁদেরকে গুনাহগার হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তাতে তওবার প্রতি অনুপ্রেরণা রয়েছে। কেননা, এমন কোন ব্যক্তি নেই যে তওবার মুখাপেক্ষী না হয়। আলোচ্য আয়াতে তওবার ফজিলতের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে কেননা, তওবা আম্বিয়ায়ে কেরাম ও নেককার লোকদের বিশেষ মর্তবা। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে নবীর উল্লেখ ভূমিকা স্বরূপ করা হয়েছে। কেননা, সাহাবায়ে কেরামের তওবা কবুল হওয়ার মাধ্যমই হলেন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এজন্যে তাঁর নাম ভূমিকা স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে–

لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِی الْقُرْبٰی (সূরা আনফাল)

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাকের নাম ভূমিকা স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে।[১]

وَالْاَنْصَارِ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوْهُ فِیْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ

"আর আনসারগণ যারা কঠিন সংকটের সময় (হযরত) রসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) অনুগমন করেছিল"। পথের পাথেয় রসদ, যানবাহন এক কথায় সব বিষয়েই তাবুক অভিযানে ছিল চরম কষ্ট।

ইমাম আহমদ, এবনে খোজায়মা, এবনে হাব্বান এবং হাকেম হযরত ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, আমরা অত্যন্ত গরমের দিনে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হয়ে তাবুকের যুদ্ধে রওয়ানা হই। এক মনজিলে অবতরণ করি। এত পিপাসাগ্রস্ত হই মনে হয় যে, পিপাসার কারণে শেষ হয়ে যাব। কেউ কেউ পানির খোঁজে বের হলে মনে করা হত এ লোক জীবিত অবস্থায় ফেরত আসবেনা। আর কোন কোন লোক তাদের উষ্ট্র জবাই করে তার ভুড়ি নিংড়ানো পানি পান করতেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আল্লাহ পাক আপনাকে দোয়া করতে অভ্যস্ত করেছেন (অর্থাৎ আপনি দোয়া করলে, আল্লাহ পাক কবুল করেন) আল্লাহ পাকের নিকট আমাদের জন্যে দোয়া করুন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তুমি কি তাই পছন্দ কর? হযরত আবু বকর (রাঃ) আরজ করলেন, জ্বী-হ্যাঁ। তখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দু' হাত আসমানের দিকে উত্তোলন করে মোনাজাত করলেন। মোনাজাত শেষ করার পূর্বেই মুসলমানদের উপরে মেঘমালা জমে এবং বৃষ্টিপাত শুরু হয়, যার কাছে যা পাত্র ছিল সবাই তা পরিপূর্ণ করে নিল। তখন আমরা দেখতে বের হলাম (কোথায় কোথায় বৃষ্টি হয়েছে)? জানা গেল মুসলিম বাহিনীর এলাকার বাইরে কোথাও বৃষ্টি হয়নি।

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৩০

এবনে আবি হাতেম হযরত আবু হারজা আনসারীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, লোকেরা হাজর নামক স্থানে অবতরণ করেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আদেশ দিলেন এখানকার পানি যেন কেউ পান না করে। এর পরবর্তী মনজিলে অবতরণ করা হলে লোকেরা পানি না থাকার অভিযোগ করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দু' রাকাআত নামায আদায় করে দোয়া করলেন। তখন সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ পাক মেঘমালা প্রেরণ করলেন। ফলে এত বৃষ্টিপাত হল যে, সকলেই তৃপ্তি লাভ করলেন। একজন আনসারী সাহাবী তাঁর সাথীকে (যাকে মুনাফেক মনে করা হতো) বললেন, দেখ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দোয়ার বরকতে আল্লাহ পাক আমাদের প্রতি বৃষ্টি নাযিল করেছেন। সে মুনাফেক বললো, বৃষ্টিতো অমুক অমুক নক্ষত্রের উদিত হওয়ার কারণে হয়ে থাকে। তখন নাযিল হল–

وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ (সূরা ওয়াকেয়াহ)

مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ

"যখন কারো কারো মন ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল"।

সফরের চরম কষ্টের কারণে কারো কারো মন অভিযান পরিত্যাগ করে বাড়ী ফিরে যাওয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

কালবী (রঃ) বলেছেন, কেউ কেউ সফরের অসহনীয় কষ্টের কারণে অভিযান থেকে সরে দাঁড়াবার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরিণাম চিন্তা করার পর পুনরায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছে গেছেন।

এবনে এসহাক এবং মোহাম্মদ এবঁনে ওমর বর্ণনা করেন, কিছু লোকের ইচ্ছা অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। যাওয়ার আগ্রহ ছিল, কিন্তু আজ যাব কাল যাব বলে বিলম্ব করেছিলেন যেমন কা'ব এবনে মালেক, হেলাল এবনে উমাইয়া, মোরারা এবনে রবী।

এবনে এসহাক হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদের (রাঃ) বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন তাবুকের জন্যে রওয়ানা হলেন তখন কিছু লোক পেছনে রয়ে গেলেন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! অমুক পেছনে রয়ে গেছেন। তিনি এরশাদ করলেন, তাকে ছেড়ে দাও, যদি তার অংশ গ্রহণে কোন কল্যাণ থাকে তবে আল্লাহ্ পাক তাকে পেছন থেকে এনে তোমাদের সঙ্গে মিলিত করবেন। অথবা আমি তার সম্পর্কে আল্লাহ পাকের আদেশের অপেক্ষা করবো। অবশেষে দেখা গেল হযরত আবু জর (রাঃ) পেছনে রয়ে গেছেন।

লোকেরা বললো ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আবুজর পেছনে রয়ে গেছেন, কারণ তাঁর উষ্ট্র চলতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পূর্বের ন্যায় জবাব দিলেন। হযরত আবু জর (রাঃ) তাঁর উষ্ট্রকে চলমান করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। এরপর তাঁর মালামাল বেঁধে স্বীয় পৃষ্ঠে নিয়ে চলতে শুরু

করলেন। অবশেষে এমন জায়গায় পৌঁছলেন যেখান থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখা যায়। একজন তাঁকে দেখে আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! এক ব্যক্তি পদব্রজে একাকী চলছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আবুজর হলে ভাল হয়। লোকেরা আমার দিকে ভালভাবে দেখে আরজ করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আল্লাহর শপথ, সে আবু জর-ই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করলেনঃ আবু জরের প্রতি আল্লাহর রহমত হোক, সে একাকী চলছে, একাই হবে তার মৃত্যু।

মোহাম্মদ এবনে ইউসুফ সালেহী (রঃ) বর্ণনা করেন, অবশেষে তাই হয়েছে। এরপর যখন হযরত আবুজর (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলেন, তিনি এরশাদ করলেনঃ আবু জর আমার নিকট পৌঁছতে তোমার যত পদক্ষেপ উঠছে তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে আল্লাহ পাক তোমার এক একটা গুনাহ মাফ করেছেন।

তেবরানী হযরত আবু খায়সামা (রাঃ)-এর সূত্রে, এবনে এসহাক এবং মোহাম্মদ এবনে ওমর তাঁদের শেখের সূত্রে বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাবুকের অভিযানে রওয়ানা হবার পর যখন কয়েক দিন অতিবাহিত হলো তখন এক দিন আবু খায়সামা (রাঃ) তাঁর ঘরে পৌঁছলেন। অত্যন্ত গরমের সময় ছিল। তিনি লক্ষ্য করলেন, বাগানে তাঁর দুজন স্ত্রী ছায়াদার স্থানে ভিন্ন ভিন্ন আরামের ব্যবস্থা করেছেন এবং আবু খায়সামার জন্যে পানি ঠান্ডা করে রেখেছেন। সেখানে পৌঁছে এসব প্রস্তুতি দেখে বললেনঃ সোবহানাল্লাহ! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগের পরের সমস্ত ত্রুটি আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দিয়েছেন।

এতদসত্ত্বেও এ দ্বিপ্রহরের গরমে তিনি অস্ত্র কাঁধে নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে পড়েছেন। আর আবু খায়সামা তৈরী খাবার এবং মনোরম পরিবেশে নিজের পরিবারবর্গের মধ্যে বসে আছে। এটি বিচারের কথা নয়, আল্লাহর শপথ! আমি স্ত্রীদের কারো ঘরেই প্রবেশ করবো না; বরং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেছন থেকে পৌঁছে যাব। তোমরা উভয়ে আমার সফরের আসবাবপত্র তৈরী করে দাও। এরপর তিনি তাঁর উষ্ট্রে আরোহন করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলেন। দূর থেকে যখন তাঁকে লোকেরা দেখলো তখন তারা বললো কোন আরোহী আসছে। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আবু খায়সামা হবে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেনঃ আল্লাহর শপথ! সে আবু খায়সামাই।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবু খায়সামাকে বললেনঃ আবু খায়সামা! তোমার অকল্যাণ হোক। আবু খায়সামা (রাঃ) তাঁর ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর ব্যাপারে কিছু ভাল কথা এরশাদ করলেন এবং তাঁর জন্যে দোয়া করলেন।

ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ

এরপর আল্লাহ পাক তাদের প্রতি সদয় হলেন, পূর্ববর্তী আয়াতে মুনাফেকদেরকে জেহাদে শরীক না হওয়ার অনুমতি প্রদানের প্রতি তওবা কবুল করার ঘোষণা ছিল। আর

এ বাক্যাংশে মুনাফেকদের সাথে সম্পর্কের কারণে মনে যে বক্রতার সৃষ্টি হয়েছিল তা মাফ করার ঘোষণা রয়েছে।

অথবা প্রথম আয়াতে তওবা করার তওফিক দানের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল, আর এ আয়াতে ঘোষিত হয়েছে তওবা কবুল হওয়ার কথা।

إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান, পরম দয়ালু"।

আল্লামা বগভী লিখেছেন, আল্লাহ পাক যাদের প্রতি দয়া করার কথা ঘোষণা করেছেন তাদেরকে ঐ গুনাহর কারণে কোন দিন শাস্তি দেবেন না।

وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْۤا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۱۸﴾

তরজমা

(১১৮) আর আল্লাহ পাক ক্ষমা করলেন, ঐ তিনজনকেও যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিলো, অবশেষে পৃথিবী বিরাট বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্যে তা সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং জীবন তাদের জন্যে দুর্বিষহ হয়ে পড়ে, আর তারা এ সত্য উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন আশ্রয়-স্থল নেই। তখন আল্লাহ পাক তাদের প্রতি সদয় হন যেন তারা ফিরে আসে। নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

তফসীরুল কোরআন

হযরত কা'ব এবনে মালেক (রাঃ), হযরত হেলাল এবনে উমাইয়া, হযরত মুরারা এবনে রাবী-এই তিনজন সাহাবী নিতান্ত অলসতার কারণে তাবুকের যুদ্ধ থেকে বিরত থাকেন, তাঁরা সকলেই আনসারী ছিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন মুনাফেকরা মিথ্যা অজুহাত পেশ করে বিদায় নেয়। হযরত আবু লোবাবা (রাঃ) সহ আরো কয়েকজন সাহাবী তাবুক যুদ্ধে শরীক না হওয়ার কারণে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে নিজেদেরকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখেন এবং অবশেষে আল্লাহ পাক তাঁদেরকে ক্ষমা করেন। কিন্তু হযরত কা'ব এবনে মালেক (রাঃ) এবং তাঁর দু' সঙ্গী এমন কিছু করেননি তবে তাঁরা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেন। ফলে তাঁদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ তখন মুলতবী রাখা হয়।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে হযরত কা'ব এবনে মালেক (রাঃ) বর্ণিত এ ঘটনা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। হযরত কা'ব এবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি তাবুক ব্যতীত প্রায় সকল যুদ্ধেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। তবে আমি বদরের যুদ্ধে শরীক হইনি। আর এজন্যে কোন অভিযোগও উঠেনি। কেননা, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোরায়শের বাণিজ্য কাফেলার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন (যুদ্ধের কোন ইচ্ছা ছিলনা) তবে কোন নিদৃষ্ট অঙ্গীকার ব্যতীতই দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই হয়ে গেছে। মদীনা শরীফ থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে তৃতীয় যে দলটি মক্কায় গমন করে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাতে বয়আত করে, আমি তাঁদের মধ্যেও ছিলাম।

হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, অত্যন্ত কঠিন সময়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাবুক যুদ্ধের নির্দেশ প্রদান করেন। যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ জেহাদের কথা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন তাই সকলেই নিজেদের সামর্থ মোতাবেক এর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তখন আল্লাহর রহমতে আমার কোন অভাব ছিল না। আমার আরোহণের জন্যে দু'টি উষ্ট্র ছিল। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, যে কোন সময় আমি রওয়ানা হয়ে তাঁদের নিকট পৌঁছতে পারি। এতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এমনি অবস্থায় ত্রিশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামসহ তাবুকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আমি পেছনে রয়েই গেলাম। এভাবে আমার দুর্ভাগ্যের ইতিহাস রচিত হল। তাবুকের যুদ্ধে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য আমার হল না।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন তাবুক পৌঁছেন তখন তিনি আমার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন এই বলে, কা'বের খবর কি? এ প্রশ্নের জবাবে এক ব্যক্তি বলেছিলেন, তার আরাম-আয়েশের অহংকার তাকে বেঁধে রেখেছে, আসতে দেয়নি। হযরত মুআজ এবনে জবল (রাঃ) একথা শ্রবণ করে বললেন, তোমার ধারণা ভুল, আমি তাকে ভাল করেই জানি এবং সে যে অত্যন্ত ভাল মানুষ তাও জানি। কখনও তাকে কোন মন্দ কাজ করতে দেখিনি। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন সম্পূর্ণ নীরব থাকেন।

হযরত কা'ব (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তাবুক গমনের পর মদীনা মোনাওয়্যারার দৃশ্য দেখে আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত হই এবং নিজেকে বদ নসীব মনে করি। সারা মদীনাতে যাদের দেখি তারা হয়ত অক্ষম মুসলমান বা মহিলা অথবা খাঁটি মুনাফেক। এতদ্ব্যতীত আর কেউ নেই। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যাবর্তন করার পর তাঁর মহান দরবারে আমার অপরাধের কি সাফাই পেশ করব, তা নিয়ে অনেক চিন্তা-চর্চা করেছি। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়েছি একটি কথাও মিথ্যা বলবনা, একমাত্র সত্যবাদিতাই আমাকে রক্ষা করতে পারে, অন্য কিছু নয়।

আমার সর্বাধিক চিন্তার কারণ ছিল এই যে, যদি বর্তমান অবস্থয় আমার মৃত্যু হয়, তবে কোন মুসলমান আমার জানাযা আদায় করবেনা, আর এর চেয়ে বড় বদ নসিবী আর কি হবে?

আর আল্লাহ্ না করুন, যদি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হয় তবে মুসলমানগণ চিরদিন আমার সাথে কি ব্যবহার করবে, আর তা কত কষ্টদায়ক হবে!

এবনে সা'দ বর্ণনা করেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিয়ম ছিল সফর থেকে সকালের দিকে মদীনা শরীফ পৌঁছতেন, সর্বপ্রথম মসজিদে গমন করে দু' রাকাআত নামায আদায় করতেন, কিছুক্ষণ মসজিদে বসে হযরত ফাতেমার গৃহে তশরীফ নিয়ে যেতেন, এরপর উম্মুল মুমেনীনদের গৃহে তশরীফ নিতেন।

নিয়ম মাফিক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন করেও) প্রথমে মসজিদে গমন করেন, দু' রাকাআত নামায আদায় করেন, এরপর মানুষের অবস্থা শ্রবণের জন্যে সেখানেই উপবিষ্ট হলেন। এরপর তাবুকের যুদ্ধে যারা অংশ গ্রহণ করেনি সে সব লোক আসতে লাগলো এবং নিজ নিজ ওজর-আপত্তি পেশ করে শপথ করলো। এদের সংখ্যা আশি জনের কিছু উপরে ছিল।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের প্রকাশ্য ওজর কবুল করলেন, তাদের থেকে বয়আত গ্রহণ করে তাদের প্রকৃত বিষয়টি আল্লাহ্ পাকের হাতে সোপর্দ করলেন। যখন আমি হাযির হয়ে তাঁকে সালাম করলাম, তিনি মুচকি হাসলেন। ঐ হাসি ছিল ক্রোধ মিশ্রিত। এরপর তিনি এরশাদ করলেন, আস। আমি তাঁর নিকট পৌঁছে বসলাম। এবনে আবেদ বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কা'বের দিক থেকে চেহারা মোবারক ফিরিয়ে নিলেন, কা'ব (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমার তরফ থেকে চেহারা কেন ফিরিয়ে নিয়েছেন? আল্লাহ্‌র শপথ! আমি মুনাফেক নই। ইসলামের সত্যতায় আমার কোন সন্দেহ নেই এবং ইসলামের আকিদার ব্যাপারে আমার কোন পরিবর্তনও হয়নি। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ তাহলে তুমি তাবুক অভিযানে আমার সঙ্গী হওয়া থেকে কেন বিরত রইলে?

তুমি কি যানবাহন ক্রয় করনি? তখন আমি আরজ করলাম, অবশ্যই (আমি যান বাহন ক্রয় করেছি)।

ইয়া রসূলাল্লাহ! যদি আমি এখন কোন দুনিয়াদার লোকের নিকট বসতাম তবে কোন অজুহাত পেশ করে তার অসন্তুষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করতাম। কেননা আমার বাকশক্তি রয়েছে। যদি আমি মিথ্যা কথা বলে আপনাকে রাজিও করে ফেলি কিন্তু আল্লাহ্ পাক অচিরেই আপনাকে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেবেন। আর যদি আমি সত্য কথা বলি তবে হয়তো আপনি এখন অসন্তুষ্ট হবেন কিন্তু আশা আছে যে, আল্লাহ্ পাক আমাকে মাফ করে দেবেন।

আল্লাহ্‌র শপথ! আমার কোন ওজর বা অসুবিধা ছিলনা, আর এর পূর্বে আমি এত অবস্থা সম্পন্নও ছিলাম না।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করেনঃ "সে সত্য কথা বলেছে। এখন তুমি চলে যাও"। আল্লাহ্ পাক তাঁর মর্জি মোতাবেক তোমার সম্পর্কে ফয়সালা করবেন।

আমার সত্য কথা বলার কারণে বনী সালমা গোত্রের কিছু লোক উত্তেজিত হয়ে বললো, তুমি ইতিপূর্বে কোন অপরাধ করোনি আর তুমি এমন দুর্বলও নও যেভাবে অন্যরা ওজর-আপত্তি পেশ করে আত্মরক্ষা করেছে, তুমিও তা করতে পারতে এবং আল্লাহর রসূল তোমার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করে দিতেন, গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিল। তারা এভাবে আমাকে বলতে থাকে। কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, দুটি অপরাধ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। জেহাদে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে গমন করিনি, এরপর তাঁর নিকট মিথ্যা কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পরে আমি জানতে চেষ্টা করলাম যে, আমার ন্যায় আর কেউ আছে কি? যে তাবুক গমন করেনি এবং কোন ওজর-আপত্তিও পেশ করেনি। লোকেরা বললো, আরো দু'জন এমন লোক রয়েছেন যারা তোমার ন্যায় কথা বলেছেন এবং তাদেরও এ নির্দেশই প্রদান করা হয়েছে যা তোমাকে দেয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম সে দু'জন কে?

লোকেরা বলল মোরারা এবনে রবী উমরী এবং হেলাল এবনে উমাইয়া (রাঃ)। কা'ব (রাঃ) বর্ণনা করেন, লোকেরা আমার নিকট যে দু'জন নেককার লোকের নাম নিয়েছেন তাঁরা বদরের যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন, তাঁদের অনুসরণ করা যায়। তাঁদের নাম শ্রবণ করে আমি আমার কথায় আরো সুদৃঢ় হলাম, যারা তাবুকের যুদ্ধে শরীক হয়নি তাদের মধ্যে আমাদের তিন জনের সম্পর্কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তারা আমাদের সঙ্গে কথা না বলে। এ ফরমান জারি হওয়ার পর আমাদের ব্যাপারে মানুষের আচরণ সম্পূর্ণ বদলে গেল। কেউ আমাদেরকে সালাম দিতনা, কথাও বলতো না। এমনকি আমরা সালাম দিলে তারা জবাবও দিত না। মানুষের মধ্যে এমন পরিবর্তন হলো যেন আমরা তাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। মনে হয় সে দেশ আর নেই যেখানে আমরা ইতিপূর্বে বাস করতাম, সবাই অপরিচিতি।

এ অবস্থা সুদীর্ঘ ৫০টি দিন অব্যাহত ছিল। আমার উভয় সাথী দুর্বল ছিলেন, তারা ঘরে বসে গেলেন, কিন্তু আমি শক্তিশালী যুবক ছিলাম। ঘর থেকে বের হয়ে মুসলমানদের সঙ্গে নামাযে শরীক হতাম। বাজার সমূহে ঘোরাফেরা করতাম। কিন্তু কেউ আমাকে সালাম দিত না। আমার সঙ্গে কথাও বলতো না। নামাযের পর যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে উপবিষ্ট হতেন তখন আমি হাযির হয়ে সালাম পেশ করতাম। মনে মনে বলতাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার সালামের জবাব দিলেন কি-না?

এরপর তাঁর নিকট পৌঁছে নামায আদায় করতাম। আগে পরে দেখতে চেষ্টা করতাম যে, তিনি আমার প্রতি লক্ষ্য করছেন কি-না? আমি যখন নামাযে থাকতাম তখন তিনি আমার দিকে লক্ষ্য করতেন। আর যখন আমি তাঁর দিকে দেখতাম তিনি চেহারা মোবারক ফিরিয়ে নিতেন। আত্মীয়-স্বজন, আপনজন সকলেই আমার সঙ্গে বয়কট করেছে। এমন সময় সিরিয়ার সম্রাটের পক্ষ থেকে আমার নিকট একটি পত্র আসলো। সেই পত্রে আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা হল এবং আমাকে তার নিকট চলে যাওয়ার জন্যে আহ্বান জানানো হল। পত্র পাঠ করে আমি উপলব্ধি করলাম এটিও আমার প্রতি একটি কঠিন পরীক্ষা। এরপর আমি সিরিয়ার সম্রাটের পত্রটি ঘৃণাভরে

অগ্নিতে নিক্ষেপ করি। যখন এ অবস্থায় চল্লিশ রাত অতিবাহিত হল তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে নির্দেশ আসলো আমরা যেন নিজেদের স্ত্রীদের থেকেও পৃথক থাকি। আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীকে তাঁর পিত্রালয়ে প্রেরণ করি এবং এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থানের নির্দেশ প্রদান করি। এভাবে সুদীর্ঘ পঞ্চাশটি দিন অতিবাহিত হয়। বিশাল বিস্তৃত পৃথিবী আমার জন্যে অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। এমন সময় রাতের শেষাংশে সেলা পর্বতের দিক থেকে একটি শব্দ শুনি কেউ বলছেন,

"হে কাব এবনে মালেক! সুসংবাদ"। কথাটি শ্রবণ মাত্রই আমি সেজদায় রত হই। আবদুর রাজ্জাকের সূত্রে কা'বের (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যে, রাতের শেষ প্রহরে তওবা কবুল হওয়ার আয়াত নাযিল হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে এ সুসংবাদ দান করেন। একজন সাহাবী আমাকে এই সুসংবাদ দেয়ার জন্যে ছুটে আসেন, আর অন্যজন পাহাড়ের উপর থেকে উচ্চস্বরে এই সুসংবাদ শুনিয়ে দেন। আমি অত্যন্ত আনন্দিত হওয়ার কারণে আমার গায়ের পোশাকটি খুলে সুসংবাদ বাহককে উপহার দেই। মোহাম্মদ এবনে ওমর বর্ণনা করেন, যিনি পাহাড়ের উপর উঠে সুসংবাদ দিচ্ছিলেন তিনি ছিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ)। লোকেরা দলে দলে আমাকে অভিনন্দন জানাতে আসতে থাকে, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হই। মোহাজেরদের মধ্যে হযরত তালহা (রাঃ) এসে আমার সাথে করমর্দন করেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক তখন অত্যন্ত চমকদার ছিল। তিনি আনন্দ উজ্জ্বল মুখে আমাকে সুসংবাদ দিলেন এভাবে– "আল্লাহ পাক তোমার তওবা কবুল করেছেন"। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আমি সালাম করলাম। তিনি যখন আমাকে সুসংবাদ দিলেন তখন আমি আরজ করলাম, এই সুসংবাদ আপনার তরফ থেকে, না আল্লাহর তরফ থেকে। তিনি এরশাদ করলেন, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে। তোমরা আল্লাহ পাকের সঙ্গে সত্যবাদীতার সঙ্গে কাজ করেছ। আল্লাহ পাক তোমাকে সত্যবাদী বলে ঘোষণা করেছেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদত মোবারক ছিল এই যে, যখন তিনি আনন্দিত হতেন তখন তাঁর চেহারা মোবারক চমকদার হত যেন চন্দ্রখন্ড। আমরা দেখেই বুঝতে পারতাম যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এখন আনন্দিত।

আমি তখন আরজ করলাম, আমার তওবার পরিশিষ্ট স্বরূপ আমি আমার যাবতীয় সম্পত্তি আল্লাহ পাকের রাহে পেশ করতে ইচ্ছা করেছি। তখন তিনি এরশাদ করেন, যাবতীয় সম্পত্তি নয়, কিছু নিজের জন্যে রেখে দেয়া উত্তম। তখন আমি আরজ করলাম, আমার সম্পত্তির অর্ধেক আল্লাহর রাহে দান করি? তিনি এরশাদ করলেন, না। তাহলে আমার সম্পূর্ণ সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ, তিনি বললেন, আচ্ছা, তখন আমি খায়বরের যুদ্ধে গনিমতের যে অংশ পেয়েছিলাম তা রেখে বাকি সমস্ত সম্পত্তি আল্লাহর রাহে দান করি। যেহেতু সত্যবাদীতার শুভ পরিণতি স্বরূপ আল্লাহ পাক আমাকে নাজাত দিয়েছেন, আমার তওবা কবুল করেছেন, তাই আমি প্রতিজ্ঞা করি যে, জীবনে কখনও এবং কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলবো না। এ প্রতিজ্ঞার পর জীবনে অনেক কঠিন পরীক্ষার

সম্মুখীন হয়েছি, কিন্তু আল্লাহ পাকের রহমতে আজ পর্যন্ত আমি কোন মিথ্যা কথা বলিনি। আর আশাকরি যতদিন জীবিত থাকবো আল্লাহ পাক আমাকে মিথ্যা কথা থেকে রক্ষা করবেন। হযরত কা'ব এবনে মালেক (রাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদের তওবা কবুল করার পরই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا। নাযিল করেন।

وَظَنُّوْٓا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ ط

আর তারা এ সত্য উপলব্ধি করলো যে, আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার স্থান আল্লাহ ব্যতীত আর কোথাও নেই। আল্লাহ পাকই তাদেরকে ক্ষমা করতে পারেন, আর কেউ নয়, তিনি ব্যতীত আর কেউ সাহায্যকারী নেই।

খাঁটি তওবা

ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ط

এরপর আল্লাহ পাক তাদের তওবা কবুল করলেন, যেন তারা স্বীয় তওবার উপর কায়েম থাকে। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, খাঁটি তওবা হল এই যে, যদি কারো দ্বারা গুনাহ হয়ে যায় তবে তার মন অস্থির এবং ব্যাকুল হয়ে যাবে, আল্লাহ পাকের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হবে, জীবন দুর্বিষহ হয়ে যাবে। এ বিশাল বিস্তৃত পৃথিবী তার নিকট অত্যন্ত সংকীর্ণ মনে হবে যেমন, এই তিনজন সাহাবীর হয়েছিল।[১]

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান"। হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক রাত্রে (তওবা কবুল করার জন্য) স্বীয় দস্তে মোবারক প্রসারিত করেন যেন যারা দিনে গুনাহ করেছে (রাত্রে) তওবা করে। আর দিনে তিনি স্বীয় দস্তে মোবারক প্রসারিত করে দেন যেন রাত্রে যে গুনাহ করেছে (দিনে) তওবা করে। এ ব্যবস্থা সেদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে যেদিন সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হবে অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত তওবার দ্বারা উন্মুক্ত থাকবে। যখন সূর্য পশ্চিম গগনে উদিত হবে তখন তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। (মুসলিম শরীফ)

আলোচ্য আয়াতে رحيم শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে تواب শব্দের পর। এর তাৎপর্য হল এই, আল্লাহ পাক তওবা কবুল করেন শুধু তাঁর দয়া ও মেহেরবানীর কারণে কেননা, তিনি অত্যন্ত দয়াময়।[২]

তফসীরকারগণ বলেছেন, এ পর্যায়ে একথা প্রনিধাণযোগ্য যে, কোন অবস্থাতেই আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। বন্দা যখনই আল্লাহ পাকের দিকে

১। তফসীরে মাজহাবী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৩৪-৪০

২। তফসীরে কবীর খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-২২০

মনোনিবেশ করে এবং কৃত অন্যায়ের জন্যে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্ পাকের দরবারে তওবা করে, আল্লাহ্ পাক তার তওবা কবুল করেন, তিনি তাকে ক্ষমা করেন কেননা, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়, তাঁর দয়া মায়া অনন্ত অসীম।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদি কোন মরুভূমিতে (ভ্রমণরত অবস্থায়) কোন পথিকের উষ্ট্রি হারিয়ে যায় আর উষ্ট্রির পিঠেই থাকে সেই পথিকের পানাহারের যাবতীয় সামগ্রী, উক্ত পথিক উষ্ট্রিকে খুঁজে না পেয়ে নিরাশ হয়ে একটি বৃক্ষের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে, এরপর হঠাৎ তার চক্ষু খুলে যায় সে তার উষ্ট্রিকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে উষ্ট্রির রশি ধরে ফেলে এবং অত্যন্ত আনন্দিত হওয়ার কারণে (তার রসনা নিয়ন্ত্রণহারা হয়ে যায়) এবং সে বলে বসে "হে আল্লাহ! তুমি আমার বন্দা, আমি তোমার রব (নাউজুবিল্লাহ মিন জালেক") অর্থাৎ খুশিতে আত্মহারা হয়ে এমন অবাস্তব কথা বলে বসে, এই পথিক উষ্ট্রি পাওয়ার কারণে যত খুশি হয় তার চেয়ে অধিকতর খুশি হন আল্লাহ্ পাক যখন কোন বন্দা আল্লাহর নিকট তওবা করে।[১] (মুসলিম শরীফ)

বস্তুতঃ তওবার গুরুত্ব সমধিক। হাদীস শরীফে এর অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوۡنُوۡا مَعَ الصّٰدِقِيۡنَ ﴿۱۱۹﴾ مَا كَانَ
لِاَهۡلِ الۡمَدِيۡنَةِ وَمَنۡ حَوۡلَهُمۡ مِّنَ الۡاَعۡرَابِ اَنۡ يَّتَخَلَّفُوۡا عَنۡ رَّسُوۡلِ
اللّٰهِ وَلَا يَرۡغَبُوۡا بِاَنۡفُسِهِمۡ عَنۡ نَّفۡسِهٖ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمۡ لَا يُصِيۡبُهُمۡ
ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخۡمَصَةٌ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَـُٔوۡنَ مَوۡطِئًا يَّغِيۡظُ
الۡكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوۡنَ مِنۡ عَدُوٍّ نَّيۡلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمۡ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ؕ اِنَّ
اللّٰهَ لَا يُضِيۡعُ اَجۡرَ الۡمُحۡسِنِيۡنَ ﴿۱۲۰﴾ وَلَا يُنۡفِقُوۡنَ نَفَقَةً صَغِيۡرَةً
وَّلَا كَبِيۡرَةً وَّلَا يَقۡطَعُوۡنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمۡ لِيَجۡزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحۡسَنَ
مَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۲۱﴾ وَمَا كَانَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ لِيَنۡفِرُوۡا كَآفَّةً ؕ فَلَوۡلَا
نَفَرَ مِنۡ كُلِّ فِرۡقَةٍ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوۡا فِى الدِّيۡنِ وَلِيُنۡذِرُوۡا
قَوۡمَهُمۡ اِذَا رَجَعُوۡۤا اِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُوۡنَ ﴿۱۲۲﴾ ع

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৪২

তরজমা

(১১৯) হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।

(১২০) মদীনাবাসী এবং তাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামীন লোকদের পক্ষে শোভনীয় নয় যে, তারা আল্লাহর রসূলের সঙ্গ থেকে পেছনে থাকে এবং রসূলের জীবন থেকে নিজেদের জীবনকে অধিকতর ভালবাসে, কেননা আল্লাহর রাহে তাদের তৃষ্ণা ক্লান্তি, ক্ষুধার কষ্ট এবং কাফেরদেরকে উত্তেজিত করে এমন যত পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করে এবং শত্রুর নিকট থেকে যা কিছু তারা কেড়ে আনে তার বিনিময়ে তাদের জন্যে সওয়াব লিখিত হয়ে থাকে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক নেককারদের সওয়াব বিনষ্ট করেন না।

(১২১) এবং তারা ছোট বড় যা কিছুই ব্যয় করে এবং যে কোন প্রান্তরই অতিক্রম করে তাও তাদের জন্যে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে, কেননা তারা যা কিছু করে আল্লাহ পাক তাদেরকে তার চেয়ে উৎকৃষ্টতর পুরস্কার দান করতে ইচ্ছা করেন।

(১২২) আর মোমেনদের সকলের এক সঙ্গে অভিযানে বের হওয়া উচিত নয়, তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বহির্গত হয় না, যারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে হয়তো তারা সতর্ক হবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, হযরত কা'ব এবনে মালেক (রাঃ) এবং তাঁর দু'জন সঙ্গীকে আল্লাহ পাক তাদের সত্যবাদীতার কারণে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাকে এবং সত্যবাদীদের সঙ্গ অবলম্বন কর। এ আয়াতে মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে দু'টি নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। একটি তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করা, আর দ্বিতীয়টি হল সত্যবাদীদের সঙ্গ অবলম্বন করা এবং মুনাফেকদের সঙ্গ পরিহার করা।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈমানের পরই তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করা একান্ত জরুরী। এরপর সত্যবাদী এবং নেককারদের সঙ্গ অবলম্বন করা পক্ষান্তরে, মুনাফেকদের তথা কাফের ও সকল মন্দ লোকের সঙ্গ পরিহার করা কর্তব্য।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর অর্থাৎ আল্লাহর রসূলের বিরোধিতার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর।

وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

আর তোমরা সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক তথা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে থাক, জেহাদে অংশ গ্রহণ কর, জেহাদ থেকে বিরত হয়োনা, মুনাফেকদের সঙ্গে ওঠা-বসা করোনা। প্রশ্ন হতে পারে যে, এর তাৎপর্য হবে এই যে, যতদিন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম পৃথিবীতে ছিলেন শুধু সে সময়ের জন্যে এ আয়াতের মর্ম কার্যকর হবে? ইমাম রাজী (রঃ) এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেন না, কথা এমন নয়–

انه محمول على ان يكونوا على طريقة الصادقين

বরং এর অর্থ হলো তোমরা সত্যবাদীদের অনুসারী হও, তথা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের অনুসরণ কর এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামের পথে চল।[১]

এ আয়াত দ্বারা যেমন একথা প্রমাণিত হয় যে, ঈমানের পরই তাকওয়া পরহেযগারীর গুণ অর্জন করা একান্ত জরুরী, ঠিক এমনিভাবে একথাও প্রমাণিত হয় যে, নেককার লোকদের সংসর্গ লাভ করা এবং মন্দ লোকদের থেকে দূরে থাকা একান্ত প্রয়োজন যেন সংক্রামক ব্যাধির মত মন্দ চরিত্রের সংক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। কুষ্ঠ রোগীর নিকট থেকে মানুষ দূরে থাকে এই ভয়ে যেন এই দূরারোগ্য ব্যাধি তার মধ্যে সংক্রমিত না হয়, ঠিক তেমনি আত্মিক দিক থেকে যারা রুগ্ন, যারা আমল আখলাক ও চরিত্রের দিক থেকে ঘৃণ্য পথের পথিক তাদের থেকেও দূরে থাকা কর্তব্য। বিখ্যাত সাধক কবি শেখ সাদী (রঃ) তাই বলেছেন,

گلِ خوشبوے در حمام روزے = رسید از دست محبوبے بدستم

بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری = کہ از بوے دلاویز تو مستم

بگفتا من گلے ناچیز بودم = ولیکن مدتے با دل نشستم

جمال ہمنشیں در من اثر کرد = وگرنہ من ہماں خاکم کہ ہستم

"আমি একদিন একটি সুগন্ধি মাটির টুকরা পেলাম, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি কস্তরী? আমি যে তোমার খুশবুতে মাতোয়ারা হয়ে পড়েছি। সে বললো, আমি অধম মাটি, তবে অনেক দিন ফুলের সঙ্গে অতিবাহিত করেছি কেননা আমার অবস্থান ছিল ফুল গাছের নীচে, আমার সঙ্গীর গুণ আমার মধ্যে এ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। ফুলের খুশবুতে আমি খুশবুদার হয়েছি, অথচ আমি আসলে মাটিই, আর কিছুই নই"।[২]

এজন্যে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে মোমেনদেরকে সত্যবাদীদের সঙ্গ অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

---

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-২২০-২১

[২]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪১৯

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

হে ঈমানদারগণ! সত্য মিথ্যার পরিণাম তোমরা স্বচক্ষে দেখলে, মুনাফেকরা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল, মিথ্যা ওজর-আপত্তি পেশ করে আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল কিন্তু শেষ রক্ষা হলোনা, বরং তারা চিরদিনের জন্যে অভিশপ্ত হল, অথচ তার পাশাপাশি এই তিনজন সাহাবায়ে কেরাম তাঁরাও তাবুকের জেহাদে গমনে করেননি কিন্তু মিথ্যার আশ্রয় নেননি; বরং যা সত্য তা প্রকাশ করেছেন, আর তাঁদের এ সত্যবাদীতার কারণেই আল্লাহ পাক তাঁদেরকে ক্ষমা করেছেন। অতএব, হে মোমেনগণ! তোমরাও চিরদিন সত্যবাদী থাক, সত্য পরায়ণ লোকদের সঙ্গে থাক এবং সর্বক্ষণ আল্লাহ্ পাককে ভয় করতে থাক। কেননা, আল্লাহর ভয়ই মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করে। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নাফরমানী এবং আযাবকে ভয় কর এবং যারা সত্যবাদী তাদের সঙ্গে থাক অর্থাৎ যারা ঈমানের দাবীতে সত্য, যারা কথায় কাজে সত্য, যারা নিয়তে এবং এখলাসে সত্য, যারা অঙ্গীকার রক্ষায় সত্য, সত্যবাদীতা যাদের বৈশিষ্ট্য তোমরা তাদের সঙ্গে থাক। সততা এবং সত্যবাদীতার গুণ অর্জন কর এবং যত্ন সহকারে তার হেফাজত কর।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, তোমরা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে থাক তথা তাঁর অনুসরণ কর, আর মুনাফেকদের মত হয়োনা।

সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) الصادقين এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ তাঁরা হলেন হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ) অর্থাৎ তোমরা হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর সঙ্গী হও তথা তাঁদের অনুসারী হও।

যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতে মুসলমানদেরকে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর অনুসারী হওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। অন্য একটি বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি রয়েছে। তিনি বলেছেন, তোমরা হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে থাক তথা তাঁর অনুসারী হও। এবনে যোরায়েহ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে الصادقين অর্থ মোহাজেরীন। মোহাজেরীনদেরকেই আলোচ্য আয়াতে الصادقين বলা হয়েছে। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের الصادقين অর্থ সে সব লোক যারা সততার সাথে নিজেদের দোষ স্বীকার করেছে, কোন মিথ্যা ওজর পেশ করেনি।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেছেন, এ পর্যন্ত যত ব্যাখ্যা করা হয়েছে সবই গ্রহণযোগ্য।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, মিথ্যা কথা বলা কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়, এমনকি হাঁসি-ঠাট্টার ক্ষেত্রেও নয়। নিজের শিশু সন্তানকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে এমন কথা দেয়া উচিত নয়, যা সে ঠিক রাখবেনা, একথার সত্যতা দেখতে চাও তবে আলোচ্য আয়াত পাঠ কর।[১]

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) লিখেছেন, তোমরা সত্যবাদীদের পথে চল, তাদের ন্যায় সত্যবাদীতা অবলম্বন কর।

মূলতঃ ইসলামী শরীয়তের অন্যতম দলিল হল এজমায়ে উম্মত। আর এজমায়ে উম্মত যে শরীয়তের অন্যতম দলিল তার প্রমাণ আলোচ্য আয়াত। কেননা, এ আয়াতে সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকার আদেশ রয়েছে। এ সম্পর্কে প্রায় সকল তফসীরকার একমত।[২]

এতদ্ব্যতীত যাঁরা সুফী সাধক, আরেফ, তাঁদের সংসর্গ লাভের এবং তাঁদের অনুসরণ করার ইঙ্গিতও রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।[৩]

আল্লামা এবনে কাসীর (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা সত্য কথা বল, কেননা সত্য কথা হল নেকী ও কল্যাণ, আর নেকী মানুষকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। যে ব্যক্তি সত্য কথা বলে আল্লাহ পাকের দরবারে তার নাম সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়। তোমরা মিথ্যা থেকে দূরে থাক। কেননা মিথ্যাবাদীতা মানুষকে মন্দ কাজের দিকে নিয়ে যায়, আর মন্দ কাজ মানুষকে দোযখের দিকে পৌঁছে দেয়, মানুষ যখন মিথ্যা কথা বলতে থাকে তখন আল্লাহ পাকের দফতরে মিথ্যাবাদী হিসেবে তার নাম লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন, যদি তোমরা "সাদেকীনদের" সঙ্গে থাকতে চাও তবে দুনিয়া থেকে মন ফিরিয়ে লও আর মানুষের সাথে কম মেলামেশা কর।[৪]

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ

পূর্ববর্তী আয়াতে সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকার নির্দেশ রয়েছে তথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে জেহাদে শরীক হওয়ার তাগিদ রয়েছে। আর এ আয়াতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গী না হওয়া এবং জেহাদ থেকে বিরত থাকা অশোভন কাজ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৪২-৪৩
[২]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-২২১
[৩]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪২৮
[৪]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১১, পৃষ্ঠা-৩০

অর্থাৎ মদীনাবাসী এবং মদীনার উপকণ্ঠের গ্রামীন লোকদের পক্ষে শোভনীয় নয় যে, তারা আল্লাহর রসূলের সঙ্গ থেকে পেছনে থাকে এবং রসূলের জীবন থেকে নিজেদের জীবনকে অধিকতর ভালবাসে। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রণাঙ্গনে কষ্ট করবেন আর মোমেনগণ আরামে ঘরে বসে থাকবে– এ অবস্থা মোমেনদের জন্যে কোন অবস্থাতেই শোভন নয়। মদীনার উপকণ্ঠের যে অধিবাসীদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে তারা হল মোযায়না, যোহাইনা, আসযায়া, আসলাম এবং গেফার গোত্র সমূহ। এ মত প্রকাশ করেছেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দারুণ গ্রীস্মে তাবুক অভিযানে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছেন, আর কোন মোমেন ঐ সময় মদীনাতে আরাম কেদারায় বসে থাকবে বা কোমল বিছানায় শুয়ে থাকবে তা সম্পূর্ণ অচিন্ত্যনীয়। তাই এরশাদ হয়েছে, নিজেদের জীবনকে আল্লাহর রসূলের জীবনের চেয়ে কোন মোমেন অধিক পরিমাণে ভালবাসেনা, এটিই হল মোমেনের বৈশিষ্ট্য। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ "তোমাদের কোন ব্যক্তি সে পর্যন্ত প্রকৃত মোমেন হবেনা যে পর্যন্ত তার নিকট আমি সবচেযে প্রিয় না হই। এমনকি তার পিতা এবং তার সন্তান তথা সকলের চেয়ে বেশী প্রিয় না হই"।

অতএব, যখন স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জেহাদে তশরীফ নিয়ে যান তখন তাঁর সঙ্গে না যাওয়া অবৈধ।

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

আর তা এজন্যে যে, আল্লাহর রাহে মুজাহেদগণ ক্ষুধা তৃষ্ণা, তথা যা কিছু কষ্ট পায় এবং তাদের যে কার্যক্রমের কারণে কাফেররা উত্তেজিত হয়, এমনিভাবে শত্রুর নিকট থেকে তারা যা কিছু কেড়ে আনে তার বিনিময়ে তাদের জন্যে সওয়াব লিপিবদ্ধ হয়, আর আল্লাহ পাক নেককারদের বিনিময় বিনষ্ট করেন না। এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে গেলে যে প্রকার কষ্টই হোক না কেন প্রত্যেক কদমেই সওয়াব লিপিবদ্ধ হয়। আর কোন কারণেই মুজাহেদীনগণের সওয়াব বিনষ্ট হয়না। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সওয়াব প্রদানের এ ওয়াদা ঘোষণার পর জেহাদ থেকে বিরত থাকা সমীচিন নয়।

আর জেহাদে রয়েছে সমগ্র মানব জাতির জন্যে কল্যাণ, এমনকি কাফেরদের জন্যেও এতে রয়েছে সমূহ কল্যাণ। কেননা কাফেরদেরকে দোযখের কঠিন শাস্তি থেকে রেহাই দেয়া এবং মানবতার পরিপূর্ণ উৎকর্ষ সাধনে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টা।

আর মোমেনদের জন্যে জেহাদে যে কল্যাণ রয়েছে তা বর্ণনাতীত। কেননা কাফেরদের জুলুম অত্যাচার থেকে নাজাত লাভের পন্থাই হল জেহাদ। বোখারী শরীফে সংকলিত হযরত হাফসা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহর রাহে (জেহাদে) যার পা ধূলা মিশ্রিত হবে আল্লাহ পাক তার জন্যে দোযখ হারাম করে দিয়েছেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, আল্লাহর রাহের মুজাহেদ যতক্ষণ প্রত্যাবর্তন না করে ততক্ষণ তার অবস্থা হয় এমন যেমন প্রত্যেক দিন যে রোজা রাখে, রাত্রে যে নামায আদায় করে এবং আল্লাহর কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে, সে লাগাতার নামায রোজার কারণে কাহিল হয় না, বরং যত্ন সহকারে নামায রোজায় মশগুল থাকে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন যে, এ আদেশটি শুধু হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জমানার জন্যে বিশেষভাবে কার্যকর, নাকি সাধারণ ভাবে সর্বকালের জন্যেই প্রযোজ্য, সে প্রশ্নে তত্ত্বজ্ঞানীদের একাধিক মত রয়েছে। কাতাদা (রঃ)-এর মতে, এ আদেশ বিশেষভাবে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী হয়ে জেহাদে গমনের সাথে সম্পর্ক রাখে (সাধারণ আদেশ নয়)।

যখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওযাসাল্লাম স্বয়ং জেহাদে শরীক হওয়ার জন্যে তশরীফ নিয়ে যান তখন কোন শরীয়ত সম্মত ওজর ব্যতীত এমন জেহাদে শরীক না হওয়া কারো জন্যেই জায়েয ছিল না।

এতদ্ব্যতীত, অন্য কোন খলিফা বা শাসনকর্তার সঙ্গী হয়ে জেহাদে শরীক হওয়ার আদেশ এ আয়াতে নেই। যদি মুসলমানদের উপর জেহাদ করা একান্ত কর্তব্য না হয় তবে এমন অবস্থায় কোন খলিফা বা শাসনকর্তার সঙ্গে জেহাদে না যাওয়া মুসলমানদের জন্যে জায়েয।

ওলীদ এবনে মুসলেম বর্ণনা করেন যে, আমি ইমাম আওযায়ী (রহঃ), আবদুল্লাহ এবনে মোবারক (রঃ), সাদ এবনে আবদুল আযীয (রঃ) প্রমুখ তত্ত্বজ্ঞানীদের নিকট শ্রবণ করেছি যে, আলোচ্য আয়াতের আদেশ এ উম্মতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, সকল যুগের জন্যে সমভাবে কার্যকর। (এই আদেশ চিরস্থায়ী) প্রত্যেক খলিফার সাথে সকল যুগে জেহাদে শরীক হওয়া একান্ত জরুরী।

এবনে যায়েদ (রঃ) বলেছেন, এই আদেশ তখনকার জন্যে ছিল, যখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল কম। মুসলমানদের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পায় তখন আল্লাহ পাক এ আদেশকে রহিত করে দিয়েছেন। যে জেহাদে যেতে না চায় তার জন্যে তা জায়েয করে দিয়েছেন। ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে জেহাদ ফরজে কেফায়াহ। যদি প্রয়োজন মোতাবেক মুসলমানদের এক দল জেহাদে আত্মনিযোগ করে তবে অন্য মুসলমানদের তরফ থেকেও এই ফরজ আদায় হয়ে যাবে। সাঈদ এবনে মোসাইয়্যেব (রঃ)-এর মতে, জেহাদ ফরজে আইন। প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে অবশ্য কর্তব্য আর এ আদেশ সর্বকালের জন্যে। যারা তাবুকের যুদ্ধে শরীক হয়নি তাদের ব্যাপারে কঠোর বিধি-নিষেধ জারি করা হয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, যখন সাধারণভাবে জেহাদের ঘোষণা করা হয় তখন প্রত্যেক মুসলমানের উপর জেহাদ ফরজ হয়ে যায়। আর এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম একমত, যেমন তাবুকের যুদ্ধের সময় হয়েছিলো। আর এ অবস্থা না হলে জেহাদ ফরজে কেফায়াহ। কেননা আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে ঘোষণা করেছেন,

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الاية

"(অর্থাৎ) মোমেনদের মধ্যে যারা জেহাদে শরীক হয়নি এবং যারা জেহাদ করেছে মর্তবার দিক থেকে তারা এক সমান নয়"।

وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى

"আর আল্লাহ পাক প্রত্যেকের সাথে কল্যাণের ওয়াদা করেছেন (যদিও কল্যাণের মর্তবায় পার্থক্য থাকে)"।

وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً

অর্থাৎ "ছোট বড় যা কিছুই আল্লাহর রাহে ব্যয় করে" যেমন হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ) অনেক ধন-সম্পদ দান করেছেন। অন্য একজন সাহাবী সারা রাত এক ইহুদীর বাগানে পানি দিয়ে সামান্য খেজুর পারিশ্রমিক হিসেবে পেয়েছিলেন, তা তিনি তাবুকের যুদ্ধের জন্যে পেশ করেছিলেন। এক কথায় কম হোক বা বেশী সব কিছুরই সওয়াব আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রদান করা হবে।

وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ

আর যত মরু প্রান্তরই তোমরা অতিক্রম কর-না কেন তা মুজাহেদদের নামে নেকী হিসেবে লিপিবদ্ধ হবে।

لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

(যাতে করে আল্লাহ পাক মুজাহেদদেরকে তাদের নেক আমলের উত্তম বিনিময় দান করেন) আলোচ্য আয়াতে নেক আমল বলতে জেহাদকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে একটি উষ্ট্রি নিয়ে হাযির হয়ে বললো, এটি আল্লাহর রাহে পেশ করলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে সাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আল্লাহ পাক এর বদলে কেয়ামতের দিন তোমাকে ৭০০শ' উষ্ট্রি প্রদান করবেন। (মুসলিম শরীফ)

হযরত যায়েদ এবনে খালেদ বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহের মুজাহেদের জন্যে আসবার পত্র তৈরী করে দিয়েছে সেও জেহাদ করেছে। আর যে ব্যক্তি মুজাহেদের পরিবারবর্গের দেখাশোনা করেছে সেও জেহাদ করেছে। (বোখারী ও মুসলিম)

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً

(এমন নয় যে, মুসলমানগণ সকলেই এক সঙ্গে অভিযানে যাবে)

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে জেহাদ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে যে কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছে তাতে কোন কোন মুসলমানের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, প্রত্যেক জেহাদেই মুসলমান মাত্রের অংশ গ্রহণ একান্ত কর্তব্য। এজন্যে আল্লাহ পাক এ আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ প্রত্যেক জেহাদে সকল মুসলমানেরই শরীক হওয়া একান্ত কর্তব্য নয়।

শানে নুযুল

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন তাবুকের জেহাদে গমন করেন তখন মদীনাতে শুধু মুনাফেকরাই থেকে যায়। আর দু' চারজন যারা খাঁটি মোমেন হওয়া সত্ত্বেও যেতে পারেননি তাঁদের তওবা সম্পর্কীয় আলোচনা ইতিপূর্বে হয়েছে। ঐ অবস্থায় মোমেনগণ বললেন, আমরা আর কোন সময় কোন জেহাদ থেকে বিরত থাকব না; স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জেহাদে গমন করেন অথবা তিনি সাহাবায়ে কেরামের কোন দল জেহাদে প্রেরণ করেন, কোন অবস্থাতেই আমরা জেহাদ থেকে বিরত থাকব না।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন করে বিভিন্ন দিকের কাফেরদের মোকাবেলায় সাহাবায়ে কেরামকে প্রেরণ করলেন, তাঁরা সকলেই ঐ জেহাদে শরীক হলেন, মদীনা মোনাওয়্যারায় হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে একা রেখে গেলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

আয়াতের মর্মকথা হলো এই, মোমেনদের সকলেই জেহাদে চলে যাবে এমন নয়; বরং তাদের দু'টি দল হওয়া উচিত, এক দল হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে থাকবে, আর একদল জেহাদে যাবে। কেননা তখন ইসলামের জন্যে দু'টি জিনিসের প্রয়োজন ছিল–

১. জেহাদ, যাতে মানবতার উৎকর্ষ সাধন হয়, সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং দুশমন মাথা তুলতে না পারে।

২. এলম, যেহেতু সে সময় ওহীর মাধ্যমে শরীয়তের নতুন নতুন বিধান জারী হচ্ছিল, এজন্যে এক দল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত থাকাও জরুরী ছিল, যাতে করে শরীয়তের বিধান সম্পর্কে তারা জ্ঞান অর্জন করতে পারেন এবং যারা দরবারে উপস্থিত নেই তাদেরকে পৌঁছাতে পারেন। যারা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির রইলেন, যে জ্ঞান আল্লাহর তরফ থেকে নাযিল হলো তা অর্জন এবং সংরক্ষণ করলেন এবং যারা জেহাদে গমন করেন তারা যখন ফিরে আসেন তখন সে সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করলেন।[১] তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

---

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-১২৫

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ

তবে প্রত্যেক শ্রেণীর একটি অংশ কেন বের হয়না? যারা দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে এবং তাদের সম্প্রদায়কে ভয় প্রদর্শন করবে যখন তারা ফিরে আসবে, হয়তো তারা সতর্ক হবে।

আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেছেন ইমাম রাজী (রঃ), ইমাম কুরতবী (রঃ) এবং শেখ জালাল উদ্দিন সয়ূতী (রঃ) আর আল্লামা আলুসী (রঃ)-ও এ মতই পোষণ করেছেন।[১]

আলোচ্য আয়াতের আরও একটি ব্যাখ্যা হল, এ আয়াত জেহাদের বিধান সম্পর্কীয় নয়; বরং এলমে দ্বীন অর্জনের জন্যে স্বতন্ত্র নির্দেশ অর্থাৎ মুসলমানদের এক দল দ্বীন ইসলামের জ্ঞান অর্জনের জন্যে বের হওয়া উচিত। আর জেহাদের নির্দেশের পাশাপাশি এলমে দ্বীন অর্জনের এ নির্দেশ দেয়ার কারণ এই যে, দু'টির মধ্যে রয়েছে ঘনিষ্ট সম্পর্ক, উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহর রাহে বের হতে হয়। এক ক্ষেত্রে সংগ্রাম করতে হয়, অন্য ক্ষেত্রে সাধনা করতে হয়, এক ক্ষেত্রে অসী ব্যবহৃত হয়, অন্য ক্ষেত্রে মসী ব্যবহৃত হয়। উভয় কাজেরই উদ্দেশ্য এক তা হল দ্বীন ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। আর এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হল যে, এলমে দ্বীনের জন্যে বের হওয়া ফরজে কেফায়াহ। কিছু লোক এ উদ্দেশ্যে বের হলে সকলের ফরজ আদায় হবে, পক্ষান্তরে কেউ যদি এলমে দ্বীন হাসিল করার জন্যে সচেষ্ট না হয় তবে সকলেই গুনাহগার হবে। এমনকি তফসীরকারগণ এ কথাও বলেছেন, যদি কোন গ্রাম বা মহল্লায় তিন ব্যক্তি বাস করে তবে তন্মধ্যে এক জনকে দ্বীনের এলম হাসিল করার জন্যে অবশ্যই বের হতে হবে। সে দ্বীনী এলম হাসিল করে অবশিষ্ট দু'জনকে সেই এলম পৌঁছাবে যেন তারা হালাল হারাম সম্পর্কে অবগত হয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, দ্বীনি এলমের কিছু অংশ ফরজে আইন আর কিছু অংশ ফরজে কেফায়াহ। যেমন সঠিক আকিদা ও বিশ্বাস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা একান্ত কর্তব্য। তৌহীদ, রেসালত, আখেরাত প্রভৃতি বিষয়ে প্রত্যেক মুসলমানেরই জানা কর্তব্য। এমনিভাবে এবাদতের ব্যাপারেও জ্ঞান অর্জন করা অবশ্য কর্তব্য যেমন পবিত্রতা অর্জন, নামায, রোজা, হজ্জ সম্পর্কীয় জ্ঞান অর্জন করা একান্ত জরুরী, যারা ব্যবসায়ী তাদের এ সম্পর্কীয় বিধান জানা জরুরী। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন–

طلب العلم فريضة على كل مسلم

জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরজ। একখানি আরবী প্রবাদ এই ঃ اطلبوا العلم من المهد الى اللحد "তোমরা দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন কর"।

---

[১]। তফসীরে কুর্তবী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-২৯৪
তফসীরে রুহুল মা'আনী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৪৩-৪৪
জালালাইন শরীফ খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৭৫

দ্বীনি এলমের অন্বেষণ নফল এবাদতের চেয়ে উত্তম

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ দ্বীনি এল্‌মের অন্বেষণ সকল নফল এবাদতের চেয়ে উত্তম।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দ্বীনি এল্‌মের অন্বেষণ আল্লাহ্ পাকের নিকট নফল নামায, রোজা, হজ্ব এবং আল্লাহর রাহে জেহাদ থেকে উত্তম। আর হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে একথাও আছে যে, একঘন্টা দ্বীনি এলমের অন্বেষণ এক রাতের নফল নামাযের চেয়ে এবং এক দিনের দ্বিনী এলমের অন্বেষণ তিনদিন নফল রোজার চেয়ে উত্তম। অন্য একখানি হাদীসে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আলেমের ফজিলত ও মর্তবা আবেদের উপর (এবাদতকারী) এমন, যেমন তোমাদের একজনের উপর আমার ফজিলত রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক রহমত নাযিল করেন এবং আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণ এমনকি, গর্তের অধিবাসী পিপীলিকা এবং পানির ভেতরের মাছ পর্যন্ত এমন ব্যক্তির জন্যে দোয়া করে যে মানুষকে কল্যাণকর কাজের শিক্ষা দেয়। (তিরমিযী)

আর এবনে মাজা হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাসের (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, শয়তানের মোকাবেলায় একজন আলেম হাজার আবেদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী হয়। আর হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথাও বলেছেন, যখন মানুষের মৃত্যু হয় তখন তার আমলের পথ বন্ধ হয়, কিন্তু তিনটি পথ উম্মুক্ত থাকে।

(১) সদকায়ে জারীয়াহ (২) সেই এলম যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় (৩) নেক সন্তান যদি সে ব্যক্তির জন্যে দোয়া করে।

এলমের উদ্দেশ্য

সুফী-সাধকগণ বাতেনী এলম হাসিল করেন যা একান্ত জরুরী, বাতেনী এল্‌মের দু'টি উদ্দেশ্য।

(এক) মানব মন থেকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সব কিছুর আকর্ষণ দূরীভূত করা এবং সর্বক্ষণ আল্লাহ্ পাকের সম্মুখে নিজেকে উপস্থিত মনে করা। নিজের মতের প্রাধান্য বিস্তার, অহংকার, দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ, আল্লাহর বন্দেগীতে অবহেলা, প্রবৃত্তির তাড়না, রিয়াকারী তথা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সৎ কাজ, আত্ম-প্রচারের আকাঙ্খা এক কথায় যাবতীয় নৈতিক দুর্বলতা থেকে নিজেকে পবিত্র করা।

(দুই) পাপাচার থেকে তওবা, আল্লাহ্‌র হুকুমে রাজী থাকা, বিপদাপদে সবর অবলম্বন করা, আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত সমূহের জন্যে শোকর গুজারী সহ যাবতীয় নৈতিক গুণাবলী দ্বারা নিজের প্রবৃত্তিকে সুসজ্জিত করা। একথা সুস্পষ্ট যে, প্রত্যেকের জন্যে এসব গুণাবলী অর্জন করা একান্ত জরুরী। আর এর জন্যে এখলাস তথা নিয়ত সঠিক হওয়া পূর্বশর্ত। যদি এখলাস এবং নিয়ত সঠিক না হয় তবে নামায রোজা সহ কোন এবাদতই কবুল হয় না।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক শুধু সেই আমলকেই কবুল করেন যা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে করা হয়। (নেসায়ী)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক তোমাদের চেহারা সমূহ এবং তোমাদের ধন-সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, তিনি দেখেন তোমাদের মন।

যাহোক, আলোচ্য আয়াতের মর্মকথা হল এই, ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে জেহাদ একান্ত জরুরী, কিন্তু এর পাশাপাশি অন্য একদল মুসলমানের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির থেকে তাঁর জ্ঞান-ভান্ডার থেকে উপকৃত হওয়াও জরুরী, যেন যারা জেহাদে চলে গেছেন তাদের নিকট এই এলম পৌঁছাতে পারেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের উদ্দেশ্যই হল বলিষ্ঠ দলিল-প্রমাণ দ্বারা ইসলামী বিধানকে মানুষের সম্মুখে পেশ করা। এজন্যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেঃ "আলেমগণ আম্বিয়ায়ে কেরামের উত্তরাধিকারী"।

আল্লামা সয়ুতি (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আয়াতের আদেশ তখন কার্যকর হয় যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন দলকে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করতেন (নিজে শরীক হতেন না)। এমন অবস্থায় একদল মুসলমানের জেহাদে গমন করা, আরেক দলের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির থেকে এলম হাসিল করা কর্তব্য।

আর জেহাদ থেকে বিরত থাকা নিষিদ্ধ তখন হবে, যখন স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জেহাদের উদ্দেশ্যে বের হন। হযরত হাসান বসরী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, "এমন কেন হয়না যে, প্রত্যেক শ্রেণীর একদল লোক জেহাদের উদ্দেশ্যে গমন করে এবং দ্বীন ইসলামের জন্যে আল্লাহ পাকের সাহায্য প্রদান ও মুশরেকদের উপর মুসলমানদের বিজয়ী হওয়ার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে; জেহাদ থেকে ফিরে এসে নিজের সম্প্রদায়ের কাফেরদেরকে এ সংবাদ পরিবেশন করে যে, আল্লাহ পাক তাঁর রসূল এবং মোমেনদেরকে বিজয় দান করেছেন, আর এ সংবাদ প্রদানের উদ্দেশ্য এই, যেন কাফেররা আল্লাহর রসূলের মোকাবেলা করা থেকে বিরত থাকে, তারা যেন ভয় করে যে অন্য কাফেরদের যে পরিণাম হয়েছে আমাদেরও সে পরিণাম হবে"। হাসান বসরীর (রঃ) এ ব্যাখ্যা দ্বারা একথা জানা যায় যে, জেহাদ হল ফরজে কেফায়া, মুসলমানদের একদল যদি এ কর্তব্য পালন করে তবে সকলের পক্ষ থেকে এ ফরজ আদায় করা হবে। অবশ্য যদি ইমামুল মুসলেমীনের তরফ থেকে জেহাদের জন্যে সাধারণ ঘোষণা দেয়া হয় আর সকলকে জেহাদে শরীক হওয়ার আদেশ দেয়া হয় তবে এমন অবস্থায় সকলের উপর জেহাদ ফরজ হবে।[১]

এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হল এলম অর্থ জানা আর ফেকাহ হল কোন বিষয়ের মর্ম উপলব্ধি করা। কোরআনে করীম বা হাদীস শরীফকে যারা

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪৪৮-৫০

হেফজ করেন এবং অন্যদেরকে পৌঁছে দেন তারা হাফেজে কোরআন বা হাফেজে হাদীস (আল্লাহ্ পাক তাঁদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন)। আর যারা কোরআন ও হাদীসের মর্ম উপলব্ধি করেন এবং শরীয়তের বিধান সমূহ মানুষের নিকট ব্যাখ্যা করেন যাতে করে মানুষ তার উপর আমল করতে পারে, তাঁরা আলেম। এজন্যেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন,

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

"আর এ দৃষ্টান্ত সমূহ আমি মানুষের জন্যে বর্ণনা করি, এগুলো প্রকৃত আলেম ব্যতীত আর কেউ বুঝতে পারে না"।

শরীয়তের হেফাজত উম্মতের কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনে আলেম, হাফেজ, মোহাদ্দেস, ফকীহ সকলেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। হাফেজে কোরআন কোরআনে করীমের শব্দগুলো হেফাজত করে যাচ্ছেন। আর মুফাচ্ছেরে কোরআন পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী পেশ করছেন। এমনিভাবে মোহাদ্দেসগণ হাদীসের শব্দগুলো সংরক্ষণ করছেন, আর ফকীহগণ তার মর্মকথা থেকে শরীয়তের বিধান পেশ করছেন। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হল যেমন শব্দ এবং অর্থের মধ্যে পার্থক্য থাকে। যাহোক, আলোচ্য আয়াতে এলমে দ্বীনের অন্বেষণের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং এর উচ্চ মর্তবা প্রমাণিত হয়েছে।

আর একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, আলেমদের কর্তব্য হল যাদের এলম নেই, তাদেরকে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা। এমনিভাবে এ আয়াত দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যাদের এলম নেই তাদের কর্তব্য হল আলেমদের অনুসারী হওয়া। শুধু এভাবেই দুনিয়ার এ জীবন সুন্দর ও সার্থক হয়, আর পরজীবনে চিরশান্তি চিরমুক্তি লাভ করা যায়।[১]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا۟ فِيكُمْ
غِلْظَةً ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ
فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنًا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ
إِيمَٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ
فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ كَٰفِرُونَ ﴿١٢٥﴾ أَوَلَا يَرَوْنَ
أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِى كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ
يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪২৪

তরজমা

(১২৩) হে মোমেনগণ! কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সাথে তোমরা যুদ্ধ করতে থাক। তারা যেন তোমাদের কঠোরতা উপলব্ধি করতে পারে আর জেনে রাখ যে, আল্লাহ পাক মোত্তাকীদের সাথেই রয়েছেন।

(১২৪) আর যখনই কোন সূরা নাযিল হয় তখন তাদের কেউ কেউ বলে, সূরাটি তোমাদের কার ঈমান বৃদ্ধি করলো। বস্তুতঃ যারা মোমেন সূরাটি তাদেরই ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারাই আনন্দিত হয়।

(১২৫) আর যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তাদের অপবিত্রতার উপর আরো অপবিত্রতা বৃদ্ধি হয়, আর তাদের মৃত্যু হয় কাফের অবস্থায়।

(১২৬) আর তারা কি লক্ষ্য করেনা? যে, প্রতি বছরই একবার কি দু'বার তারা বিপর্যস্ত হয়, এরপরও তারা তওবা করেনা এবং উপদেশ গ্রহণ করেনা।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে জেহাদের বিধান পেশ করা হয়েছে এবং জেহাদের ফজিলতও বর্ণিত হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে জেহাদ কিভাবে শুরু হবে এবং কার সঙ্গে সর্বপ্রথম জেহাদ করতে হবে এই বিধান বর্ণিত হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে মোমেনদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে এ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, হে মোমেনগণ! তোমরা সেই কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ কর যারা ইসলামের প্রাণ কেন্দ্র থেকে অধিকতর নিকটবর্তী।

এভাবে যুদ্ধ সম্প্রসারিত হবে। যেমন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম আরবের মুশরেকদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, এরপর বনু কোরায়যা, বনু নজির এবং খায়বরের ইহুদীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। যখন জাযিরাতুল আরব মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণাধীন হয় এবং আরবের বিভিন্ন গোত্র দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সিরিয়ার দিকে মনোনিবেশ করেন। মওতা এবং তাবুকের যুদ্ধ এ কর্মসূচীরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। নবম হিজরীতে তাবুকের অভিযান অনুষ্ঠিত হয়। দশম হিজরীতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্ব করেন এবং এর মাত্র ৮১ দিন পর তাঁর তিরোধান হয়।

লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, আরব জাহানের জেহাদ শেষ হওয়ার পরেই হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রুমীদের সঙ্গে জেহাদের আদেশ দিয়েছেন। এভাবে আলোচ্য আয়াতের উপর আমল করা হয়েছে।[১]

---

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪২৫
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৫০
তফসীরে কবীর খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-২২৮-২৯
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১১, পৃষ্ঠা-৩৩-৩৪

উল্লেখ্য, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পর তাঁর প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) জেহাদের এ পন্থাই অনুসরণ করেছেন।

অবশ্য এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর কিছু লোক মুরতাদ হয়ে যায়, কিছু লোক যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। হযরত আবু বকর (রাঃ) অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এ ফেতনার মোকাবেলা করেন এবং দ্বীন ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, যারা দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় তাদের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেন। এরপর তিনি রোমান এবং পারস্য সাম্রাজ্যের দিকে মনোনিবেশ করেন। হযরত আবু বকরের (রাঃ) পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন হযরত ওমর (রাঃ), তাঁর খেলাফত কালেলেই রোমক সাম্রাজ্য এবং পারস্য সাম্রাজ্য মুসলমানদের করতলগত হয়, ইসলাম এসব দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত ওমর (রাঃ) যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন ইসলামের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকে। তাঁর শাহাদাতের পর হযরত ওসমান (রাঃ) খলিফা নির্বাচিত হন। তাঁর যুগেও ইসলামের জয় যাত্রা স্বগৌরবে অব্যাহত থাকে।[১] আলোচ্য আয়াতে জেহাদের যে নীতি ঘোষণা করা হয়েছে তা বাস্তবায়িত হতে থাকে। আর সে নীতি হলো–হে মোমেনগণ! তোমরা সেই কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাক যারা তোমাদের অধিকতর নিকটবর্তী।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আদেশের কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, সকল কাফেরের সঙ্গে একসঙ্গে যুদ্ধ করা কঠিন। তাই যে অধিকতর নিকটবর্তী তার সাথেই প্রথম যুদ্ধ করা উচিত। যেমন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত ও তবলিগের ব্যাপারেও নিকটাত্মীয়-স্বজনকে সর্বপ্রথম দ্বীনি দাওয়াত দেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ

"(হে রসূল!) আপনার নিকটাত্মীয়-স্বজনদেরকে ভয় প্রদর্শন করুন"।

দ্বিতীয়তঃ যারা নিকটতর সেই দুশমনদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ব্যয়ও কম, যানবাহন, হাতিয়ার এবং অন্যান্য দ্রব্য সমগ্রীর প্রয়োজনও কম তাই তা সহজ।

তৃতীয়তঃ যদি মুজাহেদগণ দূরে চলে যান, যে কোন সময় অজানা বিপদের সম্মুখীন হতে পারেন।

আর চতুর্থ কারণ হচ্ছে এই, কাফেরদের মধ্যে যারা প্রতিবেশী তারা হয় শক্তিশালী নয়তো দুর্বল। শক্তিশালী হলে নিকটস্থ শক্তিশালী দুশমনের মোকাবেলা করা দূরবর্তী দুশমনের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। আর যদি তারা দুর্বল হয় তবে তাদের উপর বিজয় অর্জন করা সহজতর হয়। তাই আল্লাহ পাক এ নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, "হে মোনেগণ! তোমরা নিকটবর্তী দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর"।[২]

[১]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১১, পৃষ্ঠা-৩৩-৩৪

[২]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-২২৯

وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ط

আর কাফেররা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায় তথা হে মোমেনগণ! তোমরা কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর হও, যেমন অন্য আয়াতে মোমেনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে–

اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

(মোমেনগণ কাফেরদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর আর মোমেনদের পরস্পরের মধ্যে তারা অত্যন্ত বিনম্র ও দয়াদ্র) প্রকৃত মোমেনের এটি পরিচয়, এটিই আদর্শ। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ

"তারা মোমেনদের ব্যাপারে অত্যন্ত বিনয়ী ও কোমল, আর কাফেরদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর"।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ পাক মোত্তাকীদের সাথেই রয়েছেন। অর্থাৎ যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহর বিধি-নিষেধ পালন করে চলে আল্লাহ্ পাক তাদেরই সহায় হন। তারাই আল্লাহর মদদপুষ্ট হয়, আর যারা আল্লাহর মদদপুষ্ট হয় তাদের কাফেরদের ভয় করার কোন প্রয়োজন নেই।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের এ আদেশের তাৎপর্য হলো এই যে, মুসলমানদের দুশমনের মোকাবেলায় অত্যন্ত সুদৃঢ়, সর্বপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত এবং সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকা উচিত যাতে করে কোন শত্রু যেন মুসলমানদের উপর হামলা করার সাহসই না পায়। এটিই হলো–

وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً

বাক্যটির তাৎপর্য। দ্বিতীয়ত, নিকটবর্তী কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার যে নির্দেশ রয়েছে তার দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে।

১. ভৌগলিক সীমারেখার দিক থেকে যারা নিকটবর্তী তাদের সাথে যুদ্ধ করা উচিত।

২. কুফরী ও নাফরমানীর দিক থেকে যারা অধিকতর কঠোর তাদের সাথে সর্বপ্রথম যুদ্ধ করা উচিত যেমন মুশরেকদের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধ হওয়া উচিত, এরপর আহলে কিতাবদের সঙ্গে। এমনিভাবে নিকটবর্তী দুশমন থাকা সত্ত্বেও দূরবর্তী দুশমনের সঙ্গে লড়াই শুরু করা উচিত নয়।

তফসীরকারগণ একথাও বলেছেন যে, সকল কাফেরের বিরুদ্ধেই জেহাদ করা ওয়াজিব, সে নিকটবর্তী হোক কি দূরবর্তী। তবে যে নিকটবর্তী তার সাথে প্রথম যুদ্ধ করতে হবে। (মাদারেক)

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, সকল কাফেরের সঙ্গে যুদ্ধ করা অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু যেহেতু একই সঙ্গে সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্ভব নয় তাই যারা নিকটবর্তী তাদের সঙ্গেই প্রথম যুদ্ধ করা উচিত।[১] (জাস্যাস)

হাকীমুল উম্মত থানবী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, সর্বপ্রথম নিজের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সাধনা করা উচিত কেননা, এটি নিকটতর। যদি কারো প্রবৃত্তি অবাধ্য হয় তবে আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে সে অনুগত হবে।[২]

এখানে আরো একটি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য, আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ পাককে ভয় করে, যারা তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করে আল্লাহ পাকের সাহায্য তাদের সঙ্গেই রয়েছে। এর দ্বারা জেহাদের জন্যে এখলাসের শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে, অর্থাৎ জেহাদ হতে হবে শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, অর্থ-সম্পদের লোভে নয় এবং নাম-যশ-খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যেও নয়, বরং এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই হতে হবে জেহাদ।[৩]

এজন্যেই আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, ইতিহাস সাক্ষী! যখনই মুসলিম রাষ্ট্রনায়কগণ তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করেছেন, আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ মেনে চলেছেন এবং আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করেছেন তখন তাঁরা আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভে ধন্য হয়েছেন এবং বিজয় লাভ করেছেন।[৪]

وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖٓ اِيْمَانًا ۚ

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ ছিল, আর আলোচ্য আয়াতে ঐ আদেশের কারণ বর্ণিত হয়েছে। কারণ হল এই, কাফেররা পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহ নিয়ে বিদ্রুপ করতো, যারা আল্লাহ পাকের পবিত্র বাণী সম্পর্কে বিদ্রুপ করে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ অবশ্য কর্তব্য। তাই এরশাদ হয়েছে, যখনই কোরআনে করীমের কোন সূরা নাযিল হত আর তাতে মুনাফেকদের ইসলাম বিরোধী তৎপরতার উল্লেখ থাকত, তখন কোন কোন মুনাফেক ঐ আয়াত সমূহ সম্পর্কে বিদ্রুপ করে জিজ্ঞাসা করতো, বল তোমাদের মধ্যে এ সূরার মাধ্যমে কার ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছে? এর জবাব হলো, এ সূরার মাধ্যমে অবশ্যই ঈমান বৃদ্ধি হয়েছে কেননা, পবিত্র কোরআনের অকাট্য দলিল প্রমাণ শ্রবণে সর্বদা ঈমান ও একীন বৃদ্ধি পায়, আর পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহের কারণে সর্বপ্রকার সন্দেহ দূরীভূত হয়। আর এজন্যে সাহাবায়ে কেরাম কোন আয়াত নাযিল হলে অত্যন্ত খুশি হতেন।

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪২৯
২। তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা-৪৪২
৩। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪২৯
৪। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১১, পৃষ্ঠা-৩৫

পক্ষান্তরে, যাদের মনে ব্যাধি ছিল, যারা ইসলামের প্রতি শত্রুতা পোষণ করত তাদের ব্যাধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেত আর ঐ ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায়ই তাদেরকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়।

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, মানব মনে ঈমান হল একটি সাদা চিহ্ন। ঈমান যত বৃদ্ধি পায় ঐ সাদা চিহ্নও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

পক্ষান্তরে, মুনাফেকী হল একটি কাল চিহ্ন, মুনাফেকী ও নাফরমানী যত বৃদ্ধি পেতে থাকে তত ঐ কালো চিহ্নটিও বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেভাবে মোমেনের অন্তর ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ সাদা ধবধবে হয়ে যায়, ঠিক তেমনি মুনাফেকের অন্তরও ক্রমশ সম্পূর্ণ কাল হয়ে যায়। আল্লাহ্র শপথ! যদি তোমরা মোমেনের বক্ষ চিরে তার অন্তরকে দেখ তবে তাকে সাদা দেখতে পাবে। আর যদি এভাবে মুনাফেকের অন্তরকে দেখ তবে তাকে সম্পূর্ণ কাল দেখতে পাবে।

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ

"আর তারা কি দেখেনা যে, প্রতি বছর একবার কি দু'বার তারা বিপদগ্রস্ত হয় কিন্তু তবুও তারা তওবা করেনা এবং শিক্ষা গ্রহণ করেনা"।

অর্থাৎ আসমানী জমীনি বালা-মুসিবতে তারা নিপতিত হয় তবুও অন্যায়-অনাচার তথা যাবতীয় পাপাচার থেকে তারা তওবা করেনা, অথচ বিপদাপদ থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং আল্লাহর নাফরমানী থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

মুজাহেদ (রহঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল তারা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়, অন্যান্য বিপদাপদ দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করা হয়। তাদের মুনাফেকী প্রকাশিত হওয়ার কারণে তারা যে অপমানিত হয় তা থেকেও তারা শিক্ষা গ্রহণ করেনা। আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে সাহায্য করবেন বলে যে কথা দিয়েছেন তা তারা পুরো হতে দেখে অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় মুসলমানদের বিজয় হয় কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা ঈমান আনেনা এবং মুনাফেকী পরিহার করে খাঁটি মোমেন হয় না।

وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَىٰكُم مِّنْ
أَحَدٍ ثُمَّ ٱنصَرَفُوا۟ ۚ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا
يَفْقَهُونَ ﴿١٢٧﴾ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ
عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ
﴿١٢٨﴾ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾

তরজমা

(১২৭) আর যখনই কোন সূরা নাযিল হয় তখন তারা একে অন্যের প্রতি তাকায় এবং ইশারায় জিজ্ঞাসা করে তোমাদেরকে কোন মুসলমান দেখছে কি? এরপর সরে পড়ে। আল্লাহ্ পাক তাদের মনকে সত্য-বিমুখ করে দিয়েছেন, কেননা তারা এমন লোক যাদের বুদ্ধি নেই।

(১২৮) তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতেই রসূল আগমন করেছেন, তোমাদের কষ্ট ভোগ তাঁর জন্যে অসহনীয়, তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, তিনি মোমেনদের প্রতি অত্যন্ত সদয়, অতীব দয়ালু।

(১২৯) তবুও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, আমার জন্যে আল্লাহ্ পাকই যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তাঁর উপরেই আমি ভরসা করি। তিনি মহান আরশের মালিক।

তফসীরুল কোরআন

যখন পবিত্র কোরআনের কোন সূরা বা আয়াত নাযিল হতো মুনাফেকরাও উপস্থিত থাকতো আর সেই সূরা বা আয়াতে মুনাফেকদের অবস্থার বিবরণ থাকতো, মুনাফেকদের অবস্থা তখন অত্যন্ত অসহনীয় হয়ে পড়তো। তারা তখন একে অন্যের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করে বলতো, কোন মুসলমান তাদের দিকে লক্ষ্য করছে কি-না? ঐ সময় চারিদিকে তাকিয়ে সুযোগ বুঝে মজলিস থেকে সরে পড়তো। এভাবে দূরাত্মা মুনাফেকরা শুধু যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র মজলিস থেকেই সরে পড়তো তাই নয়, বরং তারা আল্লাহ্ পাকের রহমত থেকেই দূরে সরে যেত। এ হতভাগাদের এমনি অন্যায়ের কারণেই আল্লাহ্ পাক তাদের মন ফিরিয়ে দিলেন। পরিণামে তারা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের কথা শ্রবণ করতো না, ঈমান আনয়নে আকৃষ্ট হতো না।

هَلْ يَرٰىكُمْ مِّنْ اَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوْا ط

ইমাম রাজী (রহঃ) এ বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাঁরা পরস্পরকে বলতো যদি কোন মুসলমান তোমাদেরকে দেখে থাকে তবে মজলিস থেকে বের হয়োনা। আর যদি কেউ না দেখে তবে মজলিস থেকে বের হয়ে পড়। এভাবে তারা মজলিস থেকে বের হয়ে যায়।

صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ

এ কারণে আল্লাহ্ পাক তাদের অন্তরকে ফিরিয়ে দিয়েছেন হেদায়েত থেকে তথা সর্বপ্রকার কল্যাণ থেকে। এ ব্যাখ্যা করেছেন হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং কুফর ও নাফরমানী তাদের অন্তরে মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন।

আর জুযায (রহঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক তাদের অন্যায় আচরণের কারণে তাদের পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন।[১]

بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ

কেননা তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা নিজেদের বোধশক্তি দ্বারা কাজ নেয় না তথা তারা নিজেদের কল্যাণকে প্রত্যাখ্যান করে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হল তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধের তাৎপর্য উপলব্ধি করেনা এবং তার সত্যতায় বিশ্বাসও করেনা।[২]

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ

এটি এ সূরার সর্বশেষ আয়াত। এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক মোমেনদের প্রতি তাঁর এই এহসানের কথা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি দয়া করে তোমাদের নিকট এমন রসূল প্রেরণ করেছেন যিনি তোমাদের পরম হিতৈষী, সবার উপরে তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই আগমন করেছেন। তিনি তোমাদের সুপরিচিত। তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে তোমরা সম্পূর্ণ অবগত, তিনি তোমাদের কল্যাণ কামনায় থাকেন সচেষ্ট।

مِّنْ اَنْفُسِكُمْ

তিনি আগমন করেছেন তোমাদের মধ্য থেকেই। অর্থাৎ তিনি তোমাদের ন্যায়ই একজন মানুষ, যেমন পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে–

اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

অর্থাৎ আমি তোমাদেরই ন্যায় একজন মানুষ। জ্বীন বা ফেরেশতাদের থেকে রসূল আগমন করলে তার নিকট থেকে হেদায়েত গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। তাই এরশাদ হয়েছে "তোমাদের মধ্য থেকেই আগমন করেছেন একজন রসূল"।

ইমাম রাজী (রহঃ) বলেছেন, من انفسكم এর আরও একটি অর্থ হল من العرب অর্থাৎ তিনি আগমন করেছেন আরব থেকে। من انفسكم এর তৃতীয় অর্থ হল অর্থাৎ من اهل الحرم তিনি আগমন করেছেন হরম শরীফ তথা সর্বাধিক সম্মানিত এলাকার অধিবাসী হয়ে। অর্থাৎ তোমরা তাঁর পবিত্রতা, সততা, সত্যবাদীতা, ন্যায় পরায়ণতা সহ যাবতীয় গুণাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, বংশের দিকে থেকে তিনি সর্বোত্তম। গুণাবলীর দিক থেকে তিনি অদ্বিতীয়। তোমাদের জন্যে তিনি অত্যন্ত সদয় এবং মেহেরবান, তোমাদের কোন প্রকার কষ্ট তাঁর জন্যে দুঃসহ। তোমাদের কল্যাণ সাধনে তিনি থাকেন ব্যাকুল। মোমেনদের প্রতি তিনি অত্যন্ত দয়াবান, অতীব মেহেরবান।[৩]

---

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-২৩৪

[২]। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস পৃষ্ঠা-১৬৯

[৩]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-২৩৬

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রহঃ) লিখেছেন, হযরত জাফর (রাঃ) আবিসিনিয়ার বাদশা নাজ্জাশীকে এবং হযরত মাগীরা (রাঃ) পারস্য রাজার দূতকে বলেছিলেন, আল্লাহ্ পাক আমাদের নিকট আমাদেরই মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন। যাঁর বংশধারা সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অবগত, যাঁর গুণাবলী সম্পর্কে আমরা অবহিত। যাঁর ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, সততা-আমানতদারী সবই আমাদের নিকট সুপরিচিত।[১]

অতএব, এমন দয়াবান রসূলের মহান শিক্ষা গ্রহণ থেকে বিমুখ হওয়া দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। (হে রসূল!) যদি এতদসত্ত্বেও তারা বিমুখ হয় তবে আপনি বলে দিন যে, আল্লাহ্ পাক আমার জন্যে যথেষ্ট। তিনিই তোমাদের চক্রান্ত এবং শত্রুতা থেকে আমাকে রক্ষা করবেন। তিনিই আমাকে তোমাদের উপর বিজয়ী করবেন। আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, ভাল মন্দের নিয়ামক শুধু তিনিই, অতএব, আমি তাঁর প্রতিই ভরসা করি, আর তিনিই মহান আরশের মালিক।

বর্ণিত আছে যে, যখন পবিত্র কোরআন সংকলিত হচ্ছিল তখন প্রত্যেক আয়াতের জন্যে দু' ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হতো কিন্তু যখন এ আয়াত পেশ করা হল তখন খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) বলেছিলেন, এ আয়াতের জন্যে দু' ব্যক্তির সাক্ষ্যের প্রয়োজন নেই। একজনই যথেষ্ট। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে সব গুণাবলী এ আয়াতে রয়েছে, এর সাক্ষী আমরা সকলে।

দ্বিতীয়তঃ এখানে আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য তা হল কোরআনে করীমে আল্লাহ্ পাক নিজের গুণাবলী প্রকাশের জন্যে যে শব্দ ব্যবহার করেছেন, আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী প্রকাশের জন্যে সেই শব্দই ব্যবহার করেছেন, আর তা হল আলোচ্য আয়াতের সর্বশেষ দু'টি শব্দ–

رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

মোমেনদের সাথে তিনি অত্যন্ত দয়াবান, অতীব মেহেরবান। অথচ এ শব্দ দু'টি আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে নিজের সম্পর্কেও ব্যবহার করেছেনঃ

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক মানুষের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান, অতীব মেহেরবান"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন ঘুমিয়ে ছিলেন এমন অবস্থায় দু'জন ফেরেশতা এসে একজন তাঁর কদম মোবারকের কাছে আর একজন তাঁর শিয়রে বসে গেলেন। যিনি কদম মোবারকের কাছে বসে ছিলেন তিনি অপর ফেরেশতাকে বললেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর উম্মতের কোন দৃষ্টান্ত বর্ণনা কর। সে ফেরেশতা বললেন, উম্মতের সাথে তাঁর দৃষ্টান্ত হল এমন যে, কোন এক দল লোক ভ্রমণরত

[১]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৩৬

অবস্থায় এমন এক জঙ্গলে পৌঁছে গেল যেখানে তাদের পাথেয় বলতে কিছুই ছিলনা। পানাহারের সামগ্রীর অভাবে তাদের সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে ভ্রমণ অব্যাহত রাখাও সম্ভব ছিলনা, আর প্রত্যাবর্তন করারও অবস্থা ছিলনা।

তখন এমন এক ব্যক্তি তাদের নিকট আগমন করলেন যিনি ছিলেন উন্নতমানের পোশাকে সুসজ্জিত। তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি বাগানে নিয়ে যাব যা অত্যন্ত মনোরম বা জীবন-শ্যামলীমায় পরিপূর্ণ, যেখানে নহর সমূহ প্রবাহিত। তোমরা কি আমার সাথে যাবে? তারা সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁর সাথী হয়। তিনি তাদেরকে নিয়ে সেই বাগানে পৌঁছে দেন। তারা বাগানের ফল খায়, পানি পান করে তৃপ্তি লাভ করে। তাদের জীবন সেখানে বড় আরাম ও আনন্দে অতিবাহিত হতে থাকে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন আমি কি তোমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করিনি? আমি কি একটি অতি মনোরম স্থানে তোমাদেরকে পৌঁছে দেইনি? এরপর তিনি বলেন, শোন, সম্মুখে আরও এমন বাগান রয়েছে যেগুলো এই বাগানের চেয়েও উন্নত, জীবন্ত। চল তোমাদেরকে সেখানে নিয়ে যাই। তাদের মধ্যে কিছু লোক বললো, আপনি আগেও সত্য বলেছিলেন, এখনও সত্য বলছেন, আমরা অবশ্যই আপনার সাথে যাব। কিছু লোক বললো, আমরা এখানেইতো ভাল আছি, এরপর আর কোথাও যাওয়ার প্রযোজন নেই। এরা সে সব লোক যারা দুনিয়ার আনন্দ-উল্লাসে মত্ত হয়ে আখেরাতের সম্পর্কে কোন খবর নেয়না। অথচ এখানকার চেয়ে আখেরাতের নেয়ামত অনেক বেশী। এখানকার সবই সীমিত, আর আখেরাতের নেয়ামত সমূহ অনন্ত অসীম।

আ'মালে কোরআন

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় এ দোয়াটি পাঠ করবে—

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

আল্লাহ পাক তার সকল কাজ সহজ করে দেবেন, তার ইচ্ছা পূর্ণ করে দেবেন।[১] এ আয়াত সম্পর্কে তফসীরকারগণ একথাও বলেছেন—

لَقَدْ جَآءَكُمْ

(নিশ্চয় তোমাদের নিকট রসূল আগমন করেছেন) এখন প্রশ্ন হল কার নিকট আগমন করেছেন, তত্ত্বজ্ঞানীগণ জবাব দিয়েছেন যে, সমগ্র মানব জাতির নিকট।

জুযায (রঃ) বলেছেন,

هى مخاطبة لجميع العالم والمعنى لقد جاءكم رسول من البشر

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১১, পৃষ্ঠা-৩৭

এ আয়াতে সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে, এর অর্থ হল হে মানব জাতি! তোমাদের নিকট তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন রসূল আগমন করেছেন, ইমাম কুরতবী (রঃ) এ মতই পোষণ করেছেন, আর আল্লামা আলুসী (রঃ) বলেছেন–

الخطاب للبشر على الاطلاق

আলোচ্য আয়াতে সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী লিখেছেন, যেহেতু মুশরেকরা এ সত্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলো যে, মানুষের মধ্যে একজন মানুষ কিভাবে রসূল হিসেবে আগমন করবে? তাই তাদের জবাবেই এ সত্য ঘোষণা করা হয়েছে যে, مَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একজন মানুষই এবং এ আয়াতে বলা হয়েছে মানুষের মধ্য থেকে তিনি আগমন করেছেন।[১]

وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

"এবং তিনি মহান আরশের মালিক"। যেহেতু আরশ সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তাই এখানে বিশেষভাবে আরশের উল্লেখ করা হয়েছে আর সেই মহান আল্লাহর প্রতিই আমি ভরসা করছি, তিনি ভিন্ন কারো কাছে আমার কোন আশাও নেই এবং কারো ভয়ও নেই, আশা শুধু তাঁর প্রতিই, ভয়ও শুধু তাঁকেই করি।

তাবুকের যুদ্ধের আরো কিছু ঘটনা

সূরা তওবার অধিকাংশ আয়াত তাবুকের যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এ পর্যায়ে তাবুকের যুদ্ধ সম্পর্কে আরো কিছু ঘটনার বিবরণ পেশ করা যেতে পারে।

(১)

তেবরানী হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালামের (রাঃ) উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ বলেছেন, তাবুক গমনের সময় যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খালীজা নামক স্থান অতিক্রম করছিলেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এ স্থানটি উষ্ট্র অবতরণের জন্যে উপযুক্ত কেননা, এখানে গাছের ছায়া এবং পানিও রয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, এটি কৃষি কার্যের জমীন, উষ্ট্রীকে যেতে দাও (সে যেখানে ইচ্ছা থেমে যাবে কেননা, সে আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে)। উষ্ট্রী অগ্রসর হতে থাকে এবং দওমা নামক স্থানে বসে পড়ে।

(২)

ইমাম বোখারী (রাঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রঃ) তাঁদের উভয়ের সংকলিত হাদীস গ্রন্থে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর সূত্রে এবং ইমাম আহমদ (রঃ) হযরত যাবের (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে

[১]। তফসীরে মাজেদী খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৩০

ওয়াসাল্লাম যখন (তাবুক অভিযানের সময়) হজর নামক স্থান (অভিশপ্ত সামুদ জাতির আবাস-স্থল) অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি চাদর দ্বারা চেহারা মোবারক ঢেকে নিলেন। তিনি তখন উষ্ট্রীর উপর উপবিষ্ট ছিলেন। উষ্ট্রীকে অত্যন্ত দ্রুত নিয়ে গেলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই (সামুদ জাতির বাড়ী-ঘর পার হয়ে গেলেন)। কিন্তু তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে কেউ কেউ হজর নামক স্থানে অবতরণ করে সেখানকার কূপ থেকে পানি তুলে নিলেন এবং তাদের আটা এবং গোশ্‌তের পাত্রে সেই পানি ব্যবহার করলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে অবগত হয়ে নামাযের জন্যে ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিলেন। সকল লোক একত্রিত হলে তিনি এরশাদ করলেন, তোমরা এই লোকদের বাড়ীতে প্রবেশ করোনা, যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে যেন সেই আযাব তোমাদের উপর আপতিত না হয় যা তাদের প্রতি হয়েছিল। তবে এ স্থান থেকে তোমরা ক্রন্দনরত অবস্থায় পার হয়ে যাও। তাদের কূপের পানি পান করোনা, সে পানি দ্বারা নামাযের জন্যে অজুও করোনা। পাতিলগুলো উল্টে দাও। আর যে আটায় এ পানিগুলো ব্যবহৃত হয়েছে সে আটাগুলো উষ্টীগুলোকে খেতে দাও।

এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে সেই কূপের নিকট পৌঁছলেন, যার পানি হযরত ছালেহ (আঃ)-এর উষ্ট্রী পান করত এবং এরশাদ করলেন, তোমরা মোজেযার দাবী করোনা। ছালেহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় মোজেযার দাবী করেছিল, তারা তাদের পয়গম্বরের নিকট এ আবেদন করেছিল যে, আমাদেরকে মোজেযা প্রদর্শন করুন, তাই আল্লাহ পাক পাহাড়ের ভেতর থেকে মোজেযা স্বরূপ একটি উষ্ট্রী বের করে দিলেন, উষ্ট্রীটি পাহাড়ের ভেতর থেকে বের হয়ে আসত এবং এ উপত্যকা দিয়েই আবার চলে যেত। উষ্ট্রী একদিন সে সম্প্রদায়ের সমস্ত পানি পান করে ফেলত। তাদের জন্যে বা তাদের পশুগুলোর জন্যে কোন পানি থাকত না। একদিন লোকেরা ঐ উষ্ট্রীর দুধ পান করে অতিবাহিত করত। অবশেষে তারা উষ্ট্রটিকে হত্যা করল। তখন এত বিকট একটি শব্দ হল যার কারণে সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হল। আল্লাহ পাক সকলকেই শেষ করে দিলেন। শুধু এক ব্যক্তি বেঁচে গিয়েছিল কেননা, সে কা'বা শরীফের ভেতর ছিল। আরজ করা হল ইয়া রসূলাল্লাহ! এ ব্যক্তি কে ছিল? তিনি এরশাদ করলেন, সে ছিল আবু রেগাল। যখন সে হরম শরীফ থেকে বের হল তখন তার প্রতিও অনুরূপ আযাব আপতিত হল যা ইতিপূর্বে তার সম্প্রদায়ের উপর এসেছিল। অতএব, তোমরা এমন সম্প্রদায়ের কাছেও যেওনা, যাদের প্রতি আল্লাহ পাক আযাব নাযিল করেছেন।

এক ব্যক্তি এ বিবরণ শুনে আশ্চর্যন্বিত হল। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আমি এর চেয়েও বিস্ময়কর বিষয়ের সংবাদ তোমাকে দিচ্ছি। তোমাদেরই মধ্যকার এক ব্যক্তি তোমাদের নিকট অতীত কালের ঘটনাবলী বর্ণনা করছে এবং ভবিষ্যতে কি ঘটবে সে সম্পর্কেও তোমাদেরকে অবহিত করছে, অতএব, তোমরা সুদৃঢ় থাক এবং সঠিক পথে চল, তোমাদেরকে আযাব দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ পাক এতটুকু পরোয়া করেন না। ভবিষ্যতে আল্লাহ পাক এমন কিছু লোক সৃষ্টি করবেন, যারা নিজেদের উপর আপতিত বিপদ থেকে রক্ষা পাবেনা। আজ রাতে অত্যন্ত জোরে বায়ু প্রবাহিত হবে, কেউ যেন দাঁড়িয়ে না থাকে, যার নিকট উষ্ট্র রয়েছে সে যেন উষ্ট্রকে

মজবুত ভাবে বেঁধে রাখে। তোমাদের মাঝ থেকে কেউ যেন সঙ্গী না নিয়ে একা বের না হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হেদায়েতের উপর সকলেই আমল করেছে।

শুধু বনী সা'আদা গোত্রের দু' ব্যক্তি এর উপর আমল করতে পারেনি। একজন প্রকৃতির ডাকে বের হয়ে যায়, আরেকজন তার উষ্ট্রের খোঁজে বের হয়। যে ব্যক্তি প্রকৃতির ডাকে বের হয়েছিল, বাতাস তাকে পথেই পাকড়াও করল। আর যে উষ্ট্রের খোঁজে বের হয়েছিল তাকে উড়িয়ে "তাঈ" গোত্রের পাহাড়ের উপর ফেলে দেয়া হয়েছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাদের সংবাদ দেয়া হলে তিনি এরশাদ করলেন, আমি এ সম্পর্কে তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলাম। যে বাতাসের কারণে পথে আক্রান্ত হয়েছিল, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার জন্যে দোয়া করলেন, ফলে সে সুস্থ হলো। আর যে ব্যক্তিকে পাহাড়ের উপর ফেলে দেয়া হয়েছিলো, তাকে "তাঈ" গোত্রের লোকেরা তাঁর খেদমতে পৌঁছে দিয়েছিলেন, যখন তিনি তাবুক অভিযানের পর মদীনা মোনাওয়্যারায় প্রত্যাবর্তন করেন।

(৩)

তাবুক অভিযানের আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন মোহাম্মদ এবনে ওমর এবং এবনে এছহাক। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রী হারিয়ে গিয়েছিল। লোকেরা তার খোঁজে বের হয়। বনী কিনকা গোত্রের যায়েদ এবনে লছীব নামক ইহুদী মুসলমান হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল মুনাফেক। হযরত আম্মার এবনে হজমের সঙ্গে সে থাকত। এই মুনাফেক বলল, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নবী হওয়ার এবং আসমানী খবর পরিবেশনের দাবী করেন অথচ তিনি একথাও জানেন না যে, তাঁর উষ্ট্রী কোথায় গিয়েছে। হযরত আম্মার (রাঃ) তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলেন (মুনাফেক তাঁর অনুপস্থিতিতে একথা বলেছিল)।। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, মুনাফেক একথাটি বলেছে। আল্লাহর শপথ! আমি এতটুকুই জানি যতটুকু আল্লাহ পাক আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। এখন আল্লাহ পাক আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন উষ্ট্রী অমুক স্থানে আছে। এরপর তাঁর নির্দেশ মোতাবেক লোকেরা সেখানে উষ্ট্রীকে পেয়ে নিয়ে আসে। এরপর হযরত আম্মার (রাঃ) যায়েদের নিকট গমন করলেন এবং তার গলা টিপে ধরে বললেন, হে আল্লাহর দুশমন! তুই এখান থেকে বের হয়ে যা।

(৪)

ইমাম মুসলিম (রঃ) হযরত মুগীরা এবনে শোবা (রাঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন, (এ অভিযানেই) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের পূর্বে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হয়ে যান (লোকেরা তাঁর অপেক্ষা করছিলেন), যখন আলো বেশী দেখা দিল এবং সূর্য ওঠার আশঙ্কা হচ্ছিল তখন তারা হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ)-কে ইমামতির জন্যে আগে বাড়িয়ে দিলেন। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অজু সুসম্পন্ন করে তশরিফ আনলেন এবং জামাতের সঙ্গে এক রাকাআত আদায় করলেন, আর এক রাকাআত পরে আদায় করে সালাম ফেরালেন এবং এরশাদ করলেন, তোমরা ভাল করেছ, নামায সঠিক সময়ে আদায় কর, কোন নবীর

এন্তেকাল সে পর্যন্ত হয়নি যে পর্যন্ত তিনি তাঁর উম্মতের কোন নেক ব্যক্তির পেছনে নামায আদায় না করেছেন। অর্থাৎ আবদুর রহমানের পেছনে আমি যে নামায আদায় করেছি তা কোন নতুন কথা নয়; না এতে আমার কোন প্রকার অপমান হয়েছে, বরং এটি প্রত্যেক নবীরই সুন্নত। প্রত্যেক নবী তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর উম্মতের কোন নেককার ব্যক্তির পেছনে অবশ্যই নামায আদায় করেছেন।

(৫)

আহমদ এবং তেবরানী বর্ণনা করেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর উষ্ট্রের উপর তাঁর পেছনে হযরত সোহাইল এবনে বয়যাকে বসিয়ে নিয়েছেন। এরপর উচ্চস্বরে এরশাদ করলেন, সোহাইল! সোহাইল! তিনি আরজ করেছেন, আমি হাযির। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এভাবে তিনবার ডাক দিয়েছেন, সোহাইল (রাঃ) প্রত্যেকবারই জবাব দিয়েছেন, আমি হাযির। এতে লোকেরা উপলব্ধি করেছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য হয়তো আমাদের সম্মুখে ভাষণ দান করবেন। তাই সমস্ত লোক একত্রিত হয়ে গেলেন। তখন তিনি এরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ বা উপাস্য নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, আল্লাহ পাক তার জন্যে দোযখ হারাম করে দিয়েছেন।

(৬)

মোহাম্মদ এবনে ওমর এবং আবু নাঈম বর্ণনা করেন, (তাবুক অভিযানে একবার) একটি বড় সর্প পথের সম্মুখে পড়ল; সর্পটি ছিল অত্যন্ত মোটা; সর্পটি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দিকে অগ্রসর হল এবং তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি তখন উষ্ট্রের উপর ছিলেন। লোকেরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দিকে দেখছিলেন, উষ্ট্রীও দাঁড়িয়ে গেল। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, এ সর্পটি আটজন জ্বীনের মধ্যে একজন যে পবিত্র কোরআন শ্রবণের জন্যে আমার নিকট এসেছে, সে তোমাদেরকে সালাম বলছে, উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন, ওয়ালাইহিস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

(৭)

ইমাম আহমদ (রঃ) হযরত হোযায়ফা (রাঃ)-এর সূত্রে হযরত মুআজ (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ইনশাআল্লাহ! আগামীকাল তোমরা তাবুকের ঝর্ণার নিকট পৌছে যাবে, আর একটু বেলা হলেই পৌছবে, যে আগে পৌছবে সে আমার সেখানে না পৌছানো পর্যন্ত পানি স্পর্শ করবে না। (আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা মোতাবেক) পৌছে যাই কিন্তু আমাদের পূর্বে দু' ব্যক্তি পৌছে গিয়েছিল, ঝর্ণা থেকে পানি চামড়ার ফিতার মত প্রকাশিত হচ্ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ দু' ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি পানি স্পর্শ করেছ? তারা বলল জ্বী-হ্যাঁ। তখন তিনি তাদেরকে কঠোর ভাষায় আল্লাহ পাকের যা ইচ্ছা ছিল তাই বললেন। এরপর লোকেরা হাতের অঞ্জলীতে করে অল্প অল্প পানি নিয়ে একটি চামড়ার মশক ভরে নিলেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ পানিতে দস্তে মোবারক এবং মুখমন্ডল ধৌত করলেন এবং তাতে কুলিও করলেন। এরপর ঐ পানি পুনরায় ঢেলে দিলেন। ফলে এখন পানি অধিক পরিমাণে প্রবাহিত হতে লাগলো। এবনে এসহাকের বর্ণনা হল এই যে, মাটি ফেটে পানি বের হতে লাগল। আর পানি প্রবাহিত হওয়ার এমন শব্দ হতে লাগল, যেমন বিদ্যুৎ চমকানোর সময় হয়, তাবুকের সেই পানির ফোয়ারা বর্তমান রয়েছে। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন হে মুআজ! যদি তোমাদের জীবন সুদীর্ঘ হয় তবে তোমরা দেখবে এখানে চারি পার্শ্বে বাগ-বাগিচা আবাদ হবে।

(৮)

ইমাম আহমদ এবং নেসায়ী (রঃ) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তাবুকের সফরে একদিন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিলেন, তখন খেজুরের একটি বৃক্ষের উপর তিনি হেলান দিয়েছিলেন, তিনি উচ্চস্বরে এরশাদ করলেন, আমি কি বলব তোমাদেরকে সবচেয়ে ভাল এবং মন্দ ব্যক্তি কে? সবচেয়ে ভাল মানুষ সে, যে অশ্ব অথবা উষ্ট্রের উপর আরোহন করে অথবা পদব্রজে মালপত্র উঠিয়ে আমৃত্যু আল্লাহর রাহে জেহাদে মশগুল থাকে। আর মন্দ লোকদের মধ্যে সে ব্যক্তি যে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে কিন্তু কিতাবে বর্ণিত বিধি-নিষেধের প্রতি মনোনিবেশ করে নিজের কোন আকাঙ্ক্ষা থেকে বিরত হয়না।

(৯)

ইমাম আহমদ এবং আবু দাউদ বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করছিলেন, একটি ছেলে তাঁর সামনে দিয়ে হেঁটে গেল, তিনি এরশাদ করলেনঃ হে আল্লাহ! এর পায়ের চিহ্ন বা পা কেটে দাও। তখন ছেলেটির চলৎ শক্তি রহিত হয়ে গেল।

(১০)

মোহাম্মদ এবনে ওমর বনী সা'দ গোত্রের এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেন, তাবুকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কয়েক ব্যক্তির সম্মুখে বসেছিলেন, তখন আমি তাঁর দরবারে হাযির হলাম, তিনি এরশাদ করলেন, বেলাল! আমাদেরকে খাবার দাও। তখন বেলাল (রাঃ) কয়েকবার নিজের হাত থেকে ঘি এবং পনির মিশ্রিত খেজুর বের করে দিলেন। আমরা সবাই তা খেয়ে তৃপ্তি লাভ করলাম। তখন আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি ইতিপূর্বে একাই এতগুলো খেয়ে ফেলতাম। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, কাফের সাত অন্ত্রে আহার করে আর মোমেন করে এক অন্ত্রে। এরপর দ্বিতীয় দিন যখন আমি তাঁর দরবারে হাযির হলাম তখন তাঁর চারিপার্শ্বে দশজন লোক ছিলেন। তিনি বললেন, বেলাল! আমাদেরকে খাবার দাও। হযরত বেলাল (রাঃ) তখন থলে থেকে মুষ্টি ভরে খেজুর বের করতে লাগলেন। তিনি এরশাদ করলেন, বের করতে থাক এবং মহান আরশের মালিকের পক্ষ থেকে এ আশঙ্কা করোনা যে অভাবগ্রস্ত হয়ে যাবে (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নিকট কোন কিছুর অভাব নেই, তিনি আগামীকাল পুনরায় দান করবেন)।

তখন হযরত বেলাল (রাঃ) থলের খেজুরগুলো সম্পূর্ণ ঢেলে দিলেন। আমার ধারণায় তা প্রায় দু' সের হবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খেজুরগুলোর উপর দস্তে মোবারক রেখে দিলেন এবং এরশাদ করলেন, তোমরা বিসমিল্লাহ বলে খেজুর খাও। সকলেই খেলো। আমিও খেলাম। সবার খাবার শেষে দেখা গেল চামড়ার দস্তর খানটির উপর এতগুলো খেজুরই রয়ে গেছে যা হযরত বেলাল (রাঃ) এনেছিলেন। মনে হচ্ছিল যে, আমরা একটি খেজুরও খাইনি। তৃতীয় দিন সকালে আমি পুনরায় হাযির হই। গতকাল যারা ছিল আজ সে দলটি উপস্থিত হল। তারা দশজন ছিল বা দু' একজন বেশীও হতে পারে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল (রাঃ)-কে বললেন, বেলাল! আমাদেরকে খাবার দাও। হযরত বেলাল (রাঃ) ঐ থলেটি নিয়ে আসলেন যা ছিল আমার পরিচিত। হযরত বেলাল (রাঃ) খেজুরগুলো ছড়িয়ে দিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার উপর দস্তে মোবারক স্থাপন করলেন এবং এরশাদ করলেন, আল্লাহ পাকের নাম নিয়ে খাও। আমরা সকলেই খেয়ে তৃপ্তি লাভ করলাম। এরপর দেখলাম খেজুর যা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল তাই রয়ে গেছে, এভাবে তিনদিন হয়েছে।

(১১)

মোহাম্মদ এবনে ওমর, আবু নাঈম এবং এবনে আসাকের হযরত এরবাজ এবনে সারীয়ার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আমরা তিনজন ছিলাম। আমি এবং জোয়াল এবনে সারাকা ও আবদুল্লাহ এবনে মোগাফফাল মোযানী, আমরা সবাই ক্ষুধার্ত ছিলাম। আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দুয়ারে পড়ে থেকে দিন গুজরান করতাম। একদিন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর তাবুতে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)। ভেতরে প্রবেশ করে পানাহারের দ্রব্যের খোঁজ করলেন কিন্তু কিছুই পাওয়া গেলনা। বাইরে এসে তিনি হযরত বেলালকে ডাক দিলেন এবং এরশাদ করলেন, এদের রাতের খাবারের কিছু ব্যবস্থা আছে কি? হযরত বেলাল (রাঃ) থলে নিয়ে নিলেন এবং প্রত্যেকটি থলে ঝাড়তে শুরু করলেন। প্রত্যেকটি থলে থেকে একটি কি দু'টি খেজুর পড়তে লাগলো।

অবশেষে সাতটি খেজুর একটি পাত্রে রাখা হল। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ খেজুরগুলোর উপর দস্তে মোবারক রেখে দিলেন। এরপর বিসমিল্লাহ পাঠ করলেন এবং এরশাদ করলেনঃ "তোমরা বিসমিল্লাহ পাঠ করে খাও"। আমরা খেজুর খেলাম। আমি নিজেই ৫৪টি খেজুর খেয়েছি। আমি দানাগুলো গননা করে অন্য হাতে রাখছিলাম। আমার উভয় সাথীও তাই করছিলেন যা আমি করছিলাম। আমরা প্রত্যেকে গড়ে ৫০টি করে খেজুর খেয়েছি। কিন্তু তারপরও দেখি ঐ সাতটি খেজুর এখনও রয়েছে যা পূর্বে ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, বেলাল! এগুলো উঠিয়ে নাও, সবার পেট ভরে গেছে এখন আর কেউ খাবে না। যখন সকাল হল হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায আদায় করলেন এবং তাঁর তাবুর নিকট গমন করে বাইরে বসে গেলেন, আমরাও তাঁর চার পাশে বসলাম।

এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের নিকট সকালের খাবার বলতে কিছু আছে? (লোকদের অস্বীকার করার পর) তিনি হযরত বেলালকে খেজুর নিয়ে আসার আদেশ দিলেন। এরপর খেজুরের পাত্রের উপর তিনি দস্তে মোবারক স্থাপন করলেন এবং এরশাদ করলেন, "তোমরা বিসমিল্লাহ্ পাঠ করে খাও"। আমরা তাঁর নির্দেশ মোতাবেক আহার করলাম। শপথ সেই আল্লাহ্ পাকের, যিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন, আমরা দশজন ছিলাম। সবার পেট ভরে গেল। সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভের পর আমরা সকলেই হাত উঠিয়ে নিলাম, কিন্তু খেজুর পূর্বে যা ছিল তখনও তাই ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করলেন, এখন আল্লাহ্ পাকের নিকট (আরও দোয়া করতে) আমি লজ্জা বোধ করি। যদি এমন কথা না হত তবে মদীনা পৌঁছা পর্যন্ত আমরা এই খেজুরগুলোই খেতে থাকতাম। ঘটনাক্রমে তখন ঐ শহরের একটি ছোট ছেলে সম্মুখে আসলো। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দস্তে মোবারকে ঐ খেজুরগুলো নিয়ে ঐ ছেলেটিকে দান করলেন। সে খেজুরগুলো চিবানো শুরু করলো এবং চলে গেল।

(১২)

মোহাম্মদ এবনে ওমর বর্ণনা করেন, তাবুকে একবার অত্যন্ত তীব্রবেগে বাতাস বয়ে গেল। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, এক বড় মুনাফেকের মৃত্যুর জন্যে (এই বাতাস প্রবাহিত হয়েছে)। আমরা মদীনা শরীফ পৌঁছে জানতে পারলাম এক বড় মুনাফেক মারা গেছে।

(১৩)

মোহাম্মদ এবনে ওমর বর্ণনা করেন, বনী সা'দ গোত্রের কিছু বিপদগ্রস্ত লোক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা আপনার খেদমতে হাযির হয়েছি, আমাদের পরিবারবর্গকে এমন কূপের নিকট রেখে এসেছি যেখানে পানি অত্যন্ত কম, আর এটি অত্যন্ত গরমের সময়। যদি আমরা সেখানে বসবাস করা পরিত্যাগ করি তবে আমাদেরকে হত্যা করার আশংকা রয়েছে, কেননা আমাদের এলাকায় তখনও ইসলাম পৌঁছেনি। আপনি আমাদের পানির জন্যে আল্লাহ্ পাকের নিকট দোয়া করুন। যদি আমরা পানির ব্যাপারে তৃপ্তি লাভ করতে পারি তবে সেখানে আমাদের চেয়ে কোন সম্মানিত সম্প্রদায় থাকবেনা। আমাদের দ্বীনের কোন বিরোধী দল আমাদের নিকট আসতেও পারবেনা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমরা আমার নিকট কয়েকটি পাথর নিয়ে আস।

এক ব্যক্তি তিনটি পাথর এনে পেশ করলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পাথরগুলো দস্তে মোবারকে নিয়ে নিলেন এবং এরশাদ করলেন, এই পাথর গুলো নিয়ে যাও এবং একটি একটি করে বিসমিল্লাহ পাঠ করে কূপে ঢেলে দাও। লোকেরা চলে গেল, তাঁর নির্দেশ মোতাবেক কাজ করলো। সঙ্গে সঙ্গে কূপের পানি উপচে পড়লো। এরপর তারা তাদের শত্রু মুশরেকদেরকে সেখান থেকে বের করে দিল। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন বনী সা'দ গোত্রের লোকেরা সমস্ত এলাকাবাসীর নিকট ইসলামের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং সকলে মুসলমান হয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুগত হয়েছিলেন।

(১৪)

তেরবানী হযরত এবনে ওমর এবং মুআবিয়া হযরত আবু সুফিয়ানের সূত্রে এবং বায়হাকী হযরত সা'দ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন সূর্য ওঠার সময় এমন আলো দেখা গেল যা গত জীবনে কখনও দেখিনি। এমন সময় জীব্রাইল (আঃ) আসলেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জীব্রাইলকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। জীব্রাইল (আঃ) বললেন, আজ মদীনায় মায়াবিয়া এবনে মায়াবিয়া মোযানীর (রাঃ)-এর এন্তেকাল হয়েছে। সূর্যের এই অস্বাভাবিক আলোক রশ্মির কারণ হল এই। এজন্যে আল্লাহ পাক তাঁর জানাযায় শরীক হওয়ার জন্যে সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করেছেন, আপনিও কি তাঁর জানাযা আদায় করবেন? হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, হ্যাঁ। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর গায়েবানা নামাযে জানাযা আদায় করলেন। ফেরেশতাগণ তাঁর পেছনে দু' কাতারে দন্ডায়মান হলেন। নামায সুসম্পন্ন করার পর তিনি জীব্রাইল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, মায়াবিয়ার এ উচ্চ মর্তবা লাভের কারণ কি? হযরত জীব্রাইল (আঃ) জবাব দিলেন, সে "কুল হুয়াল্লাহু আহাদ" সূরার সঙ্গে বিশেষ মহব্বত রাখতো। ওঠা-বসায় চলাফেরায় আরোহী অবস্থায় মোটকথা সকল অবস্থায় কুল হুয়াল্লাহু সূরা পাঠ করতো।

(১৫)

হারেস এবনে উসামা হযরত বকর এবনে আবদুল্লাহ মোযানীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি এই চিঠিটি কায়সারের নিকট (রোমক সম্রাট) নিয়ে যাবে তার জন্যে জান্নাত। এক ব্যক্তি আরজ করলো, যদি কায়সার চিঠি গ্রহণ না করে তবুও? তিনি এরশাদ করলেন, হ্যাঁ। সে ব্যক্তি চিঠি নিয়ে কায়সারের নিকট চলে গেল।

কায়সার চিঠি পাঠ করে বললো, তুমি তোমাদের নবীর নিকট গিয়ে বল, আমি তাঁর তাবেদার, তবে আমি আমার রাজত্ব ছাড়তে চাইনা, রোমক সম্রাট তার মাধ্যমে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে কিছু স্বর্ণমুদ্রা প্রেরণ করলেন। দূত প্রত্যাবর্তন করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট কায়সারের পয়গাম আরজ করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, সে মিথ্যা বলেছে। এরপর তিনি স্বর্ণমুদ্রাগুলো বিতরণ করে দিলেন।

(১৬)

বায়হাকী এবনে এসহাকের সূত্রে এজিদ এবনে রোমান এবং আরদুল্লাহ এবনে বকরের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তাবুক অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তন কালে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নবম হিজরীর রজব মাসে খালেদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)-কে ৪২০জন অশ্বারোহী সহ দওমাতুল জন্দলে প্রেরণ করেন। তখন দওমাতুল জন্দলের শাসনকর্তা ছিল আকিদর এবনে আবদুল মালেক। তাকে গ্রেফতার করার জন্যেই খালেদ এবনে ওয়ালিদ (রাঃ) প্রেরিত হন। আকিদর ছিল একজন খৃষ্টান। হযরত খালেদ (রাঃ) আরজ করলেন, আমার সঙ্গে অত্যন্ত অল্প সংখ্যক লোক রয়েছে। বনী কেলাবের বস্তির

ভেতর প্রবেশ করে আকিদরকে গ্রেফতার করা কিভাবে সম্ভব হবে? হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "তুমি তাকে শিকার খেলায় রত অবস্থায় পাবে। সেখানেই তাকে গ্রেফতার করবে। এরপর আল্লাহ্ পাক দওমাতুল জন্দল বিজয় দান করবেন। তুমি তাকে পাকড়াও করে হত্যা করোনা, আমার নিকট নিয়ে এসো"।

নির্দেশ মোতাবেক হযরত খালেদ এবনে ওয়ালিদ (রাঃ) চলে গেলেন এবং তার দুর্গের এতটুকু নিকটে পৌঁছে গেলেন যে, চাঁদনী রাতে তাকে দেখা যেতে পারে। আকিদর তখন তার বাড়ীর ছাদের উপর ছিল। তার স্ত্রী রোবাবা বিনতে আনিফও সেখানে উপস্থিত ছিল। গরমের কারণে সে একটি গায়িকা বাঁদী নিয়ে দুর্গের উপরে চলে গেল এবং পানীয় দ্রব্য পান করলো। ঠিক ঐ সময় একটি শিকারী জন্তু তার দুর্গের ফটকের কাছে আসলো। শিকারী জন্তুটিকে দেখে সে নিচে এসে অশ্বে আরোহন করলো। তার সঙ্গে আরও কয়েকজন অশ্বে আরোহন করলো। তন্মধ্যে একজন তার ভাই হাচ্ছান ছিল। আর দু'জন ছিল গোলাম। যখন তারা দুর্গ থেকে কিছুটা দূরত্বে পৌঁছে যায় তখন খালেদ (রাঃ)-এর লোকেরা আকিদরকে গ্রেফতার করে ফেলে। আকিদর বন্দী হয়ে গেল। তার ভ্রাতা হাচ্ছান যুদ্ধ করে নিহত হলো। উভয় গোলাম এবং অন্যান্যরা পালিয়ে দুর্গে পৌঁছে গেল। হযরত খালেদ (রাঃ) আকিদরকে বললেন, আমি তোমাকে জীবনের নিরাপত্তা দিয়ে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে যেতে পারি, যদি তুমি এই এলাকার বিজয়ের ব্যাপারে সহযোগিতা কর।

আকিদর বললো, ঠিক আছে। হযরত খালেদ (রাঃ) আকিদরকে নিয়ে দুর্গের নিকট পৌঁছলেন। আকিদর দুর্গবাসীকে ডাক দিয়ে বললো, ফটক খুলে দাও। দুর্গবাসী ফটক খোলার ইচ্ছা করলো কিন্তু আকিদরের ভাই মাসাদ ফটক খুলতে অস্বীকৃতি জানালো। আকিদর খালেদকে বললো, দুর্গবাসী যখন দেখেছে আমি তোমার বন্দী তাই আমার কথায় তারা ফটক খুলবে না। এজন্যে তুমি আমাকে মুক্তি দাও। আমি আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করছি যে, যদি আমার পরিবারবর্গের নিরাপত্তার শর্তে তুমি আমার সঙ্গে শান্তি চুক্তি করতে চাও তবে আমি তোমার সঙ্গে শান্তি চুক্তি করবো এবং দুর্গের ফটক খুলে দেব।

হযরত খালেদ (রাঃ) বললেন, আমি (এ শর্তের উপর) তোমার সাথে শান্তি চুক্তি করছি। আকিদর বললো, তুমি যদি ইচ্ছা কর, তবে বাৎসরিক কত টাকা আদায় করতে হবে তা তুমি নিজেই নির্ধারণ করতে পার, আর ইচ্ছা করলে আমাকেও নিদৃষ্ট করার অধিকার দিতে পার। হযরত খালেদ (রাঃ) বললেন, তুমি যা ইচ্ছা দিয়ে দিও, আমরা গ্রহণ করবো। তখন সিদ্ধান্ত হল দু' হাজার উষ্ট্র, চারশ' শিরস্ত্রাণ, চারশ' যুদ্ধাস্ত্র, চারশ' বর্শা আকিদর আদায় করবে। আর এ শর্তও মেনে নেয়া হল যে, হযরত খালেদ (রাঃ) আকিদর এবং তার ভাইকে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিয়ে যাবেন। আর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে তাঁর মর্জি মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

এরপর হযরত খালেদ (রাঃ) আকিদরকে মুক্তি দিলেন। আকিদর চলে গেল এবং ফটকের দ্বার খুলে দিল। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে

আকিদরের ভাই মাসাদকে গ্রেফতার করলেন এবং শান্তি চুক্তির বিনিময় উশুল করার পর আমর এবনে উমাইয়া জামেরীকে বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট প্রেরণ করলেন। আমেরীর সঙ্গে আকিদরের নিহত ভাই হাচ্ছানের রেশমী জুব্বাটিও প্রেরণ করলেন। হযরত আনাস (রাঃ) এবং হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন হাচ্ছানের রেশমী জামাটি দরবারে নববীতে পেশ করা হল তখন মুসলমানগণ তার মসৃণ কাপড় ও সৌন্দর্য দেখে আশ্চর্যন্বিত হলেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করলেনঃ তোমরা এটি দেখে আশ্চর্যন্বিত হচ্ছো, সেই আল্লাহর শপথ! যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, জান্নাতে সাদ এবনে মুআজের রূমাল এর চেয়ে অধিকতর সুন্দর হবে।

হযরত খালেদ এবনে ওয়ালিদ (রাঃ) চুক্তির বিনিময়ে লব্ধ সম্পদ থেকে কিছু দ্রব্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে বাছাই করে নিলেন। এরপর যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ থেকে এক পঞ্চমাংশ বের করলেন। এরপর অবশিষ্ট এক চতুর্থাংশ মুজাহেদ সাথীদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমার অংশে একটি যুদ্ধ পোশাক, একটি শিরস্ত্রাণ ও দশটি উট এসেছে। এরপর হযরত খালেদ (রাঃ) আকিদর এবং তার ভাই মাসাদকে নিয়ে মদীনা মোনাওয়্যারার দিকে রওয়ানা হলেন।

মোহাম্মদ এবনে ওমর হযরত যাবের (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেন, আমি দেখেছি যখন হযরত খালেদ (রাঃ) আকিদরকে নিয়ে আসলেন, তখন আকিদর রেশমী পোশাক পরিহিত ছিল এবং তার দেহে স্বর্ণ নির্মিত ক্রুশও ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখা মাত্র সে সেজদা করলো। হযরত রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দু'বার হাত দিয়ে তাকে সেজদা করতে নিষেধ করলেন। আকিদর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে কিছু হাদিয়া পেশ করলো, ঐ হাদিয়ার মধ্যে কিছু কাপড়ও ছিল

এবনে আসির লিখেছেন, হাদিয়ায় একটি খচ্চরও ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিযিয়া আদায়ের শর্তে আকিদরের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করলেন। আকিদর ও তার ভাইকে মাফ করে দিলেন। আর বাৎসরিক জিযিয়ার পরিমাণ নির্ধারিত হল ৩০০শ' স্বর্ণ মুদ্রা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আকিদরের সম্প্রদায়ের নামে একটি "আমান নামা" (নিরাপত্তাবাণী) লিখে দিলেন।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন হযরত খালিদ এবনে ওয়ালিদ লীদ (রাঃ)-কে দওমাতুল জন্দলে প্রেরণ করেন তখন এই খবর আইলা নামক স্থানের শাসনকর্তা ইয়াহনা বিন রোবাবের নিকট পৌঁছে। তখন সে আশঙ্কা করে হয়তো হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার নিকটও সৈন্য পাঠাবেন। সেজন্যে সে নিজেই তাঁর খেদমতে হাযির হয় এবং তার সাথে জারবা ও আজরাবের অধিবাসীরাও হাযির হয়।

আবু হামিদ সাঈদী বর্ণনা করেন, আইলার শাসনকর্তা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে একটি সাদা খচ্চর হাদীয়া হিসেবে পেশ করে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে একটি চাদর দান করেন এবং লিখিত নিরাপত্তা বাণীও দান করেন।

মোহাম্মদ এবনে ওমর হযরত যাবের (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেন, ইয়াহনা এবনে রোবাব যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয় তখন তার দেহে স্বর্ণের তৈরী ক্রুশও ছিল, কপালের উপরের চুলগুলো বেধে রেখেছিলো। সে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সামনে এসে মাথা নত করে ফেললো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে ইঙ্গিত করলেন, মাথা উঠাও। তিনি তখন তার সঙ্গে শান্তি চুক্তি করলেন এবং তাকে একটি ইয়ামনী চাদর দান করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আইলার শাসনকর্তাকে হযরত বেলাল (রাঃ)-এর নিকট অবস্থানের আদেশ দিয়েছিলেন।

মোহাম্মদ এবনে ওমর বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাবুক থেকে সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! যদি আপনার প্রতি আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে এর আদেশ হয়ে থাকে তবে এগিয়ে চলুন, আর যদি এর আদেশ না হয়ে থাকে তবে একথা মনে রাখা দরকার যে, সেখানে রূমীদের সংখ্যা অনেক অথচ কোন মুসলমান নেই, আমরা তাদের নিকট পৌছে গেছি। আপনার এত নিকটে আসার কারণে তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছে। এমন অবস্থায় যদি আমরা এ বছর প্রত্যাবর্তন করি এবং ভবিষ্যতের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করি অথবা অপেক্ষা করি যে আল্লাহ্ পাক কি আদেশ দেন, তাই সমীচিন মনে করি।

আহমদ, তেবরানী এবং তাহাবীর বর্ণনায় রয়েছে, তাবুকের যুদ্ধের সময় হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদি কোন এলাকায় প্লেগ রোগ মহামারির রূপ ধারণ করে তবে সেখান থেকে বের হয়োনা। আর যদি তুমি অন্যস্থানে থাক তবে সেখান থেকে মহামারীর এলাকায় প্রবেশও করোনা।

হাফেজ এবনে হাজার (রহঃ) লিখেছেন, হয়তো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খবর পেয়েছিলেন যে স্থানে তাঁর যাওয়ার ইচ্ছা ছিল সে স্থানে মহামারি ছড়িয়ে পড়েছে, তাই তিনি সেখানে গমনের ইচ্ছা বাতিল করেছেন এবং মদীনা মোনাওয়্যারায় প্রত্যাবর্তন করেছেন।

(১৭)

এসহাক এবনে রাহবিয়া হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর সূত্রে এবং আবু ইয়ালা, আবু নাঈম এবং এবনে আসাকের হযরত ওমর (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, (তাবুক অভিযানে) সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! যদি আপনি অনুমতি দান করেন তবে আমরা উষ্ট্র জবেহ্ করে আমাদের খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে পারি। এমন সময় হযরত ওমর (রাঃ) আসলেন এবং লোকদেরকে উষ্ট্র জবেহ্ করতে নিষেধ করলেন। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করলেন, আপনি কি লোকদেরকে যানবাহনের উষ্ট্র জবেহ্ করার এবং তার গোশ্‌ত খাওয়ার অনুমতি দান করেছেন?

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তারা আমার নিকট খাদ্যবস্তু না থাকা এবং ক্ষুধার্ত হওয়ার অভিযোগ করেছে। এজন্যে আমি তাদেরকে দু' একটা উষ্ট্র

জবেহ করার অনুমতি দিয়েছি। আর এভাবে পালাক্রমে আরও কিছু উষ্ট্র জবেহ করে তার গোশ্‌ত খেতে পারে এবং এভাবে বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।

তখন হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেন, এ কর্মসূচী গ্রহণ করলে যানবাহন কমে যাবে। দয়া করে আপনি এই নির্দেশ প্রদান করুন, "যার কাছে যে খাদ্য-দ্রব্য আছে তা একত্রিত কর"। এরপর আল্লাহ পাকের দরবারে তাতে বরকতের দোয়া করে দিন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, ঠিক আছে, তাই কর। এরপর চামড়ার একটি দস্তরখান বিছানো হল এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তরফ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করলো, যার কাছে যে খাদ্যদ্রব্য আছে তা নিয়ে আস। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যার কাছে যা ছিল সবই হাযির করা হল। কেউ সামান্য আটা, কেউ রুটির টুকরা আর কেউ খেজুর এক কথায় সবই হাযির করা হল। সমুদয় খাদ্য-দ্রব্য ওজনে ১০৮ সের হল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অজু করে দু' রাকাআত নামায আদায় করলেন এবং বরকতের দোয়া করলেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, ঐ খাদ্য-দ্রব্যে এত বরকত হল যে, সবাই খেয়ে (ত্রিশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম) তৃপ্তি লাভ করলেন এবং যার কাছে যে পাত্র ছিল তা পরিপূর্ণ করে নিলেন। এরপরও কিছু অবশিষ্ট ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, সকলে খেয়ে এবং পাত্র পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও যা পূর্বে ছিল তাই অবশিষ্ট থাকে। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আমি সাক্ষ্য প্রদান করি যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই আর আমি তাঁর রসূল। যে ব্যক্তি কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ না করে এ সাক্ষ্য দেবে, এমন হতে পারেনা যে তাকে জান্নাতে যেতে বাধা দেয়া হবে।

(১৮)

আবু নাঈম এবং মোহাম্মদ এবনে ওমরের বর্ণনা হল এই যে, হযরত কাতাদা (রাঃ) বলেন, তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় এক রাত্রের শেষ প্রহরে এক স্থানে আমরা অবতরণ করি। সেখানে আমরা সকলেই নিদ্রিত হই। আর যখন জাগ্রত হই তখন সূর্যের তাপ অনুভব করি। আমরা সকলেই "ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন" পাঠ করি। কেননা, আমাদের ফজরের নামাযের সময় চলে যায়। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যেভাবে শয়তান আমাদেরকে কষ্ট দিয়েছে এখন আমরাও তাকে কষ্ট দেব। আমার কাছে একটু পানি ছিল, তিনি তা দ্বারা অজু করলেন।

কিছু পানি অবশিষ্ট রয়ে গেল। তিনি এরশাদ করলেনঃ আবু কাতাদা, পাত্রে যে পানি রয়েছে তার হেফাজত করবে। যাহোক, সূর্যোদয়ের পর নামায আদায় করলাম। নামাযে তিনি সূরা মায়েদা পাঠ করলেন, নামায সুসম্পন্ন করার পর তিনি এরশাদ করলেন, যদি লোকেরা আবুবকর ও ওমরের পরামর্শ গ্রহণ করতো তবে সঠিক পথ লাভ করতো। কথা হল এই যে, হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) পরামর্শ দিয়েছিলেন, এখানে পানি নেই তাই এমন স্থানে অবতরণ করা উচিত নয়, যেখানে পানি রয়েছে সেখানে অবতরণ করা উচিত। কিন্তু লোকেরা একথা মানেনি। জঙ্গলে যেখানে পানি ছিলনা সেখানেই অবতরণ করেছে।

যাহোক, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রওয়ানা হলেন এবং দ্বিপ্রহরের সময় সৈন্যবাহিনীর সাথে একত্রিত হলেন। আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আমরা পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েছিলাম। কী অশ্ব, কী উষ্ট্র, কী মানুষ! পিপাসার কারণে কারোর ঘাড় যেন সোজা করা সম্ভব হচ্ছিল না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম চামড়ার তৈরী বাটি আনিয়ে নিলেন। আর পাত্রের মধ্যে যে পানিটুকু ছিল তা ঐ বাটিতে ঢেলে নিলেন। এরপর তাঁর আঙ্গুল মোবারক তাতে স্থাপন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আঙ্গুল থেকে পানি প্রবাহিত হতে থাকলো। লোকেরা আসতে থাকলো এবং পানি পান করে তৃপ্তি লাভ করলো এবং পানি সজোরে প্রবাহিত হতে থাকে এমনকি, সকলেই তৃপ্তি লাভ করলো এবং অশ্ব ও উষ্ট্রগুলোকেও পানি পান করানো হল। কাফেলায় সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার। আর সঙ্গে ছিল বারো হাজার উষ্ট্র ও বারো হাজার অশ্ব।

(১৯)

মোহাম্মদ এবনে ওমর বর্ণনা করেন, তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সে স্থানে পৌঁছলেন যা তাবুক ও ওয়াদিয়ে নাকার মধ্যখানে ছিল, সেখানে নিম্ন এলাকায় সামান্য পানি ছিল, যা দু'তিন জন অশ্বারোহীর জন্যে যথেষ্ট ছিল না। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ যে আমাদের পূর্বে ঐ পানির স্থানে পৌঁছে সে যেন আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে এবং সেই পানি পান না করে।

কিন্তু চারজন মুনাফেক সেখানে পূর্বেই পৌঁছে যায়। তারা ছিল মাতাব এবনে কোশাইর, হারেস এবনে এজিদ, ওদীয়া এবনে সাবেত এবং যায়েদ এবনে উসীব। যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পানির নিকট পৌঁছলেন তখন পানি একেবারেই দেখা যায়নি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের পূর্বে কে এখানে পৌঁছেছে। তখন তাদের নাম আরজ করা হল। তিনি এরশাদ করলেনঃ আমি কি তোমাদেরকে নিষেধ করিনি? এরপর তিনি তাদেরকে লা'নত দিলেন ও বদদোয়া করলেন। এরপর তিনি স্বয়ং ঐ ঝর্ণায় অবতরণ করে দু'টি আঙ্গুল মোবারক ঐ ঝর্ণায় রাখলেন। সামান্য পানি অঙ্গুলি ভরে তুললেন। এরপর ঐ ঝর্ণায় পানি ফেলে দিলেন। পুনরায় তাঁর দস্তে মোবারক পানির উপর স্থাপন করলেন, এরপর হঠাৎ করে পানি বের হতে লাগলো।

হযরত মুআজ এবনে জবল (রাঃ) বলেন, শপথ সেই আল্লাহ পাকের, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, আমি পানি বের হওয়ার এমন শব্দ শ্রবণ করলাম যেমন আকাশে বিদ্যুতের শব্দ হয়। লোকেরা ইচ্ছা মোতাবেক পানি পান করে এবং জন্তুদেরকে পানি পান করায়। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ যদি তোমরা দীর্ঘজীবি হও তবে শুনবে এই এলাকা বাগ-বাগিচায় পরিপূর্ণ হয়েছে।

(২০)

মোহাম্মদ এবনে ওমর বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পাহাড়ের টিলা থেকে নিম্ন ভূমিতে গমন করছিলেন, তখন অত্যন্ত গরম ছিল। সকলে পিপাসাগ্রস্ত ছিল কিন্তু কারো নিকট পানি ছিলনা। লোকেরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লামের নিকট এই কষ্টের কথা বললে তিনি হযরত ওসায়েদ এবনে হোজায়েরকে (রাঃ) সামান্য পানি আনার জন্যে প্রেরণ করলেন এবং এরশাদ করলেন, অনুসন্ধান কর হয়তো পেয়ে যাবে।

হযরত ওসায়েদ (রাঃ) একজন মহিলার নিকট সামান্য পানি পেলেন যা তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাতে বরকতের দোয়া করে এরশাদ করলেনঃ তোমরা আস, আমি তোমাদেরকে পানি পান করাবো। এরপর অবস্থা এই হল যার কাছে যে পাত্র ছিল সে তা নিয়ে আসলো এবং পানি দ্বারা পূর্ণ করলো, এরপর উষ্ট্রগুলোকে পানি পান করানো হল।

(২১)

তেবরানী হযরত ওবায়েদ (রাঃ)-এর সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, তাবুকের জেহাদে সুদীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করার কারণে এবং অত্যন্ত গরমের সময় পানাহারের কষ্টের কারণে উষ্ট্রগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। লোকেরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ ব্যাপারে আরজী পেশ করে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বচক্ষে দেখলেন, উষ্ট্রগুলো চলতে পারছেনা। তখন তিনি একটি সংকীর্ণ স্থানে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অতিক্রমরত উষ্ট্রগুলোর প্রতি ফুঁ দিতে লাগলেন।

এভাবে কাফেলা অগ্রসর হতে লাগলো। মদীনা শরীফ পৌঁছার পূর্বে উষ্ট্রগুলোর দুর্বলতা দূরীভূত হল। যখন মদীনা শরীফ দেখা গেল তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, এটি হল “তাবা”। যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ওহোদ পাহাড়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, এটি হল ওহোদ, সে আমাদের সাথে মহব্বত রাখে, আমরাও তার সাথে মহব্বত রাখি।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফ আগমন করলেন তখন মেয়েরা এবং শিশুরা এ পংক্তিটি আবৃত্তি করে–

طلع البدر علينا = من ثنية الوداع

এবনে সাদ বর্ণনা করেন, তাবুক যুদ্ধের পর লোকেরা অস্ত্র বিক্রয় করতে লাগলো এবং বলতে লাগলো যে, এখন জেহাদ শেষ হয়ে গেছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই খবর পেয়ে অস্ত্র বিক্রয় করতে নিষেধ করলেন এবং এরশাদ করলেনঃ দাজ্জাল বের হওয়া পর্যন্ত আমার উম্মতের এক দল সত্যের জন্যে জেহাদ করতে থাকবে।[১]

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৫৪-৭১

سُوْرَةُ يُوْنُسَ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ﴿١﴾ اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ
اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ
صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢﴾ اِنَّ
رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى
عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ۗ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهٖ ۗ ذٰلِكُمُ
اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۗ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٣﴾

সূরা ইউনুস প্রসঙ্গে

সূরা ইউনুস মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ১০৯, রুকু-১১

নামকরণ

যেহেতু এ সূরায় হযরত ইউনুস (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তাই সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সূরাটি 'সূরা ইউনুস' নামে খ্যাতি লাভ করে। অনেক সূরার নাম তার বিশেষ অংশের কারণে রাখা হয়েছে, এ সূরাটি তন্মধ্যে অন্যতম। এ সূরা হিজরতের পূর্বে মক্কা শরীফে নাযিল হয়েছে। এ সূরার ৩ খানি আয়াত মদীনা শরীফে নাযিল হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরা তওবায় মুশরেকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের এবং মুনাফেকদের অবমাননার কথা বর্ণিত হয়েছে। মুশরেক এবং মুনাফেকরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে অস্বীকার করে। তাঁর প্রতি যে আল্লাহর ওহী নাযিল হয় সে কথা তারা মেনে নিতে রাজি হয়নি। তৌহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদে তারা বিশ্বাস করতো না। এজন্যে এ সূরায় তৌহিদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালত এবং কেয়ামত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। এ

প্রসঙ্গে আল্লাহ পাকের একত্ববাদ এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালত সম্পর্কে তাদের মনে যে সন্দেহ ছিল তা খন্ডন করা হয়েছে। আল্লাহর কিতাবকে অস্বীকার করার ব্যাপারে মুশরেক এবং মুনাফেকরা ছিল একমত এবং একে অন্যের সহযোগী। তাই তাদের উভয়ের ভ্রান্ত মত ও পথের বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে এ সূরায়।

সূরা তওবার শেষে একথা এরশাদ হয়েছে, যখনই কোরআনে করীমের কোন আয়াত নাযিল হতো তখনই মুনাফেকরা এ ব্যাপারে বিদ্রুপ করতো। আর মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালত সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করতো। তারা একথাও বলতো, আবু তালেবের এতীম ভ্রাতষ্পুত্র ব্যতীত আল্লাহ পাক নবুওয়্যতের জন্যে আর কোন লোক পাননি। (নাউজুবিল্লাহ মিন জালেক)

এজন্যে সূরায়ে ইউনুসের শুরুতেই "কিতাবে হাকিমের" উল্লেখ রয়েছে। যে হেকমতপূর্ণ গ্রন্থের তথা মহান গ্রন্থ পবিত্র কোরআন সম্পর্কে মুনাফেকরা বিদ্রুপ করতো তারই আলোচনা দিয়ে শুরু হয়েছে সূরা ইউনুস। এরপর মুশরেকদের বিস্ময়ের জবাব দেয়া হয়েছে এভাবে–

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ

(অর্থাৎ এটি কি মানুষের নিকট বিস্ময়ের কারণ হয়েছে? যে, আমি তাদেরই মধ্য থেকে এক ব্যক্তির নিকট ওহী নাযিল করেছি)। এখানে স্মরণযোগ্য যে, সূরা তওবার শেষ আয়াতে–

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াত দ্বারা যেন একথা বলা হয়েছে যে, এমন গুণাবলীর অধিকারী মহান রসূলের বেসালতকে অস্বীকার করা নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়, যিনি তোমাদের কল্যাণ সাধানের জন্যে থাকেন উদগ্রীব, তোমাদের কষ্ট যাঁর নিকট দুঃসহ, যিনি তোমাদের জন্যে অত্যন্ত দয়াবান, অতীব মেহেরবান এমন রসূলকে অস্বীকার করা এবং তাঁর প্রতি বিদ্রুপ করা শুধু নির্বুদ্ধিতাই নয়, বরং হতভাগা হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এখানে আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য তা হল–সূরা তওবার শেষ আয়াতের সর্বশেষ অংশে ছিল তৌহিদের বয়ানঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

(আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, আমি তাঁর প্রতিই ভরসা রাখি, আর তিনি মহান আরশের মালিক) ঠিক এভাবে আলোচ্য সূরার শুরুতেও প্রথমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত ও রেসালতের কথা বর্ণিত হয়েছে। এরপর আল্লাহ পাকের একত্ববাদ এবং তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি-নৈপূণ্যের ও অনন্ত অসীম শক্তির বিবরণ দেয়া হয়েছে যেমন এরশাদ হয়েছে–

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ....

"নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ পাক, যিনি ছয় দিনে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন"।

এরপর মানুষের কর্মফল তথা আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর কথা এরশাদ হয়েছে। এভাবে সূরার শেষ পর্যন্ত আলোচ্য তিনটি বিষয়ের উপরও আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, যে সব সূরা মদীনা শরীফে নাযিল হয়েছে ঐ সূরা সমূহে বিশেষভাবে ইসলামের বিধি-নিষেধ বর্ণিত হয়েছে যেমন, নেকাহ্, তালাক, উত্তরাধিকার, কেসাস, জেহাদ এবং হালাল হারাম প্রভৃতি। পক্ষান্তরে, যে সব সূরা হিজরতের পূর্বে তথা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় নাযিল হয়েছে সেগুলোতে ইসলামের মূলনীতি যথা তৌহিদ, রেসালত এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের কথা বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু এ সূরাও মক্কায় অবতীর্ণ, তাই এ সূরায় তৌহিদ, রেসালত এবং আখেরাতের কথা বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত, সূরা তওবায় মুনাফেকদের অবস্থা, কথাবার্তা এবং পরিণাম সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। আর এ সূরায় কাফের ও মুশরেকদের অবস্থা, কথাবার্তা এবং পরিণাম সম্পর্কে ঘোষণা রয়েছে।

তাছাড়া এ পর্যায়ে আরও একটি কথা প্রণিধানযোগ্য, যেহেতু এ সূরা মক্কায় নাযিল হয়েছে তাই মক্কাবাসী কাফের মুশরেকদের উদ্দেশ্যে এতে রয়েছে বিশেষ নসিহত। এ প্রসঙ্গে হযরত ইউনুস (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইউনুস (আঃ)-এর সম্প্রদায় যথা সময়ে আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান এনেছে বলে এই ঈমান তাদের জন্যে উপকারী হয়েছে। হে মক্কাবাসী! যদি তোমরা আল্লাহ্ পাকের প্রতি ও তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর প্রতি ঈমান আন তবে তা তোমাদের জন্যে হবে উপকারী।

আল্লামা আলুসী (রহঃ) পূর্ববর্তী সূরার সাথে এ সূরার সম্পর্কের ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, সূরা তওবা শেষ করা হয়েছে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে বর্ণনা দ্বারা, আর এ সূরা শুরু করা হয়েছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আলোচনার মাধ্যমে।

দ্বিতীয়তঃ সূরা তওবায় এরশাদ হয়েছে, যখন কোরআনে করীমের কোন সূরা নাযিল হতো তখন মুনাফেকরা কি বলতো? আর এ সূরার এরশাদ হয়েছে, যখন পবিত্র কোরআনের কোন সূরা নাযিল হতো তখন কাফেররা কি বলতো? সূরা তওবায় মুনাফেকদের অন্যায় আচরণের বিবরণ স্থান পেয়েছে, আর এ সূরায় কাফেরদের নিন্দনীয় কর্মের বিবরণ দেয়া হয়েছে।[১]

১। তফসিরে রুহুল মা'আনী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৫৮

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

পরম করুণাময় অনন্ত অসীম দয়াময় আল্লাহর নামে

الٓرٰ تِلۡكَ اٰيٰتُ الۡكِتٰبِ الۡحَكِيۡمِ

তরজমা

(১) আলিফ, লাম রা। এগুলো জ্ঞান গর্ভ গ্রন্থের আয়াত।

(২) মানুষের জন্যে কি এটি আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তাদেরই এক ব্যক্তির নিকট ওহী প্রেরণ করেছি এ মর্মে যে, মানুষকে সতর্ক করুন আর মোমেনদেরকে সুখবর দিন যে, তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে উচ্চ মর্যাদা। কাফেররা বলে, নিশ্চয় এ হল এক সুস্পষ্ট যাদুকর।

(৩) নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ পাকই, যিনি আসমান এবং জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হন, সকল বিষয় তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ সুপারিশ করতে পারেনা। এই আল্লাহ পাকই তোমাদের প্রতিপালক। অতএব, তাঁরই এবাদত কর। তবুও কি তোমরা এ সত্য অনুধাবন করবে না?

তফসীরুল কোরআন

(আলিফ, লাম, রা) বিভিন্ন সূরার শুরুতে এ ধরণের বাক্য উল্লেখিত হয়েছে। এগুলোকে হুরুফে মোকাত্তাআত বলা হয়। এ সম্পর্কে সূরা বাকারার শুরুতে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, আলীফ, লাম, রা অর্থ হল انا الله ارى অর্থাৎ আমি আল্লাহ, আমি সবকিছু দেখি। যাহ্যাক (রহঃ) একথাই বলেছেন এবং মুজাহেদ (রহঃ)-ও এ মতই পোষণ করেছেন।[২]

تِلۡكَ اٰيٰتُ الۡكِتٰبِ الۡحَكِيۡمِ

পবিত্র কোরআনের মাহাত্ম

এগুলো জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের আয়াত। কেননা, পবিত্র কোরআনে বর্ণিত প্রত্যেকটি বিষয় জ্ঞান সমৃদ্ধ। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত প্রতিটি কথা যুক্তিসঙ্গত। বাস্তবের অগ্নি পরীক্ষায় বারে বারে পরীক্ষিত। যে গ্রন্থ সর্বকালের জন্যে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত, কোন প্রকার পরিবর্তন-

---

[১]। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯৩

[২]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১১, পৃষ্ঠা-৩৯
তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-১৬৯
তফসীরে রুহুল মা'আনী খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৫৮

পরিবর্ধন এখানে অচিন্ত্যনীয়, পবিত্র কোরআনের একটি অক্ষরও কেউ পরিবর্তন করতে পারেনা, এই সাধ্য কারো নেই। কেননা এর হেফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ পাক গ্রহণ করেছেন। পবিত্র কোরআনের প্রতিটি কথা হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ, যুক্তিপূর্ণ, কেননা এটি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ পাকের মহান বাণী। আর এ আয়াত সমূহ মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআনেরই, অতএব এর গুরুত্ব ও মর্যাদা সহজেই অনুমেয়।

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا

শানে নুযুল

এবনে জরীর যাহ্যাক (রঃ)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ পাক যখন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাঁর নবী মনোনীত করে প্রেরণ করেছেন তখন তারা তাঁকে নবী হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা বলে আল্লাহ পাক কি কোন মানুষকে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন? তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

এরশাদ হয়েছেঃ মানুষের জন্যে এটা কি আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তাদেরই মধ্যে এক ব্যক্তির নিকট ওহী প্রেরণ করেছি তথা–তাঁকে নবী মনোনীত করে পাঠিয়েছি যেন তিনি মানুষকে অন্যায় কাজের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করেন এবং ভাল কাজের শুভ পরিণতি সম্পর্কে সুসংবাদ দান করেন।

তফসীরকারগণ বলেছেন, মানুষ তাদের হাতে বানানো বস্তুকে উপাস্য বলে মেনে নেয়, কিন্তু একজন মানুষকে আল্লাহ পাক তাঁর রসূল হিসাবে প্রেরণ করলে তাকে মেনে নিতে রাজি হয় না; বরং তাতে বিস্ময় প্রকাশ করে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ একজন মানুষকে রসূল মনোনীত করার ব্যাপারে মানুষ যে বিস্ময় প্রকাশ করেছে এবং তাঁকে রসূল হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে মূলতঃ তাই হলো বিস্ময়কর বিষয়। কেননা, কোন মানুষের 'নবী হওয়া' কোন নতুন ঘটনা নয়। হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত লক্ষাধিক আম্বিয়ায়ে কেরাম প্রেরিত হয়েছেন যুগে যুগে, বিভিন্ন দেশে। আল্লাহ পাক মানুষকেই নবী মনোনীত করেছেন, জ্বীনও নয়, ফেরেশতাও নয়। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا

"আর (হে রসূল!) আমি আপনাকে রসূল মনোনীত করে প্রেরণ করেছি"।

এখানে উল্লেখ্য, দুনিয়ার শাসনকর্তাদেরও এই নীতি যে, যদি কোথাও কোন দূত প্রেরণ করতে হয় তবে যাদের নিকট দূত প্রেরণ করা হয় তারা যেন উপকৃত হতে পারে এবং তার কথা বুঝতে পারে এমন লোককেই প্রেরণ করা হয়। ঠিক এভাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন মানব জাতির পথ প্রদর্শনের জন্যে, মানবতার উৎকর্ষ সাধনের জন্যে মানুষের মধ্য থেকেই কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করেন এবং তাঁর নিকট ওহী প্রেরণ করেন

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৭১

যেন তিনি মানুষকে তাদের পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগী সম্পর্কে সতর্ক করেন, মানুষ যেন আল্লাহ পাকের প্রতি, তাঁর তৌহিদ বা একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এ দায়িত্ব অর্পিত হয় আল্লাহর নবীর প্রতি। এজন্যে অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ যদি পৃথিবীতে ফেরেশতাগণ বিচরণ করতো তবে আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকেই নবী হিসেবে প্রেরণ করতেন কিন্তু সারা পৃথিবীতে মানুষেরই পদচারণা হচ্ছে তাই আল্লাহ পাক একজন মানুষের নিকটই ওহী প্রেরণ করেছেন আর এটিই স্বাভাবিক, এতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই; বরং বিস্মিত হওয়াই বিস্ময়ের বিষয়, তাই অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, যদি পৃথিবীতে ফেরেশতাগণ চলাফেরা করতো তবে আমি রসূল হিসাবে ফেরেশতাকে প্রেরণ করতাম"।

اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ

অর্থাৎ তাদেরই মধ্য থেকে এক ব্যক্তির নিকট ওহী প্রেরণ করা বিস্ময়কর বিষয় নয়। কাফেররা বলেছিল যদি মানুষকেই রসূল বানানোর ইচ্ছা হয় তবে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে রসূল বানানো যেত। আল্লাহ পাক কোরআনে করীমে তাদের এ বক্তব্যকে এভাবে পেশ করেছেনঃ

لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ

"মক্কা এবং তায়েফ শহরদ্বয়ের কোন বড় লোকের উপর কোরআন কেন নাযিল হলো না"?

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ তারা সে যুগের বড় লোক বলতে ক্ষমতা এবং সম্পদে সমৃদ্ধ মক্কার ওলীদ এবনে মগীরা এবং তায়েফের মাসুদ এবনে ওমর সকফীকে উদ্দেশ্য করেছে। তাদের এ অন্যায় আবদারের প্রতিবাদে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ

(তারা কি আল্লাহর রহমতকে তথা নবুওয়্যত ও রেসালতকে নিজেরাই বন্টন করে যে, যাকে ইচ্ছা তাকে নবুওয়্যত দেয়ার কথা বলে) এটি কাফেরদের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়, তারা এ ক্ষণস্থায়ী জগতের ধন-সম্পদ এবং ক্ষমতাকে নবুওয়্যত লাভের মানদন্ড মনে করতো। অথচ নবুওয়্যতের ব্যাপারে ধন-সম্পদের কোন ভূমিকা নেই। তারা ওহীর মহিমা সম্পর্কে ছিল অজ্ঞ। নবুওয়্যত ও রেসালতের তাৎপর্য ছিল তাদের সম্পূর্ণ অজানা। নবুওয়্যত ও রেসালতের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও তারা অবহিত ছিলনা।

তাই এমন মূর্খতা প্রসূত মন্তব্য করতে তারা দ্বিধাবোধ করেনি। এজন্যে পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ পাক নবুওয়্যতের উদ্দেশ্য এবং নবীর দায়িত্ব সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেনঃ

اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

অর্থাৎ রসূলের দায়িত্ব হলো মানুষকে আল্লাহ পাকের নাফরমানীর পরিণাম সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা এবং মোমেনদেরকে তাদের শুভ পরিণতি সম্পর্কে সুসংবাদ দেয়া। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই, ভয় প্রদর্শনের ব্যাপারে النّاس শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতিকে ভয় প্রদর্শনই হলো হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান দায়িত্ব। আর সুসংবাদ দেয়ার ব্যাপারে শুধু মোমেনদের উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা কাফেরদের জন্যে কোন সুসংবাদ নেই, তাই সুসংবাদের ব্যাপারে শুধু ঈমানদারদের কথা উল্লেখিত হয়েছে।[১]

যাহোক, আল্লাহ পাক যাকে নবুওয়্যত দান করেছেন তিনি বংশের দিক থেকে সর্বোত্তম, চরিত্র মাধুর্যের দিক থেকে সর্বোত্তম, জ্ঞানের দিক থেকে অদ্বিতীয়। তিনি নিজেই এরশাদ করেছেন–

اوتيت علم الاولين والاخرين

আমাকে আগের পরের সকলের এলম দান করা হয়েছে। উদারতা, মহানুভবতা, দানশীলতা, ক্ষমা ও ঔদার্য, আমানতদারী এবং পবিত্রতা ছিল যাঁর বৈশিষ্ট্য, যিনি উম্মতের কল্যাণ সাধনে ছিলেন সর্বক্ষণ তৎপর, সেই নবীর প্রতি ঈমান না আনা ছিল সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। তাই হতভাগারা এমন নবীর প্রতি ঈমান না এনে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে ধ্বংস হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কবি সত্যই বলেছেনঃ

واحسن منك لم تر قط عينى = و مثلك قط لم تلد الشاء

خلقت مبرا من كل عيب = كانك قد خلقت كما تشاء

"আমার নয়ন (হে রসূল!) আপনার চেয়ে সুন্দরতর কাউকে দেখেনি, আর আপনার ন্যায় গুণের অধিকারী এই পৃথিবীতে আর কেউ জন্মগ্রহণ করেনি"।

"(হে রসূল!) সৃষ্টি হয়েছেন আপনি সকল দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত অবস্থায়, মূলতঃ আপনি যেমন চেয়েছিলেন ঠিক তেমনই সৃষ্টি হয়েছেন"।

মোমেনদের জন্যে সুসংবাদ

اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৭৩-৭৪
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৬১-৬২

"অর্থাৎ (হে রসূল!) ঈমানদারগণকে আপনি সুসংবাদ দান করুন যে, তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্যে রয়েছে সত্যিকারের পদমর্যাদা"।

আলোচ্য আয়াতে قدم صدق শব্দের ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ সম্পর্কে বলেছেন, সত্যের দাওয়াত শ্রবণ মাত্র সর্বপ্রথম তা বিশ্বাস করা এবং সত্য গ্রহণে অগ্রনায়কের ভূমিকা পালন করা।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো যাবতীয় নেক আমল যথা নামায, রোজা, সদকা, তসবীহ-তাহলিল এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শাফাআত। আর এবনে জরীর (রঃ) মুজাহেদ (রঃ)-এর সঙ্গে এ সম্পর্কে ঐক্যমত প্রকাশ করেছেন।[১]

আল্লামা আলুসী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো উচ্চ মর্তবা, অথবা এর অর্থ হলো বেহেশতে প্রবেশের ব্যাপারে উম্মতে মোহাম্মদীয়ার অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী হওয়া, যেমন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

ان الجنة محرمة على الانبياء حتى ادخلها انا وعلى الامم حتى تدخلها امتى

অর্থাৎ আমার প্রবেশের পূর্বে অন্য নবীদের জন্যে জান্নাত হারাম, এমনিভাবে আমার উম্মতের প্রবেশের পূর্বে অন্য উম্মতের প্রতিও জান্নাত হারাম অর্থাৎ সকল নবীর পূর্বে জান্নাতে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রবেশ করবেন আর অন্য উম্মতের পূর্বে তাঁর উম্মত প্রবেশ করবে। এ বৈশিষ্ট্য উম্মতে মোহাম্মদীয়ার। আলোচ্য আয়াতে এর সুসংবাদ রয়েছে।[২]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, قَدَمَ صِدْقٍ এর অর্থ হলো "উচ্চ মর্তবা", যেদিকে ঈমানদারগণ অগ্রসর হয়। মোমেনদের কথা এবং নিয়্যতের সত্যতার কারণেই তারা এ উচ্চ মর্তবা লাভ করবে। আলোচ্য বাক্যটি তারই ইঙ্গিত বহন করে। আর সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য কথা হলো "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" তথা তৌহিদে বিশ্বাস, মোমেনগণই এর প্রতি বিশ্বাস করে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ) আলোচ্য বাক্যটির এ ব্যাখ্যা করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) একথাও বলেছেন যে, এর অর্থ হলো মোমেনগণ এ জীবনে আখেরাতের জন্যে যে নেক আমল করে তার উত্তম বিনিময় তারা আখেরাতে পাবে।

যাহ্যাক (রঃ) একথাও বলেছেন, মোমেনগণ তাদের সত্যবাদীতার সওয়াব লাভ করবে।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ বলেছেন, নেক আমলের তওফিক। আর যায়েদ এবনে আসলাম (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১১, পৃষ্ঠা-৩৯
২। তফসীরে রুহুল মা'আনী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৬২

হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শাফাআত। ইমাম বোখারী (রঃ) লিখেছেন, যায়েদ এবনে আসলাম বলেছেন, এর অর্থ হলো তারা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শাফাআত লাভে ধন্য হবে।[১]

قَالَ الْكٰفِرُوْنَ

কাফেররা যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অলৌকিক ক্ষমতা বা মোজেযা দেখলো এবং তাঁর মাধ্যমে পবিত্র কোরআন শ্রবণ করলো তখন নিতান্ত হিংসা এবং জেদের বশীভূত হয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যাদুকর বলার ধৃষ্টতা দেখায় (নাউজুবিল্লাহ মিন জালেক)।

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে পবিত্র কোরআনের মাহাত্ম এবং শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে, নবুওয়্যত ও রেসালতের সত্যতা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে আল্লাহ পাকের সৃষ্টি-নৈপূণ্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। তিনিই বিশ্ব জগতের স্রষ্টা ও পালনকর্তা। মাত্র ছয় দিনে তিনি সমগ্র বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সৃষ্টি জগতের লালন-পালন করেন। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা সেই মহিমাময় পবিত্র সত্ত্বা, যিনি মাত্র ছয় দিনে নিখিল বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন। সমগ্র সৃষ্টি জগতের শৃঙ্খলা রক্ষা ও তাকে নিয়ন্ত্রণ করা সবই সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাকের হাতে রয়েছে। যিনি বিশ্ব জগতের এ বিশাল কারখানা সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তোমাদের হেদায়েতের জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পথিকৃত হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন।

যিনি তোমাদের উপর নীলাভ আকাশ সৃষ্টি করেছেন, যিনি বিশাল বিস্তৃত জমিন সৃষ্টি করেছেন ও তোমাদের প্রয়োজনের আয়োজনে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী এক কথায় সব কিছু সৃষ্টি করেছেন তিনিই তোমাদের হেদায়েতের জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলকে প্রেরণ করেছেন। অতএব, যে ওহী তাঁর প্রতি নাযিল হয়েছে তা যাদু নয়; বরং মানব জাতির হেদায়েতনামা। দোযখের শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে রক্ষাকবচ মাত্র। এ মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআন নাযিল করার এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য হলো মানুষ যেন আল্লাহ পাকের প্রদত্ত বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করে।

فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক মাত্র ছয় দিনে সমগ্র বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৭৪

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এই ছয় দিন দুনিয়ার ছয় হাজার বছরের সমান।[১] আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এই ছয় দিন দুনিয়ার ছয় দিনের সমান।[২]

এখানে একথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কোন কাজের জন্যে আল্লাহ পাকের সময়ের প্রয়োজন হয় না। তিনি এক মুহূর্তেই সব কিছু করতে পারেন কিন্তু মানুষকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। ক্ষমতা বা সামর্থ থাকলেই যেমন ইচ্ছা তেমন ঐ ক্ষমতা ব্যবহার করা উচিত নয়; বরং সবদিক ভেবে চিন্তে ক্ষমতা ব্যবহার করা উচিত।

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ

এরপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হন। আরশ সমগ্র সৃষ্টিজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আল্লাহ পাকই সমগ্র সৃষ্টি জগতের অভিভাবক। তাঁর দৃষ্টি থেকে আসমান জমিনের কোন কিছুই আড়ালে থাকতে পারেনা। প্রাণী মাত্রেরই রিয্কের দায়িত্ব আল্লাহর উপর। পৃথিবীতে একটি বৃক্ষের পাতাও যদি নড়ে ওঠে অথবা ঝরে পড়ে যায়, তবে আল্লাহ পাক সে সম্পর্কেও সম্পূর্ণ অবগত থাকেন।[৩]

তত্ত্বজ্ঞানীদের অভিমত

তফসীরকারগণ বলেছেন, "আল্লাহ পাক আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন"– এ কথাটির উপর ঈমান আনয়ন অবশ্য কর্তব্য এবং কিভাবে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এসব বিষয়ে অনুসন্ধান করা থেকে বিরত থাকা একান্ত জরুরী। এজন্যে ইমাম মোহাম্মদ হাসান (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের সমস্ত জ্ঞানীগণ এ সম্পর্কে একমত যে, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাকের যেসব গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে সেগুলোর উপর ঈমান আনা অবশ্য কর্তব্য। যে এর বিস্তারিত বিবরণের অনুসন্ধান করে সে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও উম্মতের বুজুর্গানে দ্বীনের খেলাফ কাজ করে।

ইমাম মালেক (রঃ) বলেছেন, "আল্লাহ পাক আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন"– এ কথার উপর আমরা বিশ্বাস করি। তবে কিভাবে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তা আমরা জানি না। আর এ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা হবে বেদআত। সলফে সালেহীন বিষয়টিকে কোন প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ব্যতীতই মেনে নিতেন।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ পাক তাঁর আরশের উপর অধিষ্ঠিত, তাঁর আসমানে তিনি বর্তমান, তিনি স্ব-ইচ্ছা মাফিক তাঁর সৃষ্টির নিকটবর্তী হন। যেখানে ইচ্ছা সেখানেই নাযিল হন। (অর্থাৎ) আল্লাহ পাকের আরশের উপর অধিষ্ঠিত হওয়া, সৃষ্টির

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৭৫
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১১, পৃষ্ঠা-৪০

[২]। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-১৬৯

[৩]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১১, পৃষ্ঠা-৪০

নিকটবর্তী হওয়া, কোথাও অবতরণ করা, সবই সত্য। কিন্তু এসব অবস্থার বিবরণ কারো জানা নেই। ইমাম আহমদ এবনে হাম্বল (রঃ)-ও এ মত পোষণ করেছেন।

এসহাক এবনে রাহবীয়া বর্ণনা করেনঃ সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ ব্যাপারে একমত যে, আল্লাহ্ পাক আরশের উপর অধিষ্ঠিত রয়েছেন। আর তিনি সব কিছুকে জানেন।

মুজানী, যাহাবী, বোখারী, আবু দাউদ, তিরমিজী, এবনে মাজাহ্, এবনে আবি শায়বা, আবু ইয়ালা, বায়হাকীসহ হাদীস শরীফের অন্যান্য সমস্ত ইমামগণ এ মতই পোষণ করেছেন। আবু যোরাইহ রাজী বলেছেনঃ একথার উপর আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত। হাফেজ ওসমান এবনে সাঈদ দারেমী লিখেছেনঃ সকল মুসলমান একথার উপর একমত যে, আল্লাহ্ পাক তাঁর আরশের উপর অধিষ্ঠিত রয়েছেন, যা আসমান সমূহের উপর রয়েছে।

মোহাম্মদ এবনে জরীর তাবারী লিখেছেনঃ মুসলমানের জন্যে এতটুকু জানা এবং মানা যথেষ্ট যে, তাঁর প্রতিপালক মহান আরশের উপর অধিষ্ঠিত রয়েছেন। যে এর চেয়ে অগ্রসর হতে ইচ্ছুক হবে সে ব্যর্থ হবে। ইমাম তাহাবী লিখেছেন, আরশ কুরসী তেমনই যেমন আল্লাহ্ পাক কোরআনে করীমে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ পাক আরশেরও মুখাপেক্ষী নন আর আরশের নীচে যত কিছু আছে কোন কিছুরই তিনি মুখাপেক্ষী নন। তিনি সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। আর তিনি সব কিছুর উর্ধ্বে রয়েছেন।

মোহাম্মদ এবনে খোজায়মা বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে এই বিশ্বাস রাখেনা যে, তিনি সাত আসমানের উপর মহান আরশে অধিষ্ঠিত রয়েছেন এবং সকল সৃষ্টি থেকে ভিন্ন রয়েছেন, সে কাফের।

শেখ আবুল হাসান আশআরী বসরী লিখেছেনঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এবং হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণের কথা হলো আল্লাহ্ পাককে, তাঁর ফেরেশতাদেরকে, আসমানী কিতাব সমূহকে এবং পয়গম্বরগণকে মেনে নেয়া এবং আল্লাহর কালামে যা কিছু রয়েছে এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সহীহ হাদীস সমূহে যা কিছু রয়েছে এসব কিছু মেনে নেয়া একান্ত কর্তব্য। এর কোন একটি বিষয়কেও অস্বীকার করা যাবে না। আর একথাও মেনে নেয়া একান্ত কর্তব্য যে, আল্লাহ্ পাক তাঁর আরশে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। আলোচ্য আয়াতে রয়েছে একথারই সুস্পষ্ট ঘোষণা।

আবু নাঈম লিখেছেনঃ আমাদের আকিদা ও বিশ্বাস পূর্ব কালের বুজুর্গানে দ্বীনের বিশ্বাসের ন্যায়ই, যা কিছু আল্লাহর কিতাবে এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীস শরীফে রয়েছে এবং যে সব বিষয়ে উম্মতে মোহাম্মদীয়া একমত রয়েছেন সেগুলোর উপর বিশ্বাস রাখা একান্ত কর্তব্য। আর আল্লাহ্ পাক সর্বকালে তাঁর যাবতীয় গুণাবলীতে পরিপূর্ণ। আবু নাঈম অবশেষে একথাও লিখেছেন, যে হাদীস সমূহে আরশে অধিষ্ঠিত হওয়ার উল্লেখ রয়েছে সেগুলো সলফে সালেহীন মানতেন। এবনে আবদুল বার লিখেছেনঃ আল্লাহ্ পাক সাত আসমানের উপর অধিষ্ঠিত রয়েছেন। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত এ মতই পোষণ করেছেন।

খতীব বলেছেনঃ সলফে সালেহীনের মত হলো এই যে, এসব আয়াতের প্রকাশ্য অর্থের উপর বিশ্বাস করাই কর্তব্য। এর প্রকৃত অবস্থা কি বা এর দৃষ্টান্ত কি এসব

অনুসন্ধান অনুচিত। এসব হলো আল্লাহ পাকের গুণাবলী। আর এ গুণাবলী যেমন তাঁর উচ্চ মর্তবা ও শান, তেমনই।

ইমামুল হারামাইন বলেছেনঃ এসব ক্ষেত্রে পূর্বকালের বুজুর্গানে দ্বীনের অনুসরণই শ্রেয় এবং পছন্দনীয়। পূর্ব কালের বুজুর্গগণ আল্লাহ পাকের শানে ব্যবহৃত এসব কথার ব্যাখ্যা থেকে বিরত ছিলেন। এ পর্যায়ে ব্যবহৃত শব্দগুলোর প্রকাশ্য অর্থই তাঁরা গ্রহণ করেছেন, এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহ পাকের নিকট সোপর্দ করেছেন।

আল্লামা বগভী লিখেছেন ঃ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত এ মত পোষণ করেন যে, আরশের উপর আল্লাহ পাকের অধিষ্ঠিত হওয়া আল্লাহ পাকের একটি গুণ, এর প্রকৃত স্বরূপ কি তা আমাদের জানা নেই। তবে এর উপর ঈমান আনয়ন ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য।

ইমাম বয়যাবী (রঃ) লিখেছেনঃ এর অর্থ হলো আরশের উপর আল্লাহ পাকের অধিষ্ঠিত হওয়া এমনই, যেমন তাঁর শান মোতাবেক হয়।

আবু বকর আলী এবনে ঈসা শিবলী যিনি তাঁর যুগের বিখ্যাত সুফী আলেম ছিলেন তিনি বলেনঃ আমাদের প্রতিপালক আসমানে রয়েছেন, তিনি আদেশ প্রদান করেন এবং সিদ্ধান্ত কার্যকর করেন।

শায়খুল ইসলাম আবদুল্লাহ আনসারী লিখেছেনঃ আল্লাহ পাক সপ্তম আসমানে আরশে অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) তাঁর “গুনিয়াতুত তালেবীন” গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যার সারমর্ম হলো এই, পূর্বকালের তত্ত্বজ্ঞানীগণ যা বলেছেন তাই সঠিক। তবে এর স্বরূপ মানুষের অজানা, আর আল্লাহ পাক সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত থেকে পবিত্র।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ পাক অবশ্যই আসমানে রয়েছেন, জমিনে নয়।

আল্লামা যাহাবী (রঃ) তত্ত্বজ্ঞানীদের এ সমস্ত অভিমতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, মোহাদ্দেসীন, ফকীহগণ এবং সুফিয়ায়ে কেরাম এ মতই পোষণ করেন।[১]

জাফর এবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি ইমাম মালেক (রঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে “আল্লাহ পাক আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন”-এ কথাটির স্বরূপ বা তাৎপর্য কি?

ঐ ব্যক্তির এ প্রশ্ন শ্রবণ মাত্র হযরত ইমাম মালেক (রঃ) ঘর্মাক্ত হলেন এবং ভীত সন্ত্রস্ত হলেন এবং প্রায় সংজ্ঞালুপ্ত হওয়ার অবস্থা হলো। যখন চেতনা ফিরে আসলো তখন তিনি বললেন–

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৭৫-৭৮

الكيف غير معقول

আল্লাহ পাকের আরশের-উপর অধিষ্ঠিত হওয়ার স্বরূপ মানুষের বোধ শক্তির উর্ধ্বে। আরশের উপর অধিষ্ঠিত হওয়ার তাৎপর্য মানুষের অজানা, তবে তার উপর ঈমান আনা ওয়াজিব। আর এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বেদ্আত।

আল্লামা সয়ূতী (রঃ) এ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

كان الله ولم يكن معه شيئٌ

(বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে) এক আল্লাহ পাকই ছিলেন, আর কিছুই ছিলনা।

আল্লাহ পাক আরশকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, আরশকে লাল ইয়াকুত দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।[১]

তফসীরকারগণ বলেছেন যে, সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে আরশ সর্বশ্রেষ্ঠ। তার শ্রেষ্ঠত্ব মানুষের জন্যে কল্পনাতীত। কেননা আসমান জমিন আরশের মোকাবেলায় অতি নগণ্য, অতি ক্ষুদ্র। আর আল্লাহ পাক আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন–এর অর্থ এই নয় যে, তিনি তার উপর উপবিষ্ট হয়েছেন, অথবা তাঁর আরশের কোন প্রয়োজন আছে। কেননা তিনি সকল প্রয়োজনের উর্ধ্বে, তিনি স্থান-কালের উর্ধ্বে। স্থান-কালের তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। আরশ হলো সিংহাসন। ঐ সিংহাসন থেকেই আদেশ নিষেধ জারী হয়। আল্লাহ পাক নিজেই এরশাদ করেছেনঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

"তাঁর কোন দৃষ্টান্ত নেই," তাঁর কোন সীমা নেই, তাঁর পবিত্র সত্বার জন্যে কোন দিকও নেই, তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান। সবার উপরে, সকলের উর্ধ্বে তাঁর স্থান। সব কিছুই সৃষ্টি, তিনি একমাত্র স্রষ্টা। তাঁর কোন শরীক নেই, তিনি সকল দৃষ্টান্ত থেকে পবিত্র। তাঁর শান বর্ণনাতীত, তাঁর গুণাবলী কল্পনাতীত। তিনি আহকামুল হাকেমীন, তিনি রব্বুল আলামীন। সারা পৃথিবীর সকল মানুষ সর্বক্ষণ, সর্বত্র তাঁর প্রশংসায় মগ্ন থাকলেও তাঁর প্রশংসার হক্ব আদায় হবে না। তাঁর গুণাবলীর বিবরণ দেয়া কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি, হবেও না।

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ

অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টি জগতের নিয়ম-কানুন শৃংখলা রক্ষা করা, নিয়ন্ত্রণ করা সবই মহান আল্লাহ পাকের হাতে। আল্লাহ পাকের অনুমতি ব্যতীত কারো জন্যে সুপারিশ করার অধিকার বা সাহসও কারো হবে না। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

---

[১]। খোলাসাতুত্যাফাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৬২

مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ

তাঁর অনুমতি ব্যতীত কারো পক্ষে তাঁর মহান দরবারে সুপারিশ করারও ক্ষমতা থাকবে না।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে নজর এবনে হারেস সম্পর্কে। সে বলেছিল কেয়ামতের দিন তার জন্যে লাত এবং ওজ্জা নামক মূর্তি সুপারিশ করবে। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের কঠিন দিনে কারো পক্ষেই আল্লাহ পাকের অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করা সম্ভব হবেনা। তফসীরকারগণ বলেছেন, এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, কেয়ামতের দিন শাফাআত বা সুপারিশ করা হবে। তবে আল্লাহ পাকের অনুমতির পরই হবে। আর যাকে অনুমতি দেয়া হবে তিনি সুপারিশ করবেন, অন্য কেউ নয়।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ

তিনিই আল্লাহ পাক, তিনিই তোমাদের উপাস্য, رَبُّكُمْ তিনিই তোমাদের পালনকর্তা, তিনি ব্যতীত আর কেউ তোমাদের পালনকর্তা নেই, আর তাঁর কোন শরীকও নেই।

فَاعْبُدُوْهُ

অতএব, তোমরা শুধু তাঁরই বন্দেগী কর। اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ তোমরা কি এতটুকু ভেবে দেখনা যে, মহান আল্লাহ পাকের অবাধ্য হলে, তাঁর রসূলকে অস্বীকার করলে, তার পরিণাম কত ভয়াবহ হবে?

اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ اِنَّهٗ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ
لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ؕ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّ عَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿۴﴾ هُوَ
الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّ الْقَمَرَ نُوْرًا وَّ قَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ
السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ
لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿۵﴾ اِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ﴿۶﴾

তরজমা

(৪) তাঁরই নিকট তোমাদের সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আল্লাহ পাকের প্রতিশ্রুতি সত্য। সৃষ্টি মাত্রকে নিশ্চয় তিনিই সর্বপ্রথম অস্তিত্ব দান করেন, এরপর তিনিই তাদের পুনরাবর্তন ঘটান, যেন যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে তাদেরকে ন্যায় বিচারের সঙ্গে কর্মফল প্রদান করেন, আর যারা কাফের তাদের জন্যে রয়েছে ফুটন্ত পানীয়, আর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি কেননা, তারা কুফরী করতো।

(৫) আর তিনিইতো (আল্লাহ পাক) যিনি সূর্যকে আলোক এবং চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন। আর চন্দ্রের জন্যে মনজিল নিদৃষ্ট করে দিয়েছেন যাতে করে তোমরা বর্ষ গণনা এবং হিসাব জানতে পার। আল্লাহ পাক এসব কিছু নিরর্থক সৃষ্টি করেননি, যাদের বিচার বুদ্ধি আছে তাদের জন্যেই তিনি নিদর্শন সমূহ বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করে থাকেন।

(৬) নিশ্চয় দিবা রাত্রির পরিবর্তনে এবং আল্লাহ পাক আসমান জমিনে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্যে, যারা আল্লাহকে ভয় করে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আসমান জমিনের সৃষ্টির কথা এবং আল্লাহ পাকের একত্ববাদ বা তৌহিদের কথা ছিল। আর আলোচ্য আয়াতে আখেরাত বা পরকালের কথা বর্ণিত হয়েছে। কথাটিকে এভাবেও বলা যেতে পারে, পূর্ববর্তী আয়াতে ইহকালের কথা এবং স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের তৌহিদের কথা রয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে পরকালের কথা বর্ণিত হয়েছে।

এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ অবশেষে তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, এ জীবনে মানুষের কর্ম যেমন হবে পরজীবনে তেমনি হবে তার ফল।

আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওাসাল্লামের প্রতি ঈমান ও নেক আমলের শুভ পরিণতি যেমন সুনিশ্চিত, ঠিক তেমনি কুফর ও নাফরমানীর ভয়াবহ পরিণামও অবধারিত।

যেভাবে নীড় ছাড়া পাখী সারা দিন আকাশে ঘোরা ফেরা করে দিনের শেষে গোধূলী লগ্নে ফিরে যায় তার আপন নীড়ে, ঠিক সেভাবে বেহেশত থেকে বের হওয়া মানুষ পৃথিবীতে তার জন্যে নিদৃষ্ট সময় কাল পর্যন্ত বিচরণ করে, নানা কাজের ব্যস্ততায় তার জীবন অতিবাহিত হয়, পরে কর্মময় জীবন থেকে সে অবসর গ্রহণ করে। তার শ্রবণ শক্তি, দর্শন শক্তি, স্মরণ শক্তি এক কথায় যাবতীয় শক্তি ধীরে ধীরে কমতে থাকে। সে তার স্বাস্থ্য সৌন্দর্য হারাতে থাকে। অবশেষে এক সময় মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধান তার ব্যাপারে কার্যকর হয়। সে এই ছায়া মায়া ঘেরা পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করে। এ

পৃথিবী যেমনটি ছিল তেমনটিই থাকে কিন্তু সে আর থাকেনা। তার বাড়ী-ঘর থাকে। কিন্তু সে আর ফিরে আসেনা। এ জীবনের সকল সত্য যেন মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

তার আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব এক কথার সকল আপনজন কেউ আর আপন থাকে না, কেউ তার সঙ্গে যায় না, বরং সকলেই তাকে বিদায় দিয়ে আসে, তাকে সমাধিস্থ করার মাধ্যমে।

এ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যার মর্ম হলো– এ জীবনে মানুষের তিনটি সাথী একটি সাথী মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বিদায় নেয়। দ্বিতীয় সাথী কবর পর্যন্ত তার সাথী হয়, আর তৃতীয় সাথী তার চিরসাথী হয়।

প্রথম সাথী হলো মানুষের অর্থ সম্পদ যা তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিদায় গ্রহণ করে, তার অর্থ সম্পদের মালিক হয় উত্তরাধিকারীগণ।

দ্বিতীয় সাথী হলো মানুষের আত্মীয়-স্বজন, যারা তার সাথী হয়ে কবর পর্যন্ত যায়, এরপর ফিরে আসে।

তৃতীয় সাথী হলো মানুষের সারা জীবনের আমল বা কৃতকর্ম।

যদি আমল ভাল হয় তবে সে ভাল সাথী পায়। যদি আমল মন্দ হয় তবে তার চিরসাথী মন্দ হয়। এভাবেই মানুষের এ জীবনের অবসান হয় কিন্তু কথা এখানেই শেষ নয়, একথা আরো আছে অনেক বাকী। কবরের জীবন যাকে "আলমে বরজখ" বলা হয় তাকে আমরা মধ্যলোক বলতে পারি। এখানেও মানুষকে বহু দিন অতিবাহিত করতে হয়। যদি ভাল সাথী সঙ্গে এসে থাকে তবে ভাল, আর যদি মন্দ সাথী সঙ্গে আসে তবে অতি কষ্টে এ সময় অতিবাহিত হয় (হাদীস শরীফে মধ্যলোকের বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে)।

এরপর যখন এ পৃথিবীর সময় শেষ হবে, কেয়ামত কায়েম হওয়া আল্লাহ্ পাকের মর্জি হবে তখন প্রত্যেকটি মানুষকে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির করা হবে। প্রতিটি মানুষকে সেদিন ফিরে যেতে হবে বিশ্ব স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে। যাঁর আদেশক্রমে এ ক্ষণস্থায়ী জগতে মানুষের আগমন হয়েছিল তাঁরই নিকট মানুষকে গমন করতে হবে, একথাই ঘোষণা করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

(তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে আল্লাহ্ পাকের নিকট)

পুনঃজীবন দেয়া হবে এবং আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে একত্রিত করা হবে যেন প্রতিটি মানুষের কৃতকর্মের হিসাব নিকাশ হয়। ভাল কাজের শুভ পরিণতি বা সওয়াব প্রদান করা হয় এবং মন্দ ও ঘৃণ্য কাজের শাস্তি দেয়া হয়।

আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের আহ্বান

কোরআনে করীম আখেরাতের তথা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছে বহু আয়াতে। সূরা বাকারার শুরুতে মোমেনদের বিবরণ দিয়ে এরশাদ হয়েছেঃ

وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ

"আর যারা আখেরাতের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখে"– অর্থাৎ এ জীবন যেমন সত্য পরজীবনও তেমনই সত্য। পার্থক্য শুধু এতটুকু, এ জীবনে কর্ম, পরজীবনে ফল। যারা এ জীবনে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, আল্লাহর কোরআনে বর্ণিত বিধি-নিষেধ মেনে চলে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের অনুসরণ করে, আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে সম্বল সংগ্রহ করে, তারা আখেরাতে চিরসুখী হবে। পক্ষান্তরে, যারা এ জীবনে আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হবে, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা অমান্য করবে, তারা চির দুঃখী হবে এটিই আল্লাহ পাকের অমোঘ বিধান। কোরআনে করীমে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনয়নের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং বিভিন্নভাবে বিষয়টিকে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে–

اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا

"তোমাদের সকলকে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ফিরে যেতে হবে"।

আর অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ.

"সেদিনকে ভয় কর যেদিন তোমরা আল্লাহ পাকের নিকট ফিরে যাবে, সেদিন প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল দেয়া হবে পরিপূর্ণভাবে, আর তাদের প্রতি কোন প্রকার জুলুম করা হবে না"। অন্য আয়াতে কথাটি এভাবে এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ. (সূরা জুমআ)

(হে রসূল!) আপনি বলুন, নিশ্চয় যে মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়নপর রয়েছ, তা তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করবে, এরপর তোমরা ফিরে যাবে আল্লাহ পাকের দরবারে যিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে ওয়াকেফহাল। এরপর তিনিই তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত করবেন। যেহেতু প্রত্যেকটি মানুষকে আল্লাহ পাকের দরবারে ফিরে যেতে হবে তাই প্রত্যেককেই তার ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত, আর আল্লাহর নাফরমানীর ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক হওয়া উচিত।

মানুষকে একত্রিত করার কথা আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছেন, আর তাঁর ওয়াদা সত্য, প্রতিটি মানুষকে অবশ্যই হাযির করা হবে, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই এবং এর ব্যতিক্রম হওয়ারও কোন সম্ভাবনা নেই।

إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ

তিনিই সৃষ্টিকে প্রথম অস্তিত্ব দান করেছেন তথা তিনিই প্রথমবার তোমাদেরকে তৈরী করেছেন। আর দ্বিতীয়বারও তিনিই তৈরী করবেন। দুনিয়ার এ জীবন তিনিই দান করেছেন। মৃত্যুর পর পুনরায় তিনিই জীবন দান করবেন এবং হাশরের ময়দানে হাযির করবেন, যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ. (সূরা বাকারা)

"তোমরা কিভাবে আল্লাহ পাকের নাফরমান হও? অথচ তোমাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না। আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, এরপর তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যু মুখে পতিত করবেন, এরপর তিনিই তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন। অবশেষে তোমাদেরকে তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে"।

মৃত্যুর পর পুনর্জীবন

যেহেতু কাফেররা এ বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করতো যে, মৃত্যুর পর পুনরায় কীভাবে পুনঃ জীবন লাভ হবে? তাই পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক বিষয়টিকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন, যেমন সূরায়ে ইয়াসীনে এরশাদ হয়েছে–

قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, তাদেরকে তিনিই জীবিত করবেন যিনি সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন"। আরো এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى

"তিনি কি এমন শক্তিশালী নন যে, মৃতকে জীবিত করতে পারেন"?

আরো এরশাদ হয়েছেঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

"আর তা এজন্যে যে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক, তিনিই হক্ব, আর নিশ্চয় তিনিই মৃতকে জীবিত করবেন, আর নিশ্চয় তিনিই সর্ব বিষয়ে শক্তিমান"।

আরো এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ

"নিশ্চয় কেয়ামত অবশ্যই আসবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই আর নিশ্চয় আল্লাহ পাক কেয়ামতের ময়দানে হাযির করবেন কবরবাসীদেরকে"।

যাহোক, এভাবে পবিত্র কোরআনে বারে বারে কেয়ামতের দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগী সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে যেন নেককারদের পুরস্কার এবং বদকারদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়, তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ

"যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং পবিত্র কোরআনের প্রতি ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, ন্যায়সঙ্গত ভাবে আল্লাহ পাক যেন তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করেন"।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ

"আর যারা কাফের, অবাধ্য তাদের জন্যে ফুটন্ত পানীয় এবং কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে, তাদের কুফরী এবং নাফরমানীর কারণে"।

এ আয়াতে হাশরের ময়দানে মানব জাতিকে হাযির করার উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। দুনিয়ার এ জীবনে যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদেরকে পুরস্কৃত করা এবং কাফের মুশরেকদেরকে কঠোর কঠিন শাস্তি দেয়াই হলো এর মূল উদ্দেশ্য।

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً

"তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি সূর্যকে আলোক এবং চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন"।

আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরত ও অসীম নেয়ামতের বিবরণ

পূর্ববর্তী আয়াতে তৌহিদের বিবরণ ছিল। এ আয়াতে তৌহিদের দলিল হিসেবে আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরত হেকমত এবং অনন্ত অসীম নেয়ামতের উল্লেখ রয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে আসমান জমিনের কথা বর্ণিত হয়েছিল। এ আয়াতে এমনি আরো এমন বিষয়ের আলোচনা রয়েছে যা সৃষ্টির দিক থেকে শুধু বিস্ময়করই নয়; বরং মানব জাতির জন্যে এতে রয়েছে অনেক নেয়ামত। এরশাদ হয়েছেঃ তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি সূর্যকে দান করেছেন আলোক এবং চন্দ্রকে করেছেন জ্যোতির্ময়। তিনি সূর্যকে আলোকময় করেছেন এবং চন্দ্রকে করেছেন জ্যোৎস্নাময়। সূর্যকে আলো দান করা চন্দ্রকে নূর দান করা সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকেরই কাজ, আর কারো নয়। অতএব, বন্দেগী শুধু আল্লাহরই করতে হবে, আর কারো নয়। যারা সূর্য বা চন্দ্রের পূজা করে তাদের জানা উচিত যে, চন্দ্র সূর্যের কোন শক্তি নেই। যদি আল্লাহ পাক তাদের আলো ছিনিয়ে নেন, কেউ এই বিশাল বিশ্বকে আলোকময় করতে পারবে না। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ؕ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ. قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ. (সূরা কাসাস, আয়াত ৭১-৭২)

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ? আল্লাহ পাক যদি রাত্রিকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন তবে আল্লাহ পাক ব্যতীত এমন কোন উপাস্য আছে যে তোমাদেরকে কোন আলো এনে দিতে পারে? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করবে না"? (হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ? আল্লাহ পাক যদি দিনকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ পাক ব্যতীত এমন কোন উপাস্য আছে যে তোমাদের জন্যে কোন রাত নিয়ে আসবে যাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পারবে? তবুও কি তোমরা লক্ষ্য করবে না"?

এর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন–

وَ مِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ. (সূরা কাসাস, আয়াত-৭৩)

"আল্লাহ পাকই তাঁর দয়ায় তোমাদের জন্যে রাত ও দিনের ব্যবস্থা করেছেন, যেন তাতে (রাত্রে) তোমরা বিশ্রাম করতে পার এবং (দিনে) তাঁর দান অন্বেষণ করতে পার এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর"।

এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য, কোন কোন তফসীরকারের মতে, (জিয়া) ضيا বলা হয় অতি উজ্জ্বল আলোকে, এজন্যে এ শব্দটি সূর্যের জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে, যার আলো নিজস্ব তা "জিয়া" আর যার নিজস্ব নয়; বরং অন্যের কাছ থেকে গৃহিত সে আলোর নাম নূর।

আধুনিক কালের বিজ্ঞানীগণ বলেছেনঃ চন্দ্রের আলো তার নিজস্ব নয়; বরং সূর্য থেকে ধার করা। কিন্তু ১৪শ' বছর পূর্বে কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক সূর্যের জন্যে যে শব্দ ব্যবহার করেছেন তা একথারই ইঙ্গিতবাহী।[১]

وَالْقَمَرَ نُوْرًا وَّ قَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ

(আর যেন তোমরা বর্ষ গননা এবং হিসাব জানাতে পার এজন্যে আল্লাহ পাক চন্দ্রের মনজিল নির্ধারণ করে দিয়েছেন) বৈজ্ঞানিকগণ চন্দ্রের জন্যে ২৮টি মনজিল নিদৃষ্ট

[১]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৩২

করেছেন। মানব জাতির কল্যাণার্থেই চন্দ্র সূর্যের সৃষ্টি এবং পরিভ্রমণ। মানুষ যেন চন্দ্র সূর্যের পরিক্রমার মাধ্যমে মাস বছর গননা করতে পারে, চন্দ্র-সূর্য ব্যতীত যেভাবে চাঁন্দ্র মাস ও সৌর মাস নিরুপণ করা সম্ভব হয়না, ঠিক তেমনি জীবন-সাধনার সার্থকতা এবং সাফল্যও আল্লাহ্ পাক ও তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান ও আনুগত্য ব্যতীত সম্ভব নয়।

মূলতঃ চন্দ্র সূর্য যেমন আল্লাহ্ পাকের কুদরতের এক জীবন্ত নিদর্শন, ঠিক তেমনি আল্লাহ্ পাকের অদ্বিতীয় নেয়ামতও। আর এ নেয়ামতের জন্যে আল্লাহ্ পাকের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্তব্য।

مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ

আল্লাহ্ পাক এ বিস্ময়কর বস্তু সমূহ অহেতুক সৃষ্টি করেননি; বরং এর মহান উদ্দেশ্য রয়েছে। বিশাল সৃষ্টির প্রতিটি অণু পরমাণুকে আল্লাহ্ পাক আশরাফুল মাখলুকাত মানব জাতির উপকারার্থেই সৃষ্টি করেছেন। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

তিনিই আল্লাহ্ পাক, "যিনি তোমাদের উপকারার্থেই সৃষ্টি করেছেন বিশাল বিস্তৃত পৃথিবীর সব কিছু" আর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর বন্দেগীর জন্যে। তাঁর মারেফাত হাসিল করার জন্যে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

"আর আমি মানব ও জ্বীন জাতিকে শুধু আমার বন্দেগীর জন্যেই সৃষ্টি করেছি"। অতএব, এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বের বুকে মানব জাতি হলো আল্লাহ্ পাকের প্রতিনিধি। মানুষের প্রয়োজনের আয়োজনে মহান স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন সারা বিশ্বের সব কিছু। মানুষ তার জীবনে আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত সমূহ ভোগ করে থাকে। অতএব, মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো আল্লাহ্ পাকের বন্দেগী করা, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তাঁর বিস্ময়কর কুদরতের অপূর্ব নিদর্শন সমূহে চিন্তা ও গবেষণা করা। মোরাকেবা, মোশাহেদা করা এবং তাঁর বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ করা। কেননা, বিশ্ব সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুতেই আল্লাহ্ পাকের কুদরত হেকমতের অগণিত জীবন্ত নিদর্শন রয়েছে।

বিশাল বিস্তৃত সৃষ্টির শৃংখলা, নিয়ম-নীতির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আল্লাহ্ পাকের তৌহিদ বা একত্ববাদের অসংখ্য দলিল প্রমাণ লক্ষ্য করা যায়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ.

যাদের জ্ঞান আছে, যাদের বিচার বুদ্ধি আছে এমন সম্প্রদায়ের জন্যেই আল্লাহ্ পাক তাঁর নিদর্শন সমূহ বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করে থাকেন। পক্ষান্তরে, যারা নির্বোধ তারা আল্লাহ্ পাকের কুদরতের এসব নিদর্শন দেখে এবং তাঁর অগণিত নেয়ামত অহরহ ভোগ করেও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা।

ইমাম রাজী (রঃ) এ পর্যায়ে লিখেছেন, আল্লাহ পাক মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে বিবেক বুদ্ধি দান করেছেন, তাকে এমন শক্তি দান করেছেন যা দ্বারা সে ভাল এবং মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে, হক্ব ও বাতিল বা সত্য অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারে।

অতএব বাস্তববাদী, কল্যাণকামী, পরিণামদর্শী মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের কুদরত ও নেয়ামত সমূহ লক্ষ্য করে তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর অনুসরণ করা।

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ

"নিশ্চয় রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ পাক আসমান জমিনে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাতে বহু নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্যে, যারা আল্লাহ পাককে ভয় করে"। এ নিদর্শন সমূহ হলো আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের, তাঁর তৌহিদ বা একত্ববাদের, তিনি যে সর্বশক্তিমান এবং সর্ব প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে তাঁর পবিত্র হওয়ার এসব নিদর্শন সমূহ সকলের জন্যেই উন্মুক্ত। কিন্তু এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে শুধু সে সব লোক যারা তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করে।

যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে, যাদের অন্তরে এই ভয় থাকে যে, অবশেষে আমাকে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হতে হবে, আমার জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পর্কে আমাকে জবাবদেহী করতে হবে। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি আমাকে লালন-পালন করছেন, যাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামত আমি অহরহ ভোগ করি, তাঁর নিকটই আমাকে হাযির হতে হবে। তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারলে আমার জীবন সার্থক হবে। পক্ষান্তরে তাঁর অসন্তুষ্টি শুধু যে জীবনের ব্যর্থতার কারণ হবে তাই নয়, বরং কঠোর কঠিন শাস্তিও ভোগ করতে হবে। অবশেষে একদিন এ জীবনের অবসান ঘটবে, এ সুন্দর পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। যেভাবে দিন বিদায় নেয়, রাত আসে এবং রাতের বিদায়ের পর দিন আসে তেমনি এখানকার কোন কিছুই স্থায়ী নয়, অতএব মানব জীবনও স্থায়ী নয়, যাদের অন্তরে এই ভয় জাগ্রত থাকে তারাই দিন ও রাতের পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য করে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে সম্বল সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করে।

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُونَ ﴿٧﴾ أُولٰٓئِكَ مَأْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ
بِإِيمٰنِهِمْ ۚ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهٰرُ فِي جَنّٰتِ النَّعِيمِ ﴿٩﴾
دَعْوٰىهُمْ فِيهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ
أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿١٠﴾

তরজমা

(৭) নিশ্চয় যারা আমার মোলাকাতের আশা পোষণ করেনা; পার্থিব জীবন নিয়েই হয় পরিতৃপ্ত এবং তাতেই থাকে নিশ্চিন্ত, আর যারা আমার আয়াত সমূহ থেকে গাফেল থাকে।

(৮) তাদের ঠিকানাই হবে দোযখ; তাদের কৃতকর্মের কারণে।

(৯) নিশ্চয় যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের প্রতিপালক তাদের ঈমানের কারণেই তাদেরকে সুখের স্বর্গোদ্যানের পথ-নির্দেশ দান করবেন, যাদের তলদেশে নির্ঝর-মালা প্রবাহিত থাকবে।

(১০) সেখানে তাদের দোয়া হবে এই- হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, মহিমাময়, সেখানে তাদের অভিবাদন হবে সালাম। তাদের দোয়ার শেষ কথা হবে আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (প্রশংসা মাত্রই বিশ্ব প্রতিপালকের জন্যে)।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে দুনিয়া এবং আখেরাতের, সৃষ্টি ও লয়ের এবং আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরত ও অগণিত নেয়ামতের উল্লেখ ছিল। আর এ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে দু' দল লোকের (১) যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস করেনা এবং আসমানী হেদায়েত মোতাবেক জীবন-যাপন করেনা (২) আর যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁর বিধি-নিষেধ মেনে চলে তাদের কথা।

যারা আখেরাতকে অবিশ্বাস করে, কেয়ামতের কঠিন দিনের কথাকে অস্বীকার করে এবং দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবন নিয়েই মুগ্ধ-মত্ত-মাতোয়ারা থাকে, তাদের ভয়াবহ পরিণামের কথা বিশেষভাবে ঘোষণা করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

বেঈমানদের চারটি বৈশিষ্ট্য

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনেনা, আলোচ্য আয়াতে তাদের চারটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছেঃ

(এক)

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا

"যারা আল্লাহ পাকের মোলাকাতের আকাঙ্খা রাখেনা" -এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল যারা কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিতিকে ভয় করেনা, মোকাতেল (রঃ) এবং কালবী (রঃ)-ও এ ব্যাখ্যাই করেছেন। তারা এ ব্যাখ্যার দলিল হিসেবে পবিত্র কোরআনের অন্য একখানি আয়াত পেশ করেছেন–

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰهَا

"(হে রসূল!) আপনি শুধু তাদেরই ভয় প্রদর্শনকারী যারা কেয়ামতের দিন হাযিরীকে ভয় করে"। আর একথার তাৎপর্য হল যারা আল্লাহ পাকের প্রতি, তাঁর রসূলের প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করেনা তারা আখেরাতের কঠিন শাস্তিকেও ভয় করেনা এবং আল্লাহ পাকের দরবারে হাযিরীর আশাও করেনা কেননা, আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান থাকলে তার ফলশ্রুতি স্বরূপ আল্লাহর গজবের ভয় মানব মনে সৃষ্টি হয়। কিন্তু ঈমান না থাকলে যেমন রহমতের আশা করা হয় না, তেমনি আযাবের ভয়ও থাকেনা।

(দুই)

وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

অর্থাৎ তারা আখেরাতের সাফল্যের উপর দুনিয়ার এ জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে প্রাধান্য দিয়েছে। ফলে এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের লোভ-লাভ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে তারা ব্যস্ত এবং সন্তুষ্ট হয়েছে। আখেরাতের কথা চিন্তা করারও তাদের কোন অবসর নেই। গোমরাহী এবং পথভ্রষ্টতার এটি দ্বিতীয় স্তর। যখন মানুষ দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের সাফল্যকে সবকিছু মনে করে এবং আখেরাতের ব্যাপারে অমনোযোগী থাকে তখন দুনিয়ার এ জীবনের সাফল্যের লক্ষ্যেই হয় তার সকল সাধনা।

(তিন)

وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا

অর্থাৎ শুধু যে তারা দুনিয়ার লোভ-লাভ নিয়ে ব্যস্ত থাকে তাই নয়; বরং দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে তারা এত মুগ্ধ হয় যে, আখেরাতের ব্যাপারে তাদের কোন চিন্তাও থাকেনা। দুনিয়ার সম্পদ, সমৃদ্ধি, ক্ষমতা পেয়ে তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ে। আখেরাতের নেয়ামত লাভের কোন আকাঙ্খা তাদের মধ্যে থাকেনা, পরকালীন জিন্দেগীর পরিণাম সম্পর্কে থাকে তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। এখানকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে তারা নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলে। এজন্যে মরমী কবি বলেছেনঃ

کھو نہ جا اس سحر و شام میں اے صاحب ہوش = ایک جہان اور بھی ہے جس میں نہ فردا ہے نہ دوش

"এই সকাল-সন্ধ্যায় হারিয়ে যেয়ো না হে বুদ্ধিমান! এমন এক জগৎও রয়েছে যেখানে আগামীকালও নেই গতকালও নেই"।

خودی کی یہ ہے منزل اولین = مسافر یہ ترا نشیمن نہیں

"এ জগৎ হলো তোমার সফরের প্রথম মনজিল। হে মুসাফির! এটি তোমার চির আবাস-স্থল নয়"।

কিন্তু যারা এ ক্ষণস্থায়ী জগৎকে চির আবাস-স্থল মনে করে ফেলে, এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনের সুখ-সামগ্রী বৃদ্ধি করাকেই জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করে তারা আখেরাত বা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগী সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়ে। দুনিয়ার সম্পদ ও শক্তি পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ে।

মোমেনের বৈশিষ্ট্য

আর প্রকৃত মোমেনের বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহর জিকরের মাধ্যমেই মোমেনের মন শান্তি লাভ করে। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"মনে রেখো! আল্লাহর জিকরের মাধ্যমেই অন্তর সমূহ নিশ্চিন্ত হয়"। এটি নেককারদের বৈশিষ্ট্য। আর বদকারদের বৈশিষ্ট্য হলো এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের সম্পদ লাভের মাধ্যমে তারা নিশ্চিন্ত হয়।

(চার)

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ

এ পর্যায়ে চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো যারা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, যারা আল্লাহ পাকের মোলাকাতের আকাঙ্খা করে না, যারা দুনিয়ার জীবন নিয়ে মুগ্ধ মত্ত থাকে, তারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত হয়। আর দুনিয়ার ভোগ বিলাসে তারা এত বেশী নিমগ্ন হয় যে, নিখিল বিশ্বে আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরতের মহিমা দেখেও দেখেনা, বুঝেও বোঝেনা। তাদের জ্ঞান-চক্ষু বন্ধ হয়ে যায়, মনের কপাট রুদ্ধ হয়ে যায়। এমনকি কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝড়-তুফান, বন্যা, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ বা এমনি কোন হঠাৎ আপতিত বালা-মুসিবত দেখেও তারা সতর্ক হয়না। তন্দ্রাহত অবস্থাতেই তাদের জীবন অতিবাহিত হয়। ক্ষণিকের জন্যেও তাদের মনে আখেরাতের চিন্তার উদ্রেক হয়না।

অবশেষে তাদেরকে চিরকালের জন্যে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে– একথা একবারও তারা মনে করেনা। এ জীবনের ভোগ বিলাসে এভাবে তারা ডুবে থাকে, লোভে মোহে এভাবে অন্ধ হয়ে যায় যে, জীবনের বাস্তব সত্যের প্রতি ক্ষণিকের জন্যেও দৃষ্টিপাত করে না। আর একথাও মনে করেনা যিনি ইতিপূর্বে সৃষ্টি করেছেন তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন। এ গাফলতের কারণেই তাদের পরিণাম হয় ভয়াবহ। দোযখের অগ্নিকুন্ডই হবে তাদের অনিবার্য আবাস-স্থল। তাই এরশাদ হয়েছে–

أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"এরাই সে সব লোক যাদের আবাস-স্থল হলো দোযখ তাদের কৃতকর্মের তথা তাদের কুফরী ও নাফরমানীর কারণে"।[১]

---

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৩৮-৩৯

আয়াতের মর্মবাণী

তফসীরকারগণ এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ পাকের সাথে মোলাকাতের আকাঙ্খা না করার তাৎপর্য হলো কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হওয়ার কথা বিশ্বাস না করা।

অর্থাৎ যারা একথা বিশ্বাস করেনা যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হতে হবে এবং জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব দিতে হবে, তারা পার্থিব জীবনের সুখ-সামগ্রীর অন্বেষণেই ব্যস্ত মুগ্ধ থাকে এবং আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেনা। পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সাফল্যের জন্যে কোন প্রস্তুতিও গ্রহণ করেনা। এক কথায় দুনিয়ার মায়ায় আত্মবিস্মৃত হয়ে থাকে। তাদের উদ্দেশ্যেই আলোচ্য আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি–

তিনি এরশাদ করেছেনঃ

مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ الْمَعَادِ كَفَاهُ اللّٰهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُوْمُ أَحْوَالَ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ فِىْ أَيِّ وَادٍ هَلَكَ

(এবনে মাজা)

"যে তার সমস্ত চিন্তাকে আখেরাতের চিন্তায় পরিণত করে (অর্থাৎ আখেরাতের চিন্তায় মশগুল হয়), আল্লাহ পাক তার দুনিয়ার জীবনের সমস্যার সমাধান করে দেন। আর যে দুনিয়ার চিন্তায় পার্থিব জীবনের উন্নতির আকাঙ্খায় সম্পূর্ণ মগ্ন থাকে, আল্লাহ পাক তার ব্যাপারে পরোয়া করেন না যে, সে কোন অরণ্যে ধ্বংস হয়"।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه اوعالما او متعلما

"দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ পাকের রহমত থেকে দূরে। কিন্তু আল্লাহর জিকর এবং যে আল্লাহ পাকের সঙ্গে মহব্বত রাখে অথবা আলেম বা তালেবে এলম, তারা আল্লাহ পাকের রহমত থেকে দূরে নয়"। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এশাদ করেছেনঃ

الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر

"দুনিয়া মোমেনের জন্যে কারাগার এবং কাফেরের জন্যে জান্নাত"।

তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৩৩
তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-১৭০

এর কারণ এই যে, দুনিয়াতে যাবতীয় সুখ-সামগ্রী থাকলেও মোমেনের মন এখানে শান্তি পায় না। মোমেন শান্তি পায় শুধু আল্লাহর স্মরণে। আর কাফেরের জন্যে এটি জান্নাত কেননা, কাফেরের সকল সুখ-শান্তি এখানেই, আখেরাতে তাদের শাস্তিই শান্তি।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

فَوَ اللّٰهِ لَا الْفَقْرَ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ وَلٰكِنْ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ اَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا اَهْلَكَتْهُمْ.

"আল্লাহর শপথ! আমার এই ভয় নেই যে, তোমরা অভাবগ্রস্ত হবে; বরং আমার ভয় হচ্ছে এই যে, তোমাদের নিকট দুনিয়ার সম্পদ বৃদ্ধি পাবে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরও তা হয়েছিল। যেভাবে তারা দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তোমরাও সেভাবেই আকৃষ্ট হবে। যেভাবে তাদেরকে দুনিয়ার লোভ ধ্বংস করেছিল তোমরাও সেভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে"।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا

"নিশ্চয় যারা আমার মোলাকাতের আকাঙ্খা করেনা"-এর দ্বারা ইহুদী ও নাসারাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, তারা আল্লাহ পাকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো, আখেরাতের প্রতিও তাদের বিশ্বাস ছিল কিন্তু তারা আখেরাতের উপর দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিত। আখেরাতের সওয়াবের ব্যাপারে তারা ছিল নিরাশ। তাদের জীবনের সকল সাধনার উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ার আনন্দ উল্লাস, আরাম আয়াশ।

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ

"এবং যারা আমার আয়াত সমূহ সম্পর্কে গাফেল"-এর দ্বারা কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করতো না, হাশর বা কেয়ামতের প্রতিও তাদের বিশ্বাস ছিল না।

আল্লামা বয়যাবী (রঃ) লিখেছেনঃ "যারা আমার মোলাকাতের আকাঙ্খা রাখেনা"-এ কথা দ্বারা তাদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা কেয়ামতের দিনকে অস্বীকার করে। যারা আখেরাতের ব্যাপারে কোন আশাই করেনা, যারা শুধু এ পার্থিব জীবনেই বিশ্বাস করে।

"আর যারা আমার আয়াত সমূহের ব্যাপারে উদাসীন"–একথা দ্বারা তাদেরকে বোঝানো হয়েছে যাদের অত্যধিক দুনিয়া প্রীতির কারণে তারা আখেরাতের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়েছে।

---

[১]। খোলাসাতুত্তাফাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩১১

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, উভয় আয়াতেই কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে لا يرجون শব্দটি "রেজা" থেকে নিষ্পন্ন। আর এর দু'টি অর্থ হতে পারে–ভয় এবং লোভ। এ প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হবে নিশ্চয় যাদের অন্তরে আমার আযাবের ভয় নেই এবং আমার পক্ষ থেকে সওয়াব লাভের আশাও নেই, তাই তারা আমার সম্মুখে হাযির হওয়ার আকাঙ্খাও করেনা এবং সওয়াব লাভের আশাও করে না।

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ

"আর যারা আমার নিদর্শন সমূহের ব্যাপারে উদাসীন"।

আলোচ্য আয়াতের "আয়াত" বা নিদর্শন কি? এর ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ নিদর্শন হলো হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শ এবং পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা। এ সম্পর্কে যারা উদাসীন তাদের ঠিকানা হলো দোযখ।[১]

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের প্রতিপালক তাদের ঈমানের কারণেই তাদেরকে জান্নাতের পথ-নির্দেশ করবেন"।

ঈমানদারদের জন্যে খোশখবরী

যারা ঈমানদার, নেককার, ভাগ্যবান তাদের জন্যে আলোচ্য আয়াতে সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে তাদের ঈমান আনয়নের কারণে আল্লাহ পাক তাদের জন্যে পুলসিরাত পার হওয়া সহজ করে দেবেন। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহেদ (রঃ) বলেছেনঃ পুলসিরাতের উপর আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাদের সঙ্গে একটি নূর থাকবে যার সাহায্যে তারা পথ অতিক্রম করবে এবং জান্নাতে পৌছবে।

এবনে জরীর (রঃ) বলেছেনঃ ঈমানদারদের নেক আমল সমূহ একটি আকৃতি ধারণ করবে এবং তাতে অত্যন্ত সুগন্ধময় বাতাস থাকবে। যখন মোমেন কবর থেকে উঠবে তখন তার নেক আমল সমূহ মোমেন ব্যক্তির অগ্রগামী হিসাবে চলতে থাকবে। ঐ নেককার ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করবে তুমি কে? সে বলবে আমি তোমার নেক আমল সমূহ। এরপর তা নূর হয়ে অগ্রসর হতে থাকবে এবং তাকে জান্নাত পর্যন্ত পৌছে দেবে। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৮১-৮২

(তাদের প্রতিপালক তাদের ঈমানের কারণে তাদেরকে জান্নাতের পথ প্রদর্শন করবেন) পক্ষান্তরে, যারা বেঈমান ও বদকার হবে তাদের মন্দ কার্যকলাপ অত্যন্ত কুৎসিত আকৃতি ধারণ করবে এবং দুর্গন্ধময় হবে যা তাদের কবর থেকে উত্থিত হওয়ার পর থেকে তাদের সঙ্গী হবে এবং তাদেরকে দোযখে পৌঁছে দেবে।[১]

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, "আল্লাহ্ পাক ঈমানদারকে হেদায়েত করবেন"–একথার তাৎপর্য হলো তাদের ঈমানের কারণে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে দ্বীন ইসলামের মাহাত্ম উপলব্ধি করার তওফিক দান করবেন।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি তার জানা বিষয়ের উপর আমল করে আল্লাহ্ পাক তাকে তার অজানা বিষয়ের এলম দান করবেন। আর কোন কোন তফসীরকার يَهْدِيهِمْ শব্দটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ্ পাক নেককারদের আমলের সওয়াব তথা উত্তম বিনিময় দান করবেন। অথবা এর অর্থ হলো আল্লাহ্ পাক তাদেরকে জান্নাতে তাদের মনজিলে মকসুদে পৌঁছে দেবেন।

تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ

অর্থাৎ যারা ঈমানদার এবং নেককার, যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনার পর তাঁর বিধি-নিষেধ মোতাবেক জীবন-যাপন করেছে তথা নেক আমল করেছে এবং আখেরাতের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে, আল্লাহ্ পাক তাদের ঈমানের কারণে তাদেরকে জান্নাতে পৌঁছাবেন যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত হবে, তারা মনের সুখে বেহেশতে বাস করবে।[২]

دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ

জান্নাতে একটি কথাই যথেষ্ট হবে

জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামত দেখে জান্নাতবাসীগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠবে "সোবহানাল্লাহ"। জান্নাতবাসীগণ যখনই কোন কিছু ইচ্ছা করবে তখনই তারা বলবে "সোবহানাকা আল্লাহুম্মা" (পবিত্র তুমি হে আল্লাহ!) একথা বলামাত্র সে জান্নাতীর মন যা চেয়েছিল তা উপস্থিত পাবে। জান্নাতবাসীদের মনের কথা প্রকাশের জন্যে এই একটি কথাই যথেষ্ট হবে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, জান্নাতবাসীগণ যখনই এ বাক্যটি উচ্চারণ করবেন তখনই জান্নাতের খাদেমগণ সুস্বাদু খাবার তাদের সম্মুখে পেশ করবেন। যে দস্তরখান তাদের সম্মুখে রাখা হবে তা এক মাইল লম্বা এবং এক মাইল চওড়া হবে এবং প্রত্যেক দস্তরখানে ৭০ হাজার পাত্র থাকবে। প্রত্যেক পাত্রে ভিন্ন ভিন্ন খাবার থাকবে।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১১, পৃষ্ঠা-৪৩
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৮২-৮৩

জান্নাতবাসীগণ যখন খাবার গ্রহণ শেষ করবেন তখন তাদের মুখে উচ্চারিত হবে "আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন"।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেনঃ জান্নাতবাসীগণ "সোবহানাকা আল্লাহুম্মা" বলতে অত্যন্ত আনন্দ পাবেন। মুসলিম শরীফ ও আবু দাউদ শরীফে সংকলিত, হযরত যাবের (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, নিঃশ্বাস গ্রহণের ন্যায় জান্নাতবাসীগণের রসনায় আল্লাহ পাকের তরফ থেকে "সোবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ" উচ্চারিত হবে।

وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلٰمٌ

বেহেশতের জীবনে বেহেশতবাসীদের পরস্পরের মোলাকাতের সময় একে অন্যকে সালাম দেবেন। আর ফেরেশতাগণও প্রত্যেক ঘরের দ্বারে এসে "সালামুন আলাইকুম" বলবেন। এমনকি ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের তরফ থেকেও বেহেশবাসীগণকে সালামের উপহার পৌঁছাবেন।

বস্তুতঃ বেহেশতবাসীদের সুখ-শান্তি আনন্দ-উল্লাসের কোন অন্ত থাকবেনা, শুধু "সোবহানাকা আল্লাহুম্মা" শব্দটি উচ্চারণ করলেই মনের সকল আকাঙ্খা পূর্ণ হবে। পরস্পরের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় হবে সালাম শব্দের মাধ্যমে। ফেরেশতাগণও এভাবে বেহেশতবাসীগণকে সালাম দেবেনঃ

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ

"তোমাদের প্রতি সালাম এজন্যে যে তোমরা দুনিয়ার জীবনে সবর অবলম্বন করেছ"।

এবনে আবিদ দুনিয়া, দারে কুতনী হযরত যাবের (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন জান্নাতবাসীগণ আনন্দ উল্লাসে মশগুল থাকবে তখন উপর থেকে একটি নূর চমকাবে, জান্নাতীগণ উপরের দিকে দেখবে যে, আল্লাহ পাকের নূরের তাজাল্লি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আল্লাহ পাক তখন এরশাদ করবেনঃ আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল জান্নাহ।

"হে বেহেশতবাসীগণ! তোমাদের জন্যে শান্তি ও নিরাপত্তার সুসংবাদ", আর এটিই হলো পবিত্র কোরআনের এ আয়াতের অর্থ–

سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ

(পরম করুণাময় প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে সালাম)

যারা সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন

ইমাম আহমদ (রঃ) এবং এবনে হাব্বান হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে দারিদ্র প্রপীড়িত মোহাজেরগণ, যাদের দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তের হেফাজত হয়। এই হাদীসে তিনি

একথাও এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে আদেশ দেবেন যে, তোমরা মোহাজেরদের নিকট যাও এবং তাদেরকে আমার সালাম পৌঁছাও। ফেরেশতাগণ আরজ করবেনঃ হে আমাদের মালিক! আমরা আসমানের অধিবাসী, আমরা তোমার পছন্দনীয় সৃষ্টি, আমাদের প্রতি কি এ আদেশ হয়েছে যে, আমরা তাদের নিকট গমন করে তাদেরকে সালাম করবো? আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেন, "এরা আমার এমন বন্দা যারা আমার ব্যতীত আর কারো বন্দেগী করতো না। কোন কিছুকে আমার সঙ্গে শরীক করতো না। তাদেরকেই সীমান্তে প্রেরণ করা হতো এবং যাবতীয় অপ্রিয় বিষয় থেকে তাদের দ্বারা হেফাজত হতো। যখন তাদের কারো মৃত্যু হতো তখন মনের আকাঙ্খা মনে নিয়েই মৃত্যুবরণ করতো, আকাঙ্খা পূর্ণ হওয়ার সুযোগ হতো না"। এরপর নির্দেশ মোতাবেক ফেরেশতাগণ জান্নাতের প্রত্যেকটি দ্বারে উপস্থিত হবে এবং বেহেশতবাসীগণকে সালাম করবে।

وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"তখন তাদের শেষ কথা হবে "আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন"।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হলো যখন জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবেন এবং তাদের জন্যে সংরক্ষিত নেয়ামত সমূহ প্রত্যক্ষ করবেন তখন আল্লাহ্ পাকের অফুরন্ত রহমত দেখে তাঁর প্রশংসা করে "আলহামদুলিল্লাহ্" বলবেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, বেহেশতবাসীগণ কথা শুরু করবেন আল্লাহ্ পাকের তসবীহ্ দ্বারা এবং শেষ করবেন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন দ্বারা। এভাবে বেহেশতবাসীগণ আল্লাহ্ পাকের শোকর আদায় করবেন।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এবনে হাইয়ানের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, কোন জান্নাতী ব্যক্তি যখন "সোবহানাকা আল্লাহুম্মা" বলবেন, তখন তার নিকট দশ হাজার খাদেম স্বর্ণ নির্মিত পাত্র নিয়ে হাযির হবে।

তফসীরে মোআলেমোত তানজিলে আল্লামা হোসাইন এবনে মাসউদ আবু মোহাম্মদ নকভী (রঃ) এ কথাটির উল্লেখ করেছেন, এমনিভাবে আল্লামা ফতেহ মোহাম্মদ তায়েব লখনবী তাঁর খোলাসাতুত্তাফাসীরেও এ কথাটির উল্লেখ করেছেন।

বেহেশতবাসীগণ সুস্বাদু খাবার গ্রহণ করার পর আল্লাহ্ পাকের শোকর আদায় করে পাঠ করবেন "আল-হামদুলিল্লাহ্"।

আলোচ্য আয়াতে বেহেশতবাসীদের তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছেঃ

১. তাদের কথা হবে "সোবহানাকা আল্লাহুম্মা"। কোন কিছুর ইচ্ছা হলে এ বাক্যটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ইচ্ছাটি পূর্ণ হবে।

২. পরস্পরের মোলাকাতের সময় একে অন্যকে সালাম বলে পরস্পরের প্রতি শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন।

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৮৪

৩. তারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি হাম্‌দ পেশ করবেন, তথা আল্লাহর প্রশংসা করে তাঁর অন্তহীন নেয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, যারা সর্বদা আল্লাহ্ পাকের তসবীহ্ পাঠে ব্যস্ত থাকে এবং যারা হাত ও রসনা দ্বারা মানুষকে কষ্ট দেয় না তথা যাদের হাত এবং রসনা থেকে মানুষ নিরাপদ থাকে আর যারা সকল অবস্থায় আল্লাহ্ পাকের শোকর আদায় করে তারা বেহেশতবাসী হবে। কেননা যা কিছু ঘটে তা যদি প্রিয় এবং পছন্দনীয় হয় তবে আল্লাহ্ পাকের হাম্‌দ ও শোকর গুজারী সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হবে। আর যদি যা ঘটে তা অপ্রিয় হয় তবে তার জন্যে সবর করতে হবে আর এই সবরের জন্যে সওয়াব পাওয়া যাবে এবং সন্তুষ্ট চিত্তে সবরের তওফিকের জন্যে আল্লাহ্ পাকের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্তব্য হবে। যাদের এ অবস্থা, তারা হবে জান্নাতবাসী। আখেরাতে তাদের জন্যে রয়েছে শান্তি, নিরাপত্তা এবং সার্বিক কল্যাণ।

দ্বিতীয়তঃ আলোচ্য আয়াতে সর্বপ্রথম বেহেশতের নেয়ামত সমূহের উল্লেখ রয়েছে যেন আখেরাতের নেয়ামতের অন্বেষণকারীগণ আকৃষ্ট হয় এবং এরপর আল্লাহর প্রেমিকদের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, "তোমাদের জন্যে রয়েছি আমি এবং আমার জিকর। দুনিয়াতে তোমাদের সম্পর্ক শুধু আমার সঙ্গেই ছিল আর কারো সঙ্গে নয়, আর আখেরাতের অনন্ত অসীম নেয়ামত লাভ করেও তোমরা আমার জিকরেই মশগুল থাকবে"।

তৃতীয়তঃ আল্লাহর পবিত্র নামের তসবীহ্ পাঠ করলে এবং অন্য বেহেশতবাসীদের সঙ্গে সালামের মাধ্যমে শুভেচ্ছা বিনিময় করলে মর্তবা বুলন্দ হবে। এ অবস্থায় আল্লাহ্ পাকের শোকর আদায় করা কর্তব্য। এতদ্ব্যতীত এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, জান্নাতে আল্লাহর জিকর এবং তসবীহ্ তাহলীল রয়েছে। কোন প্রকার কষ্ট বা হিংসা-বিদ্বেষ নেই। এজন্যেই এরশাদ হয়েছেঃ জান্নাতবাসীদের প্রথম কথা হবে তসবীহ্ পাঠ তথা "সোবহানাকা আল্লাহুম্মা" আর শেষ কথা হবে "আলহামদুলিল্লাহ্"। এটি জান্নাতবাসীদের শুধু বৈশিষ্ট্যই নয়; বরং অভ্যাসে পরিণত হবে।

এছাড়া একথাও প্রমাণিত হলো যে, জান্নাতে প্রবেশের সময় অথবা কোন নেয়ামত লাভের সময় জান্নাতবাসীগণ তসবীহ্ পাঠ করবেন, পরস্পরের মোলাকাতের সময় সালাম বিনিময় হবে। অবশেষে লব্ধ নেয়ামতের জন্যে আল্লাহর হাম্‌দ বা শোকর আদায় করবেন।[১]

[১] খোলাসাতুত্তাফাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩১২

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ
فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿۱۱﴾ وَاِذَا
مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖٓ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآئِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ
ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَآ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا
كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۲﴾ وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا ۙ
وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ
الْمُجْرِمِيْنَ ﴿۱۳﴾ ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ
كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴﴾

তরজমা

(১১) যেভাবে মানুষ কল্যাণ কামনায় তাড়াহুড়া করে যদি আল্লাহ্ পাকও তাদের অকল্যাণ সাধনে সেভাবে তাড়াতাড়ি করেন তবে তাদের জীবনের অবসান ঘটতো। এজন্যে যারা আমার মোলাকাতের আশা করেনা আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াতে দেই।

(১২) আর মানুষ যখন বিপদগ্রস্ত হয় তখন সে আমাকে ডাকে শায়িত অবস্থায়, উপবিষ্ট অবস্থায় অথবা দন্ডায়মান অবস্থায়। এরপর যখন আমি তার কষ্ট দূর করে দেই তখন সে এভাবে চলে যায় যেন কখনও কোন বিপদেই সে আমাকে ডাকে নাই। এভাবেই সীমালজ্ঘনকারীদের নিকট তাদের কার্যকলাপ শোভনীয় মনে হয়।

(১৩) আর নিশ্চয় আমি তোমাদের পূর্বে বহু জাতিকে ধ্বংস করেছি যখন তারা জুলুম করেছিল, অথচ তাদের নিকট তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন কিন্তু তারা কখনও ঈমান আনয়নে প্রস্তুত ছিল না। এভাবেই আমি পাপীষ্ঠদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

(১৪) এরপর আমি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছি, তোমরা কেমন কাজ কর তা আমি দেখতে চাই।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

এ সূরার শুরুতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে যারা অস্বীকার করেছে তাদের কিছু কিছু সন্দেহের জবাব দেয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এমনি আরো একটি সন্দেহের জবাব রয়েছে। কাফেররা একথা বলে বেড়াত যে, যদি

মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর সত্য নবী হতেন তবে তাঁর বিরোধীদের উপর আল্লাহর আযাব কেন আসেনা? আমরা যারা তাঁকে সর্ব প্রকার বাধা দিচ্ছি আমাদের উপর আসমান থেকে কেন পাথর বর্ষণ করা হয় না?

আল্লাহ্ পাক এর জবাবে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহর নবীর দুশমনদের উপর আযাব ত্বরান্বিত করা আমার হেকমতের বরখেলাফ কাজ, যেভাবে মানুষের প্রতি রহমত নাযিল করার কাজ ত্বরান্বিত করা হয়, যদি মানুষকে কোপগ্রস্ত করার ব্যাপারও ত্বরান্বিত করা হয় তবে তোমাদের অস্তিত্বই থাকবে না। আল্লাহ্ পাকের প্রতিটি কাজ হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ, কল্যাণময়, তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল, হয়তো এমন সময় আসবে যে, আজ যে ব্যক্তি ইসলামের দুশমন কাল সে তওবা করে ঈমানদার হবে এবং ইসলামের সহায়ক শক্তিতে পরিণত হবে। তাই আল্লাহ্ পাক মানুষের প্রতি আযাব নাযিল করার ব্যাপারে বিলম্ব করেন। আর এতে মোমেনদেরকে এ শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে যে, কারো ব্যাপারে ক্ষতিকর কিছু কামনা করার ব্যাপারে যেন তাড়াহুড়া না করা হয়।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁর দয়া এবং অন্তহীন করুণার কথা ঘোষণা করেছেন যে, মানুষ অনেক সময় ক্রোধের বশীভূত হয়ে নিজের সন্তান-সন্ততিকেও মন্দ বলে, বদ দোয়া করে। কিন্তু এটি আল্লাহ্ পাকের বিশেষ দান যে, তিনি ঐ বদ দোয়া সঙ্গে সঙ্গে কবুল করেন না। মানুষ যেভাবে কল্যাণ কামনায় তাড়াহুড়া করার নীতি গ্রহণ করে যদি আল্লাহ্ পাক তাদের অকল্যাণ কামনায়ও অনুরূপ নীতি গ্রহণ করেন তবে তাদের অস্তিত্বই থাকবেনা।

এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কোন সময়ই নিজের সন্তান-সন্ততিকে বদ দোয়া করোনা, কেননা কোন কোন সময় দোয়া কবুল হয়ে যায়। দোয়া কবুল হওয়ার ঐ মুহূর্তে যদি বদ দোয়া বের হয়ে যায় তবে তাও কবুল হবে।

বিখ্যাত তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) আলোচ্য আয়াতের তফসীরে বলেছেন, মানুষ ক্রোধের বশীভূত হয়ে নিজের সন্তান-সন্ততির বিরুদ্ধে বদ দোয়া করে বসে এমন অবস্থায় তার কর্তব্য হলো একথা বলা- হে আল্লাহ! আমার এ কথায় বরকত দিওনা তথা আমার এ বদ দোয়া কবুল করোনা। যদি কবুল হয়ে যায় তবে তার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়বে।[২]

শানে নুযুল

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতের শানে নুযুল হলো নজর এবনে হারেস নামক এক ব্যক্তি নিজের জন্যেই বদ দোয়া করেছিল। সে বলেছিল, হে আল্লাহ! যদি মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সত্য নবী হন, তোমার তরফ থেকে প্রেরিত হন, তবে আমাদের উপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ কর, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[৩]

---

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৪৭
[২]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১১, পৃষ্ঠা-৪৩-৪৪
[৩]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৮৫

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেনঃ সাধারণত ক্রোধের সময় মানুষ নিজের পরিবারবর্গ সন্তান-সন্ততির উপর লা'নত দিয়ে থাকে, এ সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

কাতাদা (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো মানুষ যখন আল্লাহ পাকের নিকট কোন বদ দোয়া করে এবং কারো ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করে তখন আল্লাহ পাক তাদের দোয়া কবুল করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করেন না। যেভাবে তিনি মানুষের নেক দোয়াগুলো অনতিবিলম্বে কবুল করেন ঠিক সেভাবে বদদোয়া কবুল করেন না। নিঃসন্দেহে এটি মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ মেহেরবানী।

আল্লাহ পাক অনন্ত অসীম করুণাময়, দুনিয়ার মোহে মুগ্ধ, আত্মবিস্মৃত, পথভ্রষ্ট মানুষের শাস্তি অবধারিত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ পাক দিশেহারা মানুষকে অবকাশ দান করেন যাতে করে মানুষ আত্মসংশোধনে ব্রতী হতে পারে। কিন্তু অবকাশের এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে যদি কেউ আত্মরক্ষায় সচেষ্ট না হয় এবং নিজের ধ্বংস ডেকে আনতে বদ্ধপরিকর হয়, তখন নিজের পাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে থাকে।

এমনকি কোন কোন সময় আল্লাহ পাকের কাছেই শাস্তি বা আযাবের জন্যে তাড়াহুড়া করতে থাকে। তখনও আল্লাহ পাক তাঁর নীতিতে অটল থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে আযাব দেন না; বরং আরো অবকাশ দিয়ে থাকেন, ঠিক এমনিভাবে দুনিয়ার বিপদাপদে, সাংসারিক অভাব-অনটনে, মানুষের অত্যাচার-উৎপীড়নে বা সন্তান-সন্ততির অবহেলা উদাসীনতায় রাগান্বিত হয়ে মানুষ নিজের আপনজনদেরকেই বদ দোয়া করে বসে। কিন্তু আল্লাহ পাক অতীব মেহেরবান, তাই সঙ্গে সঙ্গে তিনি এমন বদদোয়া কবুল করেন না। যদি তা তিনি করতেন তবে ভয়াবহ পরিণাম থেকে কেউ রক্ষা পেত না। আল্লাহ পাক যা কিছু করেন তা নিজের বিচার-বিবেচনা ও মর্জিতেই করেন, মানুষের ইচ্ছায় নয়।

فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا

তাই যারা আমার মোলাকাতের আকাঙ্খা করেনা তাদেরকে আযাব দিয়ে ধ্বংস করিনা; বরং কিছুদিন তাদের পথভ্রষ্টতায় দিশেহারা অবস্থায় ঘোরাফেরা করার সুযোগ দিয়ে থাকি। তাদের ধ্বংস করার কাজ ত্বরান্বিত করিনা; বরং অবকাশ দিয়ে থাকি।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যখন কাফেরদেরকে তাদের অন্যায় আচরণের শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হতো তখন তারা বলতো, এ শাস্তি কবে আসবে? এমনকি এ সূরাতেই আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে এরশাদ করেছেন–

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

"এবং তারা বলে কবে পূর্ণ হবে শাস্তির এই ওয়াদা যদি তোমরা সত্যবাদী হও"?

যেহেতু কাফেররা আল্লাহর শাস্তিকে ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিল, যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

آلْـٰٔنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ

(এখন? অথচ তোমরাই এ শাস্তিকে ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে।) তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ যদি আল্লাহ্ পাক তোমাদের উপর শাস্তিকে ত্বরান্বিত করেন তবে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে, তোমাদের মূলোৎপাটন হবে। অথচ যদি শাস্তি ত্বরান্বিত না করা হয় তবে পরবর্তীতে তাদের ঈমান আনয়নের সম্ভাবনা থাকে। যদি তাদের তকদীরে ঈমান নাও থাকে তবে তাদের বংশধরদের মধ্যেও ঈমান আয়ননের সম্ভাবনা থাকে। যদি তাদেরকে ধ্বংস করা হয় তবে ঈমান লাভের সকল সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়, তাই আল্লাহ্ পাক ইসলামের দুশমনদের জন্যে আযাবকে ত্বরান্বিত করেন না।[১]

পূর্ববর্তী আয়াতে দূরাত্মা কাফেরদের ধৃষ্টতার কথা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস করেনা, এমনকি আল্লাহ্র আযাবকেও ভয় করেনা। যদি তাদেরকে আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করা হয় তখন তারা বলে, এ আযাব কবে আসবে? এমনকি একথাও বলে আর অপেক্ষা কিসের? এখনই আসমান থেকে আমাদের উপর পাথর বর্ষিত হোক না! তাদের ধৃষ্টতা এবং দৌরাত্ম এত বেশী যে, তারা নিজেদের জন্যে আল্লাহ্র আযাবকে ডাকে।

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ এহেন ধৃষ্টতা সত্ত্বেও মানুষ এত দুর্বল এবং অসহায় ও বে-সবর যে, সামান্য দুঃখ-কষ্ট হলেই তারা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا

আর মানুষকে যখন কষ্ট স্পর্শ করে তথা যখন তারা বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন ওঠা-বসা, চলা-ফেরা এমনকি শায়িত অবস্থায় আল্লাহ্ পাককে ডাকতে থাকে। চরম অসহায় নিরুপায় হয়ে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে কাঁদতে থাকে। সামান্য বিপদ দেখলেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয় এবং সামান্য নেয়ামত পেলেই অকৃতজ্ঞ এবং বেপরোয়া হয়ে ওঠে। এক কথায় বিপদের সময় মানুষ অধৈর্য হয়ে পড়ে এবং নেয়ামত লাভ হলে অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

কিন্তু যখন আল্লাহ্ পাক তাঁর রহমতে তার বিপদ দূর করে দেন তখন সে তার সাবেক অবস্থায় ফিরে আসে। আর এভাবে আল্লাহকে ভুলে যায় যেন কোন দিন আল্লাহকে ডাকে নাই, কোন দিন আল্লাহ্ পাকের সাথে তার কোন সম্পর্কই ছিলনা, যারা সীমালজ্ঞনকারী, পাপাচারী তাদের নিকট এহেন নিন্দনীয় কাজ শোভনীয় মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত মোমেনের অবস্থা এমন নয়, প্রকৃত মোমেন কোন অবস্থাতেই এমন অকৃতজ্ঞ হতে পারেনা। সে সুখে দুঃখে সকল অবস্থায় আল্লাহর জিকরে মশগুল থাকে, এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ "তুমি সুখের সময় আল্লাহ্ তায়ালাকে স্মরণ কর তাহলে দুঃখের সময় তিনি তোমাকে স্মরণ করবেন"।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেনঃ মোমেনের ব্যাপার বড়ই বিস্ময়কর। যা কিছু আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আসে তা তার জন্যে কল্যাণকরই হয়, যদি সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সবর করে তবে সওয়াব পাবে, আর যদি সে আরাম ও আনন্দ পায়, আর শোকর আদায় করে তবে তার জন্যেও সওয়াব পাবে। এটা শুধু মোমেনেরই বৈশিষ্ট্য।[১]

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফের ও মুশরেকদের কোপগ্রস্ত হওয়ার ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। আর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ইতিপূর্বে যেসব জাতি আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েছে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়েছে, তারা ধ্বংস হয়েছে।

মূলতঃ পূর্ববর্তী আয়াতে কাফের ও মুশরেকদের শাস্তি ত্বরান্বিত না করার ঘোষণা রয়েছে। এতে হয়তো কোন কাফের ও মুশরেক নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এভাবে নিশ্চিন্ত হওয়া যে ভুল এবং আত্ম সংশোধনে ব্রতী হওয়া এবং আল্লাহ পাকের নবীর আহ্বানে সাড়া দেয়া যে তাদের একান্ত করণীয় তা আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। কেননা ইতিপূর্বে যারা কুফরী ও নাফরমানী করেছে, আল্লাহ পাকের নবীগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে তাদের পরিণাম হয়েছে ভয়াবহ, তাদেরকে নির্মুল করা হয়েছে। অতএব, তাদের পরিণাম লক্ষ্য করে অন্যদের শিক্ষা গ্রহণ করা এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করা একান্ত কর্তব্য। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا.

এবং আমি তোমাদের পূর্বে বহু জাতিকে ধ্বংস করেছি যখন তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে তথা কুফরী ও নাফরমানী করেছে, শেরক করেছে, নবীগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রদত্ত নির্দেশ সমূহকে অস্বীকার করেছে, আল্লাহ পাকের নবীগণের সঙ্গে শত্রুতা করেছে, তাঁদের প্রতি ঈমান আনেনি। তাই আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। কেননা তারা ঈমান আনয়নের সকল ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ঈমান আনেনি। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, দুদিন আগে পরে অন্যায়ের শাস্তি অবশ্যই হবে। আর সর্বশ্রেষ্ঠ অন্যায় হলো কুফর ও শেরক, এজন্যে পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

"নিশ্চয় শেরক হলো সর্বশ্রেষ্ঠ জুলুম"। ইতিপূর্বে যাদের নিকট নবীগণ প্রেরিত হয়েছেন তাঁরা তাদের সম্প্রদায়কে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু ঐ আহ্বানে সাড়া দেয়াতো দূরের কথা কাফেররা নবীগণকে কষ্ট দিয়েছে। যখন কোন অবস্থাতেই তারা সত্যকে গ্রহণ করে নাই; বরং সত্যকে বাধা দেয়ার

[১]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১১, পৃষ্ঠা-৪৪

কাজেই মত্ত হয়েছে তখন তারা আল্লাহর আযাবে পতিত হয়েছে। এজন্যে পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ করেছেনঃ

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

"যারা আল্লাহর হুকুমের বরখেলাফ কাজ করে, আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হয় তাদের ভয় করা উচিত যে, যে কোন সময় তারা বিপদগ্রস্ত হতে পারে। অথবা তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক আযাব আপতিত হতে পারে"।

মক্কাবাসী প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতায় তৎপর ছিল, তাঁই আল্লাহ পাক তাদের ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ করেছেনঃ

كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ

এভাবে আমি পাপীষ্ঠ সম্প্রদায়কে শাস্তি দিয়ে থাকি যখন তারা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত নবীগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে। যখন এ বিষয় নিশ্চিত হয়েছে যে, তাদেরকে আর অবকাশ দিলে কোন লাভ হবে না তখন তাদের ধ্বংসের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্নলিখিত দোষ সমূহ পাওয়া যাবে তারা আল্লাহর আযাবে পতিত হবে।

১. যারা জুলুম অত্যাচার ও পাপাচারে লিপ্ত হবে।

২. তাদের নিকট কোন পয়গম্বর অথবা কোন উপদেশ দানকারী এসে তাদের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করবে, কিন্তু তারা সতর্ক হবে না।

৩. তাদের অবস্থা এমন হয় যে হেদায়েত কবুল করার বা তওবা করার কোন সম্ভাবনাই থাকেনা এবং তাদের পাপাচার অব্যাহত থাকে, এমন অবস্থায় তাদের উপর আল্লাহর আযাব আপতিত হতে পারে।[১]

যেমন আদ জাতি, সামুদ জাতি, ফেরাউনের দল, হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় এবং হযরত লুত (আঃ)-এর সম্প্রদায়কে আল্লাহ পাক ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাদের অন্যায় আচরণের কারণে তাদের এ শাস্তি ছিল অনিবার্য এবং ইতিহাসের এসব ঘটনা পরবর্তী কালের মানুষের জন্যে নিঃসন্দেহে শিক্ষণীয় এবং অবিস্মরণীয়। তাই পরবর্তী বাক্যে ইতিহাসের এসব স্মরণীয় বাণী থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে এরশাদ হয়েছেঃ

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ.

---

[১]। খোলাসাতত্যাফাসীর খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩১৫

"পূর্ববর্তী জাতি সমূহকে ধ্বংসের পর তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছি, আমি দেখতে চাই তোমরা কেমন কাজ কর"।

যারা তাদের অন্যায় অনাচারের শাস্তি স্বরূপ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তাদের পর তোমরা আজ তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছ, আল্লাহ পাকের এবং বন্দার হক্ব আদায়ে তোমরা দায়িত্ব সমূহ কিভাবে পালন কর তা আল্লাহ পাক দেখতে চান। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছেন, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআন তোমাদের নিকট রয়েছে। অতএব, আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে জীবন-যাপন করার উপরই নির্ভর করছে তোমাদের জীবন-সাধনার সাফল্য।

বুদ্ধিমান মানুষের কাজ হলো পূর্ববর্তী লোকদের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। অতএব, তোমরাও শিক্ষা গ্রহণ কর। আত্ম সংশোধনে ব্রতী হও। আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আন, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ কর, এটিই শান্তি এবং কল্যাণের পথ। এটিই দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের সাফল্যের পথ।

মূলতঃ এ পৃথিবী মানব জাতির জন্যে যেমন কর্মক্ষেত্র, তেমনি পরীক্ষা ক্ষেত্রও। প্রতি নিয়ত এখানে মানুষের পরীক্ষা হচ্ছে আর এ পরীক্ষা হচ্ছে মানুষের প্রতিটি কথা ও কাজের মাধ্যমে। যদি মানুষ ঈমান ও সৎ কাজ করে তবে জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, আর যদি ঈমান ও নেক আমলের প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হয় তবে জীবনের পরীক্ষায় সে ব্যক্তি ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।

মুসলিম শরীফে সংকলিত, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ বনী ইসরাইলের তিনটি লোক ছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল কুষ্ঠ রোগী। দ্বিতীয় ব্যক্তির মাথায় চুল ছিলনা। তৃতীয় ব্যক্তি ছিল অন্ধ। আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলেন তাদের পরীক্ষা নিতে। তাই একজন ফেরেশতা প্রেরণ করলেন। ঐ ফেরেশতা কুষ্ঠ রোগীর নিকট এসে বললেনঃ তুমি কি চাও? সে বললোঃ আমি এ রোগ থেকে মুক্তি চাই। ফেরেশতা তার দেহ স্পর্শ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সে সুস্থ হলো এবং তার দেহ অতি সুন্দর হলো।

এরপর ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি ধন-সম্পদের মধ্যে কি চাও? সে বললোঃ উষ্ট্র বা গরু। তখন তাকে একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী দেয়া হলো এবং তিনি দোয়া করলেনঃ আল্লাহ তাতে বরকত দান করুন। এরপর ফেরেশতা দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট আসলেন। তাকে বললেনঃ তুমি কি চাও?

সে বললোঃ আমি চাই আমার মাথায় চুল উঠুক। ফেরেশতা স্পর্শ করলে তার মাথায় চুল উঠে গেল। এরপর তাকে একটি গাভী দেয়া হলো, যা ছিল গর্ভবতী। এরপর ফেরেশতা অন্ধ ব্যক্তির নিকট গমন করে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি চাও?

সে বললোঃ দু'টি চক্ষু এবং বকরী। ফেরেশতা স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে লোকটি চক্ষুষ্মান হয়ে গেল এবং তাকে গর্ভবতী বকরী দেয়া হল। কিছুদিনের মধ্যে তাদের

প্রত্যেকের সম্পদ অনেক বৃদ্ধি পেল। তখন একজন ফেরেশতা সাহায্য প্রার্থীর রূপ ধারণ করে ঐ ব্যক্তির নিকট হাযির হল যে ছিল কুষ্ঠ রোগী এবং বললো, আমি মুসাফির এবং মিসকীন, আমার পথ খরচ নেই, আল্লাহ্ পাক ব্যতীত আমার কোন আশ্রয় নেই। আমি সেই আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার নিকট সাহায্য চাই যিনি আপনাকে সুস্থ করেছেন এবং উষ্ট্র দান করেছেন। সে ব্যক্তি বললো, আমার দায়িত্বে অনেক লোকের ব্যয়ভার রয়েছে। ফেরেশতা বললো, আমিতো তোমাকে চিনি, তুমি কি কুষ্ঠ রোগী ও অভাবগ্রস্ত ছিলে না? আল্লাহ তোমাকে এসব কিছু দান করেছেন।

সে বললো, এ সবতো আমি আমার পৈত্রিক সম্পত্তি হিসেবে পেয়েছি। ফেরেশতা বললেন, যদি তুমি মিথ্যা কথা বলে থাক আল্লাহ্ পাক তোমাকে তেমনই করে দিন যেমন তুমি ইতিপূর্বে ছিলে। এরপর ফেরেশতা ঐ ন্যাড়া মাথা বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট আসলেন। সেও একই জবাব দিল। এরপর তিনি অন্ধ ব্যক্তির নিকট আসলেন। তার নিকটও সাহায্য প্রার্থী হলেন। সে বললো, একথা সত্য যে আমি অন্ধ ছিলাম, আল্লাহ্ পাক আমাকে দু'টি চক্ষু দান করেছেন। এ ধন-সম্পদও আল্লাহ্ পাকই আমাকে দান করেছেন। তোমার যত ইচ্ছা এবং যা ইচ্ছা সম্পদ নিয়ে যাও। আমি তোমাকে বাধা দেবনা। ফেরেশতা বললেন, তোমার সম্পদ তোমাকেই মোবারক হোক, আল্লাহ্ পাক তোমাকে পরীক্ষা করেছেন, (প্রথম দু' ব্যক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি) তাই পুনরায় একজন কুষ্ঠ রোগী হয়েছে আর একজনের মাথা ন্যাড়া হয়ে গেছে। আল্লাহ্ পাক তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

তাই, প্রত্যেককে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যারা ইতিপূর্বে আল্লাহর আযাব ভোগ করে ধ্বংস হয়েছে, যদি তোমরাও তাদের অনুসারী হও তবে তাদের মত তোমরাও ধ্বংস হবে। আর যদি আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ মেনে চল, আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ কর, তবে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে তোমরা সফলকাম হবে।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ۙ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ
بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ
نَفْسِي ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۖ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ
يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ ۖ
فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾

তরজমা

(১৫) আর যখন তাদের সম্মুখে আমার সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ পাঠ করা হয়, তখন যারা আমার মোলাকাতের আশা রাখেনা তারা বলে এর বদলে অন্য কোরআন নিয়ে আস, অথবা একে পরিবর্তন কর। (হে রসূল!) আপনি বলুন নিজের থেকে পবিত্র কোরআন

পরিবর্তন করা আমার কাজ নয়। আমার প্রতি যে ওহী নাযিল হয় আমি শুধু তারই অনুসরণ করি। আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই তবে আমি ভয় করি মহা দিনের (কেয়ামতের দিনের) আযাবকে।

(১৬) (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে আমি তা তোমাদের সম্মুখে পাঠ করতাম না, আর তিনি তোমাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করতেন না। আমি তো ইতিপূর্বে তোমাদের মধ্যে জীবনের অনেক দিন অবস্থান করেছি, তবুও কি তোমরা ভেবে দেখনা?

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

ইমাম কাতাদা (রাঃ) বলেছেনঃ এ আয়াত মক্কার মুশরেকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

মোকাতেল (রঃ) বলেছেনঃ এ আয়াত নাযিল হয়েছে পাঁচ ব্যক্তি সম্পর্কে, তারা হলোঃ

(১) করজ এবনে হাফ্স (২) আমর এবনে আবদুল্লাহ এবনে আবু কোবায়েস আমেরী (৩) আস এবনে আমের এবনে হেশাম (৪) আবদুল্লাহ এবনে উবাই মাখজুমী (৫) ওলীদ এবনে মগীরা।

এ পাঁচ ব্যক্তি হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে বলেছিলঃ যদি আপনার ইচ্ছা হয় যে, আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করি তবে আপনি এমন কোরআন পেশ করুন যাতে আমাদের দেব-দেবী, লাত মানাত-ওজ্জার পূজা-অর্চনার বিরুদ্ধে কোন কথা না থাকে। সে গ্রন্থ আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ হোক বা না হোক তাতে কোন অসুবিধা নেই। যদি আল্লাহর তরফ থেকে এমন গ্রন্থ নাযিল না হয়, তবে আপনি নিজেই একটি গ্রন্থ তৈরী করে দিন। অথবা এ গ্রন্থটির মধ্যেই পরিবর্তন করুন। যেখানে আযাবের আয়াত রয়েছে সেখানে রহমতের আয়াত এনে দিন, আর হারামের স্থলে হালাল, আর হালালের স্থলে হারামের আদেশ দিন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

মূলতঃ পবিত্র কোরআনের অন্যান্য উপদেশ সম্পর্কে মক্কাবাসী আপত্তি করতো না। তাদের যত আপত্তি এবং গাত্রদাহ ছিল, তা তাদের দেব-দেবীর পূজা সম্পর্কীয় আয়াত সম্পর্কে। কেননা, পবিত্র কোরআনে শেরকের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। এতে মূর্তি পূজা বর্জনের আদেশ প্রদান করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে–

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ

(নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁর সাথে শেরক করাকে মাফ করেন না। এতদ্ব্যতীত অন্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি মাফ করতেও পারেন) অথচ মুশরেকদের এ বিষয়েই ছিল আপত্তি। তারা বলতো আপনার সব কথাই ভাল কিন্তু এ বিষয়টি আপনি বাদ দিয়ে দিন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا

আর যখন তাদের সম্মুখে আমার সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করা হতো তখন যারা আমার মোলাকাতের আশা রাখেনা তারা বলতোঃ এর পরিবর্তে অন্য কোরআন নিয়ে আসুন যাতে আমাদের লাত ওজ্জা নামক দেব-দেবীর পূজা অর্চনার বিরুদ্ধে কোন কথা না থাকে।

অথবা এ কোরআনও থাকতে পারে তবে এ প্রসঙ্গটি পরিবর্তন করুন। কাফেরদের এ কথার জবাবেই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ

(হে রসূল!) আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ পাকের কালামে কোন প্রকার পরিবর্তন করার অধিকার কোন নবী রসূলের নেই। আমার পক্ষে তা কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ জবাবে "আয়াত পরিবর্তন সম্ভব নয়" উল্লেখ করা হয়েছে। ভিন্ন কোরআন নিয়ে আসার জবাব উল্লেখ করা হয় নাই কেননা, একখানি আয়াতেরও পরিবর্তন যখন সম্ভব নয় তখন ভিন্ন কোরআন নিয়ে আসা সম্পূর্ণ অকল্পনীয়। তাই একথার জবাব দেয়া জরুরী মনে করা হয় নাই।

মুশরেকরা আল্লাহর নবীর মর্যাদা এবং অধিকার সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখতো না বলেই এমন সব কথার অবতারণা করেছে। তাই পরবর্তী আয়াতে নবীর দায়িত্ব পালনের পন্থা বিশ্লেষণ করে এরশাদ হয়েছেঃ

اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ

আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে আমার নিকট যে ওহী বা প্রত্যাদেশ আসে আমি শুধু তারই অনুসরণ করি। আমার কাজ হলো আল্লাহ্ পাকের মহান বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছে দেয়া, তাতে কোন প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা আমার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহ্ পাকের কালাম সামান্য পরিবর্তন করাও অত্যন্ত বড় নাফরমানী, মারাত্মক অপরাধ। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ

যদি আমার দ্বারা আমার প্রতিপালকের নাফরমানী হয় তবে কেয়ামতের দিনের আযাবকে আমি ভয় করি অর্থাৎ যদি কোন নবী রসূল দ্বারা আল্লাহর নাফরমানীর কাজ হয় তবে তাঁরাও আল্লাহর আযাব থেকে রেহাই পাবেন না। এমন অবস্থায় তোমরা যারা এমন অন্যায় কথা বল তোমাদের পরিণাম যে কত ভয়াবহ হবে তা একটু চিন্তা করে দেখ।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে একথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমরা পবিত্র কোরআনের আয়াত পরিবর্তনের যে আবদার করেছ তার জন্যে তোমাদের শাস্তি অবধারিত রয়েছে।[১]

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৮৮

তফসীরকারগণ বলেছেন, এতে একথা প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালন করা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যেও একান্ত জরুরী ছিল। তিনি নিজের তরফ থেকে কোন বিধান পেশ করেননি; বরং আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে বিধান এসেছে তাই তিনি বিশ্বমানবের সম্মুখে পেশ করেছেন। পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এ কথাটিকে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى

"প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) নিজের ইচ্ছায় কিছুই বলেন না; তিনি শুধু তাই বলেন যা তাঁর নিকট ওহীর মাধ্যমে আসে"।[১]

তত্ত্বজ্ঞানীগণ আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণ করেছেন যে, শরীয়তের কোন বিধান পরিবর্তন করার অধিকার কারোরই নেই। যদি কেউ এমন কাজ করে তবে তার শাস্তি হবে অত্যন্ত কঠিন।

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, বেদআত হারাম অর্থাৎ শরীয়তে যা নেই তাকে শরীয়ত বলে দাবী করা হারাম। কেননা যখন কোন নবীর জন্যে আল্লাহর বিধানের বাইরে কোন কথা বলা বৈধ নয় তবে অন্যের জন্যে তা কি করে বৈধ হতে পারে? অথচ নবীগণ হলেন মা'সুম (নিঃস্পাপ)। এমন অবস্থায় যারা মা'সুম বা নিঃস্পাপ নয়, তাদের পক্ষে এমন কাজ কি করে বৈধ হতে পারে![২]

قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ

(হে রসূল!) আপনি বলুন, আমি আমার নিজের ইচ্ছায় কিছু করি না। আমি আল্লাহর রসূল। আল্লাহ পাক তোমাদের নিকট তাঁর মহান বাণী পাঠ করার আদেশ দেন বলেই আমি তা পাঠ করি। যদি তিনি এর ইচ্ছা না করতেন তবে আমি তা তোমাদের নিকট পাঠ করতাম না।

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ

তোমরাই বল, আমি জীবনের একটা বিরাট অংশ তোমাদের সম্মুখেই অতিবাহিত করেছি। আমার অবস্থা তোমাদের অজানা নয়, আমার সত্যবাদীতা ও ঈমানদারী, আমানতদারী সততা সবই তোমরা জান, এমন অবস্থায় তোমরা কি সত্য-অসত্যের মধ্যে পার্থক্য করতে পারছ না?

এ পর্যায়ে রোমক সম্রাটের নিকট আবু সুফিয়ান এবং তার সাথীরা নতুন নবীর অবস্থা সম্পর্কে যে জবাব দিয়েছিল তা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আবু সুফিয়ান ছিল তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় শত্রু। তাকেই রোমক সম্রাট প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

---

[১]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৩৫

[২]। খোলাসাতুত্যাফাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩১৬
তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৩৫

করেছিল যে, যিনি তোমাদের দেশে নবুওয়্যতের দাবী করেছেন, কোন সময় কি তাঁর কোন মিথ্যা কথা তোমাদের সম্মুখে ধরা পড়েছে?

আবু সুফিয়ান বলেছিল, না। তখন রোমক সম্রাট বলেছিলঃ যে ব্যক্তি মানুষের ব্যাপারে কোন দিন মিথ্যা বলেননি তিনি আল্লাহর ব্যাপারে কিভাবে মিথ্যা কথা বলবেন?

এভাবে আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাশীর নিকট হযরত জাফর এবনে আবু তালেব (রাঃ) বলেছিলেনঃ আল্লাহ্ পাক আমাদের নিকট আমাদেরই মধ্য হতে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন যাঁর সততা, সত্যবাদীতা, আমানতদারী এবং বংশ মর্যাদা আমাদের নিকট অত্যন্ত সুপরিচিত।[১]

পবিত্র কোরআন অলৌকিক

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, "আমি তোমাদের মধ্যে জীবনের একটা সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছি"। অর্থাৎ পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে চল্লিশ বছর অতিবাহিত করেছি, আমি কিছুই বর্ণনা করিনি। এ বাক্য দ্বারা পবিত্র কোরআনের অলৌকিকত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা যিনি চল্লিশ বছর যাবত এই সমাজে বাস করেছেন, কোন ব্যক্তির নিকট থেকে কোন কিছু শেখেননি, কোন দিন কোন কবিতা আবৃত্তি করেননি, কোন দিন কোথাও ভাষণ দান করেননি, তিনি হঠাৎ এমন বিস্ময়কর জ্ঞানগর্ভ তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ মহান গ্রন্থ পেশ করলেন যার মোকাবেলা করা কারো পক্ষেই সম্ভব হলোনা। যে গ্রন্থের ভাষা উচ্চাঙ্গের, যে গ্রন্থে সমগ্র মানব জাতির যাবতীয় সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান রয়েছে, ভাষার অলংকারের দিক থেকে যে গ্রন্থ অদ্বিতীয়, যে গ্রন্থে মানব জাতির অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কথা সঠিকভাবে বর্ণিত হয়েছে তা নিশ্চয় কোন মানুষের রচিত হতে পারেনা; বরং নিঃসন্দেহে এ মহাগ্রন্থ আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে হয়েছে অবতীর্ণ।

প্রিয়নবী (সাঃ)-এর বয়স

আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে যে, "(হে রসূল!) আপনি বলুন, আমি জীবনের একটা বিরাট অংশ তোমাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছি"। এ প্রসঙ্গে আলোচনা হতে পারে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বে চল্লিশ বছর ছিলেন। ওহী নাযিল হওয়ার পর তিনি মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় তের বছর অতিবাহিত করেছেন। এরপর তিনি মক্কায়ে মোয়াজ্জমা থেকে হিজরত করে মদীনা মোনাওয়্যারায় গমন করেন। সেখানে দশ বছর অতিবাহিত করেন। ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। এ তথ্য বর্ণনা করেছেন হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ), যা মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে।

মোহাম্মদ এবনে ইউসুফ সালেহী (রঃ) বর্ণনা করেন, ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হিজরতের পর মদীনা মোনাওয়্যারায়

[১]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১১, পৃষ্ঠা-৪৬

দশ বছর ছিলেন, আর নবুওয়্যত লাভের পূর্বে মক্কা শরীফে ৪০ বছর ছিলেন। কিন্তু নবুওয়্যত লাভের পর মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় কত দিন ছিলেন এ বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানীগণ একাধিক মত পোষণ করলেও সঠিক মত হলো তিনি নবুওয়্যত লাভের পর মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় তের বছর অতিবাহিত করেছেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এ মতই বিখ্যাত এবং সুস্পষ্ট।

ইমাম মুসলিম (রঃ) হযরত আনাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, ৬৩ বছর বয়সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হয়। হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-ও এ বয়সেই ইন্তেকাল করেন।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনা সংকলিত হয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল ৬৩ বছর বয়সে হয়েছে।

আল্লামা নববী লিখেছেনঃ এ মতই সঠিক এবং বিখ্যাত ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত।

أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

অর্থাৎ তোমরা কি এ সত্য ভেবে দেখনা যে, আমি তোমাদের মাঝে জীবনের একটা বিরাট অংশ অতিবাহিত করেছি। আমার সততা, সত্যবাদীতা, ঈমানদারী, আমানতদারী সম্পর্কে তোমরা সম্পূর্ণ অবগত, তোমরাই আমাকে "আল আমীন" (বিশ্বস্ত) খেতাবে ভূষিত করেছ। আমার সারা জীবনে কোন দিন একটি সামান্যতম মিথ্যা কথার কোন দৃষ্টান্ত তোমরা দেখতে পাওনি, এমনি অবস্থায় তোমরা কি করে দাবী কর যে, আমি নিজের কথাকে আল্লাহ পাকের কথা বলে পেশ করবো?

অথবা আল্লাহ পাকের অবতীর্ণ পবিত্র কালামে কিভাবে পরিবর্তন করবো? আল্লাহ পাকের কালামে আর আমার কথায় যে পার্থক্য রয়েছে তাও কি তোমরা বুঝতে পার না? আল্লাহ পাকের কালামের যে বৈশিষ্ট্য এবং সৌন্দর্য রয়েছে যার মোকাবেলা করা পৃথিবীতে কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি এবং কোনদিন হবেও না, সেই পবিত্র কালাম সম্পর্কে তোমরা কেন সন্দেহ পোষণ কর?

অতএব, এ সত্যের প্রতি বিশ্বাস কর যে, আমার নিকট আল্লাহ পাকের যে কালাম নাযিল হয় তা আমি তোমাদের নিকট পেশ করি। আমি আল্লাহ পাকের রসূল, তাঁর বাণী পৌঁছানোই আমার কর্তব্য।[১]

[১]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৩৫

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ
الْمُجْرِمُوْنَ ﴿۱۷﴾ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا
يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُوْلُوْنَ هٰۤؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ قُلْ اَتُنَبِّـُٔوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا
يَعْلَمُ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۱۸﴾
وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّاۤ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ؕ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ
رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿۱۹﴾ وَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ لَاۤ اُنْزِلَ
عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا ۚ اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ
الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿۲۰﴾

তরজমা

(১৭) সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে? যে আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর আয়াতকে মিথ্যা বলে। নিশ্চয় পাপীষ্ঠরা কখনও সফলকাম হয়না।

(১৮) আর তারা আল্লাহ্ পাক ব্যতীত যার এবাদত করে তা তাদের ক্ষতিও করতে পারেনা এবং উপকারও করতে পারেনা, তারা বলে এগুলো হলো আল্লাহ্ পাকের দরবারে আমাদের সুপারিশকারী। (হে রসূল!) আপনি জিজ্ঞাসা করুন তোমরা কি আল্লাহ্ পাকের আসমান জমিনের এমন কিছুর সংবাদ দেবে যা তিনি জানেন না? তিনি পবিত্র মহান এবং তারা যা কিছুকে শরীক করে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে।

(১৯) মানুষ ছিল একই জাতি, পরে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকলে তারা যে বিষয়ে মতভেদ করে তাদের মধ্যে তার মীমাংসা হয়েই যেত।

(২০) আর তারা বলে তার প্রতিপালকের তরফ থেকে তার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? (হে রসূল!) আপনি বলুন গায়বের কথা শুধু আল্লাহ্ পাকই জানেন। অতএব, তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ কতিপয় মুশরেক এ আবদার করেছিল যে, পবিত্র কোরআন থেকে দেব-দেবীর পূজার সমালোচনা বাদ দিন বা অন্য কোরআন নিয়ে আসুন, এর জবাবে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ পাক নির্দেশ প্রদান করেছেনঃ (হে রসূল!) আপনি মুশরেকদেরকে জানিয়ে দিন যে, কোন নবীর পক্ষেই

আল্লাহ পাকের মহান বাণীতে কোন প্রকার পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। আমার কাজ হলো আল্লাহ পাকের মহান বাণীর অনুসরণ করা। আর এই কোরআন আল্লাহ পাকের তরফ থেকেই নাযিল হয়েছে। আমার পক্ষে অন্য কোন কোরআন পেশ করা সম্ভব নয় কেননা, আমি কেয়ামতের কঠিন দিনের আযাবকে ভয় করি।

আর এ আয়াতে পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যের প্রেক্ষিতেই এরশাদ হয়েছেঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সম্পর্কে কোন মিথ্যা কথা রচনা করে তার চেয়ে বড় জালেম কে হবে? তথা পৃথিবীতে সে সবচেয়ে বড় জালেম, যে কোন কথা রচনা করে আল্লাহ পাকের নামে তা প্রচার করে, যে অন্যায় কাজের প্রস্তাব তোমরা দিয়েছ এ কাজ কোন মহাপাপী এবং জঘন্য অপরাধীর পক্ষেই সম্ভব, আমি আল্লাহর সত্য রসূল, আমার কাছে আল্লাহ পাকের যে ওহী আসে আমি তাই বিশ্ববাসীর সম্মুখে পেশ করি।

اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ

আর যারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করে তথা পবিত্র কোরআন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অমান্য করে তারাও সবচেয়ে বড় জালেম এবং মহাপাপী।

আলোচ্য আয়াতে একথা ঘোষণা করা হলো যে, নিজের রচিত কোন কথাকে আল্লাহর বাণী বলে প্রচার করা এবং আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ ওহীকে অস্বীকার করা উভয়টিই মহাপাপ, এর কঠিন শাস্তি অবধারিত।[১]

আলোচ্য আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) মিথ্যা নবুওয়্যতের দাবীদার কুখ্যাত মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের নিন্দনীয় এবং ঘৃণ্য ভূমিকার উল্লেখ করেছেন। কেননা মুসায়লামাতুল কাজ্জাব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর মিথ্যা নবুওয়্যতের দাবী করেছিল এবং তার নিজের রচিত কথাকে আল্লাহ পাকের নামে প্রচার করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছিল। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) মুসায়লামার কয়েকটি কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যা দেখলে বোঝা যায় আল্লাহ পাকের কালাম হওয়ারতো কোন প্রশ্নই ওঠেনা, এমনকি কোন নির্বোধ লোকও এমন কথা বলবে না যা মুসায়লামাতুল কাজ্জাব বলেছে, যেমন সে বলেছেঃ

الفيل ما الفيل وما ادراك ما الفيل له ذنب قصير وخرطوم طويل

"হাতি, আর হাতি কি? আর তুমি কি জান হাতি কেমন হয়? তার লেজটি খুব ছোট হয় তবে তার শূড়টি বেশ লম্বা হয়"। এ হলো মিথ্যুক মুসায়লামার কথার নমুনা। তাই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করেছেন–

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا

---

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৫৮
তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৩৫
তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-১৭১

সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে হবে? যে আল্লাহ্ পাকের নামে মিথ্যা রচনা করে। জালেম মুসায়লামা এ অপরাধই করেছিল, তাই আল্লাহ্ পাক তাকে অপমানিত করেছেন। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর যুগে ইয়ামামার যুদ্ধে সে নিহত হয়। সে এবং তার সঙ্গীরা অভিশপ্ত হয়।

বর্ণিত আছে অভিশপ্ত মুসায়লামার বিদায়ের পর তার দলের কিছু লোক প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেদমতে তওবা করার জন্য হাযির হয়।

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট তারা ক্ষমাপ্রার্থী হয়। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাদেরকে বলেন, মুসায়লামা যে সব কথাকে ওহী বলে প্রচার করতো সেগুলো শোনাও। তারা প্রথমে ক্ষমাপ্রার্থী হলো। তখন হযরত আবুবকর (রাঃ) বললেনঃ আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ ওহী আমাদের কাছে আছে। মিথ্যুক মুসালায়মার ভেজাল ওহী কেমন তা দেখতে চাই। তাহলে আসল এবং নকলের মধ্যে পার্থক্য ধরা পড়বে। তখন তারা মুসায়লামার কয়েকটি কথা শুনিয়ে দিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) মন্তব্য করলেন, হে বদনসীব লোকের দল! তোমাদের বিবেক বুদ্ধি কোথায় গিয়েছিল? এমন বাজে কথা তো কোন নির্বোধের মুখ থেকেও বেরুবে না।

বর্ণিত আছে যে, বিখ্যাত সাহাবী হযরত আমর এবনুল আস (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মুসায়লামার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, একদিন মুসায়লামা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, "হে আমর! বর্তমানে তোমাদের মানুষটির উপর (হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর) কোন ওহী নাযিল হয়েছে কি?

হযরত আমর এবনুল আস (রাঃ) বললেন, আমি তাঁর সাহাবীগণকে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সংক্ষিপ্ত সূরা পাঠ করতে শুনেছি। মুসায়লামা জিজ্ঞাসা করলো তা কি?

হযরত আমর এবনুল আস (রাঃ) বললেনঃ

وَالْعَصْرِ - اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ

(সময়ের শপথ! নিশ্চয় সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত) দূরাত্মা মুসায়লামা কিছুক্ষণ নীরব রইল, এরপর বললো, আমার নিকটও এমন ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। এবনুল আস (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন তা কি? সে বললো–

يا وبر يا وبر انما انت اذنان وصدر وسائرك حقر ونقر

(হে জন্তু! তোমার কর্ণ এবং সমুন্নত বক্ষ দেখা যায়, তোমার অবশিষ্ট দেহ তো জীর্ণ-শীর্ণ) মুসায়লামা তখন বললো, হে আমর! ওহীটি কেমন?

তখন আমর এবনুল আস (রাঃ) বললেনঃ তোমার ওহী মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। আমর এবনুল আস (রাঃ) একথা তখন বলছিলেন যখন তিনি মুশরেক ছিলেন। একজন মুশরেকই যখন মুসায়লামাকে মিথ্যাবাদী মনে করে তখন অন্যের কথা আর কি বলা যায়! তাই আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا

"সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে হবে? যে আল্লাহ্ পাকের সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করে"।[১]

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ

"নিশ্চয় পাপীষ্ঠরা সফলকাম হবে না"।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) এর ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ মুশরেকরা কোন দিনও নাজাত পাবেনা, আর হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ যারা আল্লাহ্ পাকের সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে বা আল্লাহ্ পাকের আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করে তারা আল্লাহর আযাব থেকে রেহাই পাবেনা। وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক মুশরেকদের মূর্খতা এবং পথভ্রষ্টতার কথা বর্ণনা করেছেন। মুশরেকরা আল্লাহ্ পাক ব্যতীত যে সব বস্তুর এবাদত করে তারা এবাদতকারীদের কোন ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না।

ইমাম রাজী (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ মুশরেকরা লাত মানাত সহ যত দেব-দেবীর পূজা অর্চনা করে সারা জীবন এই দেব-দেবীর পূজা করলেও তারা তাদের পূজারীদের কোন উপকার করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি তারা এ দেব-দেবীর পূজা পরিত্যাগ করে তবুও তারা মুশরেকদের কোন ক্ষতিও করতে পারবে না। অথচ এই কাফের মুশরেকরা ইচ্ছা করলে এ মূর্তিগুলোর পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতে পারে, ইচ্ছা করলে এগুলোকে ভেঙে চুরমারও করে ফেলতে পারে।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, যাদের পূজা করা হচ্ছে তাদের কোন শক্তিই নাই যেহেতু তারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের প্রতি অবিশ্বাস করে, তাঁর অবাধ্য হয়ে এসব কাজ করে, তাই তাদের এ অমার্জনীয় অপরাধের জন্যে কঠিন কঠোর শাস্তি অবধারিত।

وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ

কাফেররা তাদের মূর্তিগুলো সম্পর্কে বলতো, আমরাতো আল্লাহর এবাদত করার যোগ্য নই, তাই এ মূর্তিগুলো আমাদের জন্যে আল্লাহর দরবারে সুপারিশকারী হবে। তাদের এ বাতিল ও ভিত্তিহীন কথার জবাবে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ

(হে রসূল!) আপনি কাফেরদের জিজ্ঞাসা করুন তারা কোন্ দলিলের ভিত্তিতে একথা বলে যে, এ দেব-দেবীরা আল্লাহ্ পাকের দরবারে সুপারিশকারী হবে? তবে কি আল্লাহ্ পাক একথা জানেন না যে আসমানে জমিনে এমন কিছু আছে যা আল্লাহ্ পাকের দরবারে সুপারিশ করবে? এমনতো হতে পারেনা। সারা বিশ্বে এমন কিছু নেই যার সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক অবগত নন। যে কথা এ কাফের মুশরেকরা বলে, যেহেতু তা আল্লাহ্ পাকের এলমে

[১]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১১, পৃষ্ঠা-৪৬-৪৮

নেই তাই তার অস্তিত্বও নেই। তারা যা কিছুকে আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে শরীক করছে তা থেকে তিনি পবিত্র, তিনি মহান, তিনি এসব কিছুর অনেক উর্ধ্বে, তাঁর কোন শরীক নেই, তিনি এক অদ্বিতীয়, লা শরীক আল্লাহ্।

قُلْ اَتُنَبِّـُٔوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ

আসমান জমিনে যা কিছু তিনি জানেন না তোমরা কি তাঁকে সে সম্পর্কে অবগত করতে চাও? এ কথাটিতে কাফেরদের উদ্দেশ্যে একদিকে রয়েছে বিদ্রুপ তারা এমন কথা বলছে সে সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ পাকই জানেন না। দ্বিতীয়ত, এ বাক্যটিতে রয়েছে কাফের মুশরেকদের প্রতি ধমক এবং কঠোর হুশিয়ারী বাণী যে এমন ভিত্তিহীন, অলীক কথাবার্তার জন্যে তাদেরকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে আসমান জমিনের কথা উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাফের মুশরেকরা যে সব বস্তুকে আল্লাহ্র শরীক মনে করে তা কি আসমানের অধিবাসী? নাকি জমিনের? যদি আসমানের অধিবাসী হয় যেমন ফেরেশতা তবে তারাতো আল্লাহ্ পাকেরই অনুগত, হুকুম বরদার। যদি সে বস্তুগুলো জমিনের অধিবাসী হয় যেমন পাথর প্রভৃতি-এসবতো আল্লাহ্ পাকেরই সৃষ্টি, আল্লাহ্র এক আদেশে পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে, আর এক আদেশে সব কিছুর লয় হবে। অতএব, কোন সৃষ্টিই আল্লাহ্ পাকের শরীক হতে পারে না, মানুষের উপাস্যও হতে পারে না।[১]

وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّآ اُمَّةً وَّاحِدَةً

প্রথমে মানুষ একই জাতি ছিল, এরপর তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়, তারা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ সমগ্র মানব জাতি তৌহিদের প্রতি বিশ্বাসী ছিল, ইসলামের খাঁটি অনুসারী ছিল। হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত নূহ (আঃ) পর্যন্ত দশটি যুগ অতিবাহিত হয়েছে। হযরত আদম (আঃ)-এর বংশধররা সত্য দ্বীনের অনুসারী ছিল। এরপর তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়। হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগে লোকেরা মূর্তি পূজা আরম্ভ করে, তখন আল্লাহ্ পাক বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট মানুষকে পথ প্রদর্শনের জন্যে যুগে যুগে নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন, যারা আল্লাহ্র প্রেরিত নবী রসূলগণের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তারা সফলকাম হয়েছেন।

পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত বিধি-নিষেধ অমান্য করেছে, আল্লাহ্র নবীগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে তারা ধ্বংস হয়েছে, এটিই পৃথিবরি ইতিহাস।

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৯০

যদি পূর্ব ঘোষিত একটি কথা না থাকতো তবে যে বিষয়ে কাফেররা মত বিরোধ করে সে সম্পর্কে পৃথিবীতেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যেত, অর্থাৎ এ কাফের মুশরেকদেরকে পৃথিবীতেই ধ্বংস করা হতো। হক্ব ও বাতিল, সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্য করা হতো। কিন্তু আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিনকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্যে নিদৃষ্ট করে দিয়েছেন তাই পৃথিবীতে কাফের মুশরেকদের মূলোৎপাটন করা হয় না।

এজন্যে তারা তাদের মূর্খতা প্রসূত ভুল ধারণা করে যে, আল্লাহ পাক তাদের প্রতি রাজী এবং সন্তুষ্ট রয়েছেন।[১]

"যদি পূর্ব ঘোষিত একটি সিদ্ধান্ত না হতো তবে তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করে তার নিষ্পত্তি অবশ্যই হয়ে যেত"। এ পূর্ব ঘোষিত সিদ্ধান্তটি কি? এ সম্পর্কে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, পূর্ব সিদ্ধান্ত হলো প্রত্যেক উম্মতের জন্যে আল্লাহ পাক একটি সময় নিদৃষ্ট করে দিয়েছেন, সে সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে ধ্বংস করা হবে না।

আর কালবী (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে পৃথিবীতে অবকাশ দেয়ার এবং আযাব দ্বারা সমূলে ধ্বংস না করার ওয়াদা করেছেন। যদি এ ওয়াদা না থাকতো তবে এ উম্মতের কাফের মুশরেকদের উপর আযাব নাযিল হতো এবং তাদেরকে ধ্বংস করা হতো। আর দুনিয়াতেই তাদের মতবিরোধের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যেত।

হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, পূর্ব সিদ্ধান্ত হলো কেয়ামতের পূর্বে দুনিয়াতে নেককারদের সওয়াব এবং বদকারদের আযাবের ফয়সালা করা হবে না। আর দুনিয়াতেই জান্নাত বা দোযখে প্রবেশের সিদ্ধান্তও করা হবে না; বরং এ সিদ্ধান্তের সময় ধার্য করা হয়েছে কেয়ামতের দিন। তাই কাফের মুশরেকদেরকে দুনিয়াতে ধ্বংস করা হয় না।[২]

এ সম্পর্কে আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, যেহেতু আল্লাহ পাক প্রত্যেকটি মানুষের তকদিরে তার রিযক এবং মৃত্যুকাল সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন, তাই কাফের মুশরেকদের কুফরী ও নাফরমানী সত্ত্বেও তাদের সম্পর্কে পূর্বাহ্নে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়না।

পূর্ব ঘোষিত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আল্লামা ওসমানী (রঃ) লিখেছেনঃ এর তাৎপর্য হলো আল্লাহ পাক পৃথিবীকে কর্মক্ষেত্র হিসেবে তৈরী করেছেন, পৃথিবী কর্মফল লাভের বা পরিণাম ভোগের স্থান নয়, তাই অবাধ্য কাফেরদেরকে তাদের চরম নাফরমানী সত্ত্বেও ধ্বংস করা হয় না।[৩]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ কথাটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, যেহেতু আল্লাহ পাক উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে আযাব দ্বারা সমূলে ধ্বংস না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যারা কষ্ট দেয় এমন কাফের মুশরেকদের ব্যাপারে কোন আযাব নাযিল হয় না এবং তাদেরকে ধ্বংস করা হয় না।[৪]

---

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৫৫

[২]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৯১

[৩]। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-২৭১

[৪]। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-১৭১

وَيَقُوْلُوْنَ لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ

মক্কার কাফের মুশরেকেরা বলতো, আমরা যে মোজেযা বা নিদর্শন দেখতে চাই তা কেন নাযিল হয় না? মূলতঃ বিশ্বনবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূতঃ পবিত্র জীবন, তাঁর প্রতিটি কথা এবং কাজ নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর, অলৌকিক, মোজেযা, মহান আদর্শ, অতুলনীয়, চিরস্মরণীয়, চির অনুকরণীয়। অবশ্য তা বুদ্ধিমান এবং ভাগ্যবান লোকদের জন্যে।

কিন্তু যারা নির্বোধ, যারা হতভাগা তারা প্রত্যহ নতুন নতুন মোজেযা দেখেও দেখেনা, শুনেও শোনে না। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনেনা, এসব হতভাগা লোকেরা কোন সময় বলেছে অমুক পাহাড় স্বর্ণে রূপান্তরিত হোক কখনও বলেছে, আসমান থেকে খাবার আসুক। যদি তারা সত্য-সন্ধানী হতো, যদি তারা পরিণামদর্শী ও কল্যাণকামী হতো তবে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যেমন নিদর্শন এসেছিল এবং যে সব মোযেজা তারা দেখেছিল তার উপর ঈমান আনতো।

فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ

কেন তাদের ফরমায়েশী মোজেযা দেখানো হয়নি তা একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন। কোথায় কি ধরণের মোজেযা প্রদর্শন করা প্রয়োজন তা আল্লাহ পাকই জানেন। মোজেযা প্রকাশের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আল্লাহ পাকের, এতে আমার কোন হাত নেই।

فَانْتَظِرُوْا

অতএব, তোমরা অপেক্ষা কর। তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে আল্লাহ পাক যে মীমাংসা করবেন তার অপেক্ষা কর। কে সত্যের উপর রয়েছে, আর কে অসত্য-পন্থী হয়েছে তা তোমরা জানতে পারবে। তাই অপেক্ষা কর–

اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ

নিশ্চয় আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করে দেখি। যে সব মোজেযা ইতিপূর্বে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এসেছে সেগুলো তোমরা অবিশ্বাস করেছ, নতুন মোজেযা প্রদর্শনের ফরমায়েশ করেছ, এ পর্যায়ে তোমাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা জানার জন্যে আমিও অপেক্ষা করছি।

وَ اِذَآ اَذَقۡنَا النَّاسَ رَحۡمَۃً مِّنۡۢ بَعۡدِ ضَرَّآءَ مَسَّتۡہُمۡ اِذَا لَہُمۡ
مَّکۡرٌ فِیۡۤ اٰیَاتِنَا ؕ قُلِ اللّٰہُ اَسۡرَعُ مَکۡرًا ؕ اِنَّ رُسُلَنَا یَکۡتُبُوۡنَ مَا
تَمۡکُرُوۡنَ ﴿۲۱﴾ ہُوَ الَّذِیۡ یُسَیِّرُکُمۡ فِی الۡبَرِّ وَ الۡبَحۡرِ ؕ حَتّٰۤی اِذَا
کُنۡتُمۡ فِی الۡفُلۡکِ ۚ وَ جَرَیۡنَ بِہِمۡ بِرِیۡحٍ طَیِّبَۃٍ وَّ فَرِحُوۡا بِہَا جَآءَتۡہَا
رِیۡحٌ عَاصِفٌ وَّ جَآءَہُمُ الۡمَوۡجُ مِنۡ کُلِّ مَکَانٍ وَّ ظَنُّوۡۤا اَنَّہُمۡ اُحِیۡطَ
بِہِمۡ ۙ دَعَوُا اللّٰہَ مُخۡلِصِیۡنَ لَہُ الدِّیۡنَ ۬ۚ لَئِنۡ اَنۡجَیۡتَنَا مِنۡ ہٰذِہٖ
لَنَکُوۡنَنَّ مِنَ الشّٰکِرِیۡنَ ﴿۲۲﴾

তরজমা

(২১) আর আমি যখন মানুষকে তাদের উপর বিপদ আপতিত হওয়ার পর আমার রহমতের স্বাদ ভোগ করার সুযোগ দেই তখনই তারা আমার নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে ফন্দি আটতে শুরু করে। (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, আল্লাহ পাক সর্বাপেক্ষা দ্রুততর ফন্দি করতে পারেন। আমার ফেরেশতাগণ তোমাদের ফন্দিবাজী লিপিবদ্ধ করে রাখে।

(২২) তিনিই তোমাদেরকে প্রান্তরে এবং সাগরে ভ্রমণ করান, অবশেষে যখন তোমরা নৌকায় আরোহী হও এবং উত্তম বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে এবং আরোহীরা আনন্দ বোধ করে তখন নৌকার উপরে আসে ঝড়, সব দিক থেকে আসে তরঙ্গ, আর তারা তখন উপলব্ধি করে যে, তারা ঘেরাও হয়ে পড়েছে। তখন তারা আল্লাহ পাককে ডাকে আন্তরিক ভাবে (এবং বলে) যদি আমাদেরকে তুমি রক্ষা কর তবে আমরা তোমার চির কৃতজ্ঞ থাকবো।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

একবার মক্কাবাসী দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত হয়। অবশেষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে তারা আরজী পেশ করে, আল্লাহ পাকের দরবারে আমাদের জন্যে দোয়া করুন। যদি দুর্ভিক্ষের বিপদ কেটে যায় তবে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনবো এবং আল্লাহ পাকের শোকর গুজার থাকবো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের জন্যে দোয়া করলেন। তখন আল্লাহ পাক দুর্ভিক্ষ দূরীভূত করে দিলেন। বিপদ থেকে মুক্তি লাভের পরই তারা পুনরায় আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হলো, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, মক্কার কাফেররা যখন মুসলমানদের প্রতি চরম জুলুম অত্যাচার করতে থাকে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতায় মত্ত হয়, এমনকি আল্লাহ্ পাকের পাক কালামের প্রতিও বিদ্রুপ করতে থাকে তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের দরবারে মক্কাবাসীদের সম্পর্কে এভাবে আরজী পেশ করলেন– হে আল্লাহ! ইউসুফ (আঃ)-এর সাত বছরের ন্যায় মক্কাবাসীদেরও সাত বছর যাবত দুর্ভিক্ষের শাস্তি দিয়ে আমাকে সাহায্য কর। পরিণামে আল্লাহ্ পাক মক্কাবাসীর প্রতি দুর্ভিক্ষের আযাব নাযিল করলেন। এমন দুর্ভিক্ষ হলো যে, ক্ষুধার্ত মানুষ মৃত জন্তুর গোশ্ত খেতেও বাধ্য হলো। এ দুর্ভিক্ষ সাত বছর পর্যন্ত অব্যাহত রইল।

তখন মক্কাবাসীর পক্ষ থেকে আবু সুফিয়ান প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করলোঃ হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনার সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গেছে। আপনি তো আল্লাহর প্রতি আনুগত্য এবং আত্মীয়-স্বজনের সহায়তা করার আদেশ দিয়ে থাকেন। আল্লাহ্ পাকের নিকট দোয়া করুন যেন তিনি আমাদের এ বিপদ দূর করে দেন। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন। তখন আল্লাহ্ পাক দুর্ভিক্ষের আযাব দূর করে দিলেন। কিন্তু এরপরও তারা পুনরায় আল্লাহ্ পাকের সাথে শেরক করলো, ইসলামের বিরোধিতা করলো, শত্রুতা করলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে। অবশেষে তাদের শাস্তি হয় বদরের যুদ্ধের দিন।[১]

وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ

অর্থাৎ আমি যখন মানুষকে বিপদগ্রস্ত হওয়ার পর তাদেরকে রহমতের স্বাদ ভোগ করার সুযোগ দিয়ে থাকি তখন তারা আমার আয়াত সমূহের ব্যাপারে চক্রান্তে লিপ্ত হয়। "আয়াত সমূহের ব্যাপারে চক্রান্তে লিপ্ত হওয়ার" ব্যাখ্যায় মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করা, আল্লাহর আয়াত সমূহের বিদ্রুপ করা।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, "মকর" শব্দটির অর্থ হলো গোপনে কারো ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করা। আল্লাহ্ পাকের আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করার অর্থ হলো হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অবিশ্বাস করা এবং তাঁর ক্ষতি সাধনের অপচেষ্টা করা। যেহেতু আল্লাহর আয়াত সমূহ আল্লাহ পাকেরই কালাম তাই তাদের চক্রান্ত প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাকেরই বিরুদ্ধে, তাই তাদের ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে পরবর্তী বাক্যে।

قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا

---

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৬৫
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৯২

(হে রসূল!) আপনি বলে দিন, গোপন তদ্বীর করার ব্যাপারে আল্লাহ পাক অত্যন্ত দ্রুততর। অর্থাৎ তোমরা যত ইচ্ছা চক্রান্ত করতে থাক, ফন্দি কৌশল অবলম্বন করতে থাক, আল্লাহ পাকের কৌশল অনেক দ্রুত এবং অনেক মজবুত।

إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ

নিশ্চয় আমার ফেরেশতাগণ লিপিবদ্ধ করছে তাদের যাবতীয় কার্যক্রম। অতএব, তাদের সকল নিন্দনীয় আচরণ সম্পর্কে ফেরেশতাগণও অবগত। এমন অবস্থায় আল্লাহ পাকের নিকট তাদের নিন্দনীয় আচরণ কি করে গোপন থাকবে? মূলতঃ আল্লাহ পাক কাফেরদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু এ অবকাশে পাপীষ্ঠরা তাদের অন্যায়ের ঘট পূর্ণ করে নেয়। এরপর আপতিত হয় তাদের উপর বিপদ। এজন্যে হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক যাকে আর্থিক স্বচ্ছলতা দান করেন তার কর্তব্য হলে একথা চিন্তা না করা যে, আল্লাহর তরফ থেকে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে বরং তার কর্তব্য হলো সতর্কতা অবলম্বন করা এবং আত্ম সংশোধনের মাধ্যমে আল্লাহর আযাব থেকে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হওয়া। কেননা বর্তমান আর্থিক সমৃদ্ধি এবং লব্ধ নেয়ামত ও সম্পদের কারণে মানুষ যা কিছু করে তা ফেরেশতাগণ অক্ষরে অক্ষরে লিপিবদ্ধ করে রাখে। তাই যখন তাদের অন্যায়ের ঘট পূর্ণ হয়ে যায় তখন আল্লাহ পাক তাদেরকে চিরতরে ধ্বংস করে দেন।

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

(আল্লাহ পাকই প্রান্তরে এবং সাগরে তোমাদেরকে ভ্রমণ করতে দেন) পূর্ববর্তী আয়াতে তৌহিদের বর্ণনা ছিল। এ আয়াতেও দলিল প্রমাণসহ তৌহিদের কথাই রয়েছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, মানুষ যখন তরীতে আরোহন করে সমুদ্রে সফর করে তখন সে দেখতে পায় আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ, আল্লাহ পাকই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই রিযিকদাতা, আর তিনিই রক্ষাকর্তা, তিনি রক্ষা করলে কেউ ধ্বংস করতে পারে না, মানুষ এ সত্য উপলব্ধি করে জীবন-সংগ্রামের বিভিন্ন অবস্থায়।

এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রঃ) একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। হযরত জাফর সাদেক (রঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রমাণ জানতে চাইল।

হযরত জাফর সাদেক (রাঃ) ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কাজ কর? সে বললোঃ আমি ব্যবসা করি। সমুদ্র পথেই অনেক সময় আমাকে ব্যবসায়ের ব্যাপারে আসা-যাওয়া করতে হয়।

তখন হযরত জাফর সাদেক (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার জীবনে কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে কি? যখন তোমার তরী নিমজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। সে বললোঃ জ্বী-হ্যাঁ হয়েছিল।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি তখন কি করেছিলে?

সে বললোঃ যখন উপলব্ধি করলাম সমুদ্র বক্ষে আমাদের সলিল সমাধি ঘটতে যাচ্ছে, প্রাণ রক্ষার আর কোন উপায় নেই এমন অবস্থায় অত্যন্ত বিনীতভাবে স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের দরবারে কান্নাকাটি করে প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিলাম। তখন হযরত জাফর (রাঃ) বলেছিলেনঃ তিনিই এক আল্লাহ পাক যাঁর নিকট তুমি সেদিন অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় দোয়া করেছিলে এবং তিনি তোমাকে রক্ষা করেছিলেন।[১]

তফসীরকারগণ এমনি আরো একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চির দুশমন আবু জেহেল নিহত হয় ২য় হিজরীতে অনুষ্ঠিত বদরের যুদ্ধে। তার পুত্র ইকরামা অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময় পলায়ন করে সমুদ্র যাত্রা করে। ঘটনাক্রমে সমুদ্রে ঝড় ওঠে। ঐ ঝড়ের কারণে জাহাজের সকল আরোহী অত্যন্ত বিপন্ন এবং অসহায় হয়ে পড়ে। তখন জাহাজের চালক যাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলে, তোমরা সকলে এক অদ্বিতীয় আল্লাহ পাককে ডাক। এ মহাবিপদ থেকে শুধু তিনিই তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারেন, আর কেউ নয়। তোমাদের দেব-দেবী এই কঠিন মুহূর্তে সাহায্য করতে আসবে না।

অতএব, তোমরা শুধু এক আল্লাহকে ডাক, তাঁর নিকট আশ্রয় চাও। নাবিকের একথা শ্রবণ করে ইকরামা বললোঃ তিনিই সেই আল্লাহ! যাঁর প্রতি ঈমান আনয়নের জন্যে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে আহ্বান করেছেন। অথচ সে আহ্বানে সাড়া না দিয়ে আমরা পলায়ন করেছি এবং বিপদগ্রস্ত হয়েছি। যদি মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) খোদা ব্যতীত এ সমুদ্র বক্ষে আমাদেরকে কেউ রক্ষা করতে না পারে তবে ডাঙ্গায় উঠলেও আমাদেরকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

ইকরামা তখন আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করে বলে, হে আল্লাহ! যদি তুমি এ বিপদ থেকে রক্ষা কর তবে আমি অবশ্যই মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) হাতে ইসলাম গ্রহণ করবো। আমি বিশ্বাস করি যে, তিনি আমাকে মাফ করবেন। আল্লাহ পাক ইকরামাকে রক্ষা করেছিলেন এবং তিনি অবশেষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।[২]

মূলতঃ আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়টিই এরশাদ হয়েছে... هُوَ الَّذِىْ "তিনিই সেই আল্লাহ পাক যিনি তোমাদেরকে প্রান্তরে এবং সাগরে ভ্রমণের সুযোগ দান করেন"।

حَتّٰۤى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ

তোমরা যখন সমুদ্র পথে তরীতে আরোহন করে ভ্রমণ কর তখন অত্যন্ত মনোরম বাতাস বইতে থাকে, সমুদ্র বক্ষে ভ্রমণকারীরা আনন্দ বোধ করে, সমুদ্রের ঢেউ কেটে তরী এগিয়ে চলে মুসাফিরদেরকে নিয়ে। কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যেই তাদের আনন্দ বিদায় নেয়,

---

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৬৭-৬৮
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৫৮

[২]। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-২৭২
তফসীরে রুহুল মা'আনী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৯৭

কেননা, তখন সমুদ্রে ঝড় ওঠে। উত্তাল তরঙ্গ আঘাত হানতে থাকে ক্ষুদ্র তরীটির উপর মনে হয় ক্ষণিকের মধ্যেই তা নিমজ্জিত হবে। যাত্রীরা তখন হয় অত্যন্ত অসহায়, তারা প্রমাদ গুণতে থাকে যে, মৃত্যু তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলেছে। তরঙ্গের যে কোন নিষ্ঠুর আঘাত তাদের প্রাণ কেড়ে নেবে ক্ষণিকের মধ্যেই, তখন তারা চরম বিপদগ্রস্ত, অসহায়, নিরুপায়। তাই অবশেষে শেষ রক্ষার জন্যে তারা ডাকতে শুরু করে এক আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীনকে, তখন ক্ষণিকের জন্যেও তাদের দেব-দেবীর কথা মনে পড়ে না।

دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

আল্লাহ্ পাককে ডাক একনিষ্ঠভাবে, একাগ্র চিত্তে, তখন তারা বলে–

لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ

(হে আল্লাহ্! যদি তুমি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে রক্ষা কর তবে আমরা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো এবং তোমার কৃতজ্ঞ বন্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবো) তফসীরকারগণ লিখেছেন, এমন বিপদগ্রস্ত অবস্থায় যারা দোয়া করে তাদের বিপদ মুক্তির জন্যে তারা উপকৃত হতে পারে। কিন্তু আখেরাতের নাজাতের জন্যে এমন কথা যথেষ্ট নয়। কেননা এ দোয়া আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমানের কারণে নয়; বরং অত্যন্ত চরম বিপদ মুহূর্তে প্রাণ রক্ষার তাগিদে করা হয়ে থাকে।

ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ লিখেছেন, শর্তসাপেক্ষে বিশ্বাস শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন যদি কেউ বলে– "যদি আমার অমুক কাজটি হয়ে যায় তবে আমি ঈমান আনবো"। শরীয়তে এমন ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়।[১]

[১]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৩৭
খোলাসাতুত্তাফাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩১৯

فَلَمَّآ اَنْجٰىهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ يٰۤاَيُّهَا
النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ ۙ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۫ ثُمَّ
اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٣﴾ اِنَّمَا مَثَلُ
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ
الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ ؕ حَتّٰۤى اِذَآ اَخَذَتِ الْاَرْضُ
زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَآ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ ۙ اَتٰىهَآ اَمْرُنَا
لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ ؕ كَذٰلِكَ
نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ
السَّلٰمِ ؕ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٥﴾

তরজমা

(২৩) অতঃপর যখন আল্লাহ্ পাক তাদেরকে বিপদ মুক্ত করেন, তখনই তারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে দৌরাত্ম শুরু করে। হে মানুষ! তোমাদের দৌরাত্ম মূলতঃ তোমাদেরই উপর, দুনিয়ার জীবনের সুখ ভোগ করে লও, এরপর তোমাদেরকে আমার নিকট ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত করবো।

(২৪) দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন আমি আসমান থেকে বারি বর্ষণ করি, ফলে জমিনে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় তাতে মিশে, যা মানুষ ও জীব-জন্তু খেয়ে থাকে, এরপর যখন ভূমি সৌন্দর্য ধারণ করে ও নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখা যায় এবং জমির মালিকগণ মনে করে যে তা তাদের আয়ত্তে এসেছে তখন আমার আদেশ উপস্থিত হয় রাতে কি দিনে এবং তাকে আমি এমনভাবে নির্মুল করে দেই যেন ইতিপূর্বে তার কোন অস্তিত্বই ছিল না। এভাবেই আমি আমার নিদর্শন সমূহ বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করি, সে সব লোকদের জন্যে যারা চিন্তাশীল।

(২৫) আর আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে ডাকেন শান্তির ঘরের দিকে এবং তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে সঠিক পথের দিকে হেদায়েত করেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, মানুষ যখন সামুদ্রিক সফরে ঝড়ের কারণে বিপদগ্রস্ত হয় তখন অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় আল্লাহ্ পাকের দরবারে মিনতি প্রকাশ করে এই আরজী পেশ করে– "হে আল্লাহ্! যদি তুমি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে রক্ষা কর তবে আমরা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো"। আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে–

فَلَمَّآ اَنْجٰهُمْ

যখন আল্লাহ্ পাক তাদের দোয়া কবুল করেন এবং তাদেরকে মহা বিপদ থেকে রক্ষা করেন তখন তারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, জুলুম অত্যাচার এবং দৌরাত্ম শুরু করে। ইতিপূর্বে তারা যে বিপদে পতিত হয়েছিল এবং অনন্যোপায় হয়ে আল্লাহ পাকের আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারের অঙ্গীকার করেছিল তা তারা বেমালুম ভুলে যায়। অথচ তাদের তরী যখন সমুদ্র বক্ষে নিমজ্জিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল তখন তারা একাগ্র চিত্তে একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহ্ পাকের বন্দেগী করার অঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু যখনই তারা বিপদ-মুক্ত হলো তখনই পুনরায় দৌরাত্ম শুরু করলো। আল্লাহ্ পাক তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ

হে মানব জাতি! তোমাদের জুলুম অত্যাচার এবং দৌরাত্মের শোচনীয় পরিণাম তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে। মন্দ কাজের পরিণাম অবশ্যই মন্দ হবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এবং তিরমিজী ও এবনে মাজা শরীফে সংকলিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার এবং আত্মীয়-স্বজনের উপকারের শুভ পরিণতি অন্য সকল কল্যাণকর কাজের চেয়ে দ্রুত লাভ করা যায়।

পক্ষান্তরে, জুলুম অত্যাচার এবং আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ করার পরিণাম অন্য যে কোন মন্দ কাজের কুফলের পূর্বে পরিলক্ষিত হয়।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তিনটি কাজের পরিণতি যে কাজ করে তার নিকট ফিরে যায়। যথা জুলুম অত্যাচার, প্রতারণা, দাগাবাজী।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি কোন পাহাড় অন্য পাহাড়ের প্রতি জুলুম করে তবে জালেম পাহাড় ফেটে খন্ড খন্ড হয়ে যাবে।

অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা অত্যাচার করোনা, তোমাদের দোয়া কবুল হবে না।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেনঃ মজলুমের বদ দোয়া অবশ্যই কবুল হয়, যদিও সে গুনাহগার হয়। আর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, এমনকি মজলুম যদি কাফেরও হয় তবুও তার ফরিয়াদ কবুল হয়।

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ এমন লোকের উপর আমার ক্রোধ অত্যন্ত বেশী হয় যে এমন ব্যক্তির উপর জুলুম অত্যাচার করে যার আমি ব্যতীত কোন সাহায্যকারী নাই।

আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুলুম অত্যাচার সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ করেছেনঃ যে জমিনের অধিবাসীদের প্রতি দয়া করেনা আসমানে যিনি আছেন (অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক) তিনিও তার প্রতি দয়া করেন না।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ এক ঘন্টা অত্যাচার করা ষাট বছরের অপরাধকেও হার মানায়।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সমগ্র সৃষ্টি জগতে অত্যাচারী শাসকরাই হলো আল্লাহর বড় শত্রু। (তিরমিজি শরীফ)

হযরত আবু তালহা এবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ অত্যাচারী শাসকের নামায কবুল হয়না।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তিনি ব্যক্তির কলেমা কবুল হয় না, যে শাসনকর্তা জনগণের ওপর অত্যাচার করে সে তাদের অন্যতম।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি বিবাদ-বিসম্বাদের ক্ষেত্রে সুবিচার করেনা অবিচার (তথা জুলুম অত্যাচার করে), তার প্রতি আল্লাহ পাকের ফেরেশতাদের এবং সমগ্র মানব জাতির লা'নত পতিত হয়।

হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ এ পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি যদি মাত্র দশ জনেরও নেতৃত্ব করে থাকে তবে তাকে কেয়ামতের দিন হাত পা বাঁধা অবস্থায় আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির করা হবে। যদি তার পূণ্য থাকে তবে তা তাকে মুক্ত করে নেবে। অন্যথায় পাপ তাকে ধ্বংস করে দেবে। নেতৃত্বের শুরু হলো লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে, মাঝখানে অসহ্য গঞ্জনা, আর শেষ পরিণতিতে কেয়ামতের দিনের অপমান এবং দোযখের কষ্টদায়ক শাস্তি।

(আহমদ)

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যত দিন কোরায়শগণ দয়া প্রার্থীর প্রতি দয়া করবে, বিচার প্রার্থীর প্রতি সুবিচার করবে ততদিন তারা নেতৃত্ব করার (তথা শাসনকার্য পরিচালনা করার) উপযুক্ত থাকবে এবং তাদের মধ্যে খেলাফত ও নেতৃত্ব অব্যাহত থাকবে।

পক্ষান্তরে, যখন তারা দয়া ও সুবিচার পরিত্যাগ করবে তখন তাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের ও ফেরেশতাদের লা'নত পতিত হবে (এই হাদীসে যদিও কোরায়শের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু এ সতর্কবাণী সমগ্র মুসলিম জাতির জন্যে)।

বস্তুতঃ মানুষ যখন পথভ্রষ্ট ও লক্ষ্যচ্যুত হয়, মানুষের জীবন যখন কলুষিত, কলংকিত এবং অভিশপ্ত হয় তখনই সে জুলুম অত্যাচার, অন্যায় অবিচারে লিপ্ত হয়। ন্যায় বিচার বা সুবিচারের পথ রুদ্ধ করে দেয়।

যুগে যুগে এ পৃথিবীতে যে সব সম্প্রদায় জুলুম অত্যাচারে লিপ্ত হয়েছে এবং তার শোচনীয় পরিণাম স্বরূপ এ পৃথিবীর বুক থেকে তারা চির বিদায় গ্রহণ করেছে, তাদের শিক্ষামূলক ঘটনাবলী বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলে ধরেছে পবিত্র কোরআন। যেমন আদ জাতি, সামুদ জাতি, হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতি-এরা সকলেই অন্যায় অত্যাচার-জুলুম অবিচারে লিপ্ত হয়েছিল, তাই তারা নিক্ষিপ্ত হয়েছে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে, আল্লাহর কোপগ্রস্ত হয়ে এ পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেছে। সামুদ জাতিকে মাটির চাপে নিস্পেষিত করা হয়। আদ জাতি বাতাসের প্রবল আক্রমণে উড়ে যায় এবং হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতি এক প্রলয়ংকরী বন্যায় প্লাবিত এবং ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এমনিভাবে তাদের অন্যায় অবিচারের অবসান ঘটে।

পবিত্র কোরআনের ঘোষণা ঃ "আল্লাহ্ পাক অত্যাচারী লোকদেরকে আদৌ পছন্দ করেন না, তিনি জালেমদেরকে বরদাস্ত করেন না"।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া করেনা, আল্লাহ্ পাকও তার প্রতি দয়া করেন না।

হযরত আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির প্রতি দয়া না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত খাঁটি মোমেন হতে পারবে না।

উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম বিনীতভাবে নিবেদন করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমরা তো সকলের প্রতি দয়া করি, এর জবাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আরাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ তোমরা শুধু বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের প্রতিই দয়া মায়া প্রদর্শন কর, আমি এর কথা বলছি না; বরং আমি যে দয়া মায়ার কথা বলছি যার সম্পর্ক সমগ্র সৃষ্টি জগতের সাথে।

আরও একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ করেছেনঃ তোমরা মজলুমের বদ দোয়া থেকে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা কর, কেননা তা কবুল হতে কোন বাধা-বিপত্তি থাকে না। আর হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ আমি মজলুমের বদ দোয়াকে ফেরত দেইনা, এমনকি সে যদি কাফেরও হয় (তবু তার ফরিয়াদ কবুল হয়)।

অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অহংকারী জালেমদের শোচনীয় পরিণামের কথা ঘোষণা করে এরশাদ করেছেনঃ প্রতিপত্তিশালী অহংকারী জালেমদের কেয়ামতের মাঠে এমন অবস্থায় উঠানো হবে যে তাদের আকৃতি থাকবে মানুষের, কিন্তু তারা সেদিন এত শক্তিহীন ও অসহায় থাকবে যে, মানুষ তাদেরকে পিপিলিকার ন্যায় পদ দলিত করবে। সকলের সম্মুখে তাদেরকে এমনিভাবে অপমানিত

করে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে তাদের চতুর্দিকে সর্বাপেক্ষা অধিক তেজস্বী অগ্নি প্রজ্বলিত থাকবে। তাদের এই কারাগারের নাম হবে "বুলছ"। দোযখবাসীদের দেহ থেকে নিঃসৃত রক্ত, পূঁজ তাদেরকে পান করার জন্যে দেয়া হবে। (তিরমিজি শরীফ)

মূলতঃ এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغۡيُكُمۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ

"হে মানব জাতি! তোমাদের জুলুম অত্যাচার এবং দৌরাত্মের ভয়াবহ পরিণাম তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে"।

مَّتَٰعَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا

দুনিয়ার এ জীবন ক্ষণস্থায়ী, অবশেষে এর অবসান ঘটবে মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধানের মাধ্যমে।

ثُمَّ إِلَيۡنَا مَرۡجِعُكُمۡ

এরপর তোমাদেরকে আমার নিকটই ফিরে আসতে হবে এবং জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব দিতে হবে।

فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

এরপর তোমাদের কৃতকর্মের বিনিময় প্রদানের মাধ্যমে তোমাদেরকে আমি অবগত করবো তোমরা পৃথিবীতে কি করেছিলে।

إِنَّمَا مَثَلُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا

মানুষ এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের লোভে-মোহে মুগ্ধ মত্ত থাকে এবং আল্লাহর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, পূর্ববর্তী আয়াতে মানুষের এমন নাফরমানীর বিবরণ ছিল।

আলোচ্য আয়াতে দুনিয়ার এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনের একটি অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। পৃথিবীতে অশান্তি যে লোভ-লালসার কারণে হয় তার সঠিক তাৎপর্য উপলব্ধি করার এবং এ পার্থিব জীবনের প্রকৃত রূপ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ রয়েছে এ দৃষ্টান্তে। দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকে দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে পানি এবং মাটির সাথে, যেভাবে জমিনে বৃষ্টিপাত হয়, ফলে ফসল উৎপন্ন হয়, কৃষকরা তাদের মেহনতের ফসল দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়। যখন ফসল পেঁকে ওঠে এবং কৃষক তার নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে, তার দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হয়। কেননা, সে উপলব্ধি করে জমিনের ফসল তার ঘরে আসবে, সে দেখবে সুদিনের মুখ। কিন্তু এরই মধ্যে হঠাৎ বিপদ আসে, ফসল বন্যায় ভেসে যায়। ঝড় তুফানে বা শিলা বৃষ্টিতে বিনষ্ট হয়ে যায় অথবা পঙ্গপালের আক্রমণে সবই শেষ হয়ে যায়। সমস্ত ফসল এভাবে ধ্বংস হয় যে, মনে হয় এখানে কোন দিনও কিছু ছিল না, তখন আক্ষেপ করা ব্যতীত আর কিছুই করার থাকেনা।

এমনি অবস্থাই হলো মানব জীবনের, শুক্র হলো পানির ন্যায়। মায়ের উদর হলো জমিনের ন্যায়। পিতার শুক্র যখন মায়ের উদরে প্রবেশ করে তখন আল্লাহর হুকুমে এবং কুদরতে সন্তান সৃষ্টি হয়। এরপর সে বড় হয়। তার শৈশব, কৈশোর এবং যৌবন দেখতে দেখতেই অতিবাহিত হয়। সে ধরাকে শরা জ্ঞান করে। এ জীবনকে চিরস্থায়ী মনে করে। এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনকে চিরস্থায়ী মনে করে এখানে আনন্দ উল্লাসে মুগ্ধ মত্ত হয়ে থাকে। অবশেষে হঠাৎ একদিন মৃত্যুর নিষ্ঠুর আঘাতে সে এই পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করে। যা কিছু সে এ জীবনে আহরণ করেছিল তার সবই এখানে রেখে যায়। যেহেতু পর জীবনের জন্যে সে কোন সম্বল সঞ্চয় করেনি, তাই তখন আক্ষেপ ব্যতীত আর কিছুই করার থাকে না। নির্বোধ লোকেরা এভাবেই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে। অতএব, যে জীবন চিরস্থায়ী, তাকে ভুলে গিয়ে ক্ষণস্থায়ী জীবনের আনন্দ উল্লাসে মত্ত থাকা নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য আয়াতে প্রদত্ত দৃষ্টান্তটির এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যেভাবে মাটিতে বৃষ্টিপাত হয় এবং মাটির সঙ্গে পানি মিশ্রিত হওয়ার ফলে তাতে উদ্ভিদ ও রকমারী ফল ফুলের গাছ উৎপন্ন হয়। ঠিক তেমনি মানুষের মাটির দেহে পানির ন্যায় রুহ বা আত্মার প্রবেশ ঘটে। আত্মা এবং দেহের সংমিশ্রণেই হয় মানুষ। সে যাবতীয় গুণাবলী অর্জন করে দুনিয়ার লাভ লোভে আকৃষ্ট হয়, সম্পদ ও শক্তি অর্জন করে নিশ্চিন্ত হয়। এমনি সময় হঠাৎ মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধান কার্যকর হয়। তাকে সমাধিস্থ করা হয়। সে পৃথিবী থেকে এভাবে বিদায় গ্রহণ করে যেন সে কোন দিন এখানে ছিলনা। এ হলো মানব জীবনের প্রকৃত অবস্থা।

كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"আর এভাবেই আল্লাহ্ পাক বিস্তারিতভাবে আয়াত সমূহ বর্ণনা করেন সেই সম্প্রদায়ের জন্যে যারা চিন্তা ও গবেষণা করে"।

অতএব, পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহের মর্মকথায় চিন্তা করা এবং এর তাৎপর্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হওয়া এবং পবিত্র কোরআনে বর্ণিত দৃষ্টান্ত সমূহের উপর চিন্তা করে যথা কর্তব্য স্থির করা বুদ্ধিমান মাত্রেরই কর্তব্য। ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়ার দৃষ্টান্ত পেশ করার পর আলোচ্য আয়াতে চিরস্থায়ী শান্তির কেন্দ্র জান্নাত লাভের জন্যে অনুপ্রাণিত করে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ

"এবং আল্লাহ্ পাক শান্তি ও নিরাপত্তার ঘরের দিকে আহ্বান জানান, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে সুপথ দেখান"।

আল্লামা আলুসী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ্ পাক সমগ্র মানব জাতিকে জান্নাত হাসিলের জন্যে সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। জান্নাতকে "দারুস সালাম" বলা হয়েছে এজন্যে যে, জান্নাতের অধিবাসীগণ সর্বপ্রকার অশান্তি-অকল্যাণ, দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা থেকে নিরাপত্তা লাভ করবেন। সেখানে থাকবে শান্তি আর শান্তি। আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে জান্নাতবাসীগণ শান্তি এবং নিরাপত্তার সুসংবাদ শ্রবণ করবেন।

ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন, "আস্ সালাম" শব্দটি আল্লাহ্ পাকের একখানি নাম। অতএব, এর অর্থ হবে জান্নাত আল্লাহর ঘর, সে ঘরের দিকে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে আহ্বান করছেন।

হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিদ্রিত ছিলেন। তখন তাঁর নিকট কয়েকজন ফেরেশতা আসলেন, তারা একে অন্যকে বললেন, তোমাদের এই সাথীর একটি বিশেষ অবস্থা রয়েছে তা দৃষ্টান্ত দিয়ে বর্ণনা কর। একজন ফেরেশতা বললেন, তিনি নিদ্রিত আছেন।

দ্বিতীয় ফেরেশতা বললেন, তাঁর নয়ন নিদ্রিত, অন্তর জাগ্রত। এরপর ফেরেশতাগণ বললেন, তাঁর দৃষ্টান্ত হলো এমন, যেমন কোন ব্যক্তি একটি বাড়ী নির্মাণ করলো। (মেহমানদের খাবারের জন্যে) দস্তরখান বিছানো হলো এবং মানুষকে দাওয়াত দেয়ার জন্যে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করলো। যারা দাওয়াত কবুল করলো তারা সে বাড়ীতে আসলো এবং দস্তরখানে বসে আহার করলো। আর যে দাওয়াত গ্রহণ করলো না সে ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করলো না এবং দস্তরখান থেকেও কিছু আহার করলো না।

অন্য একজন ফেরেশতা বললো, এ দৃষ্টান্তকে ব্যাখ্যা কর যাতে করে তিনি বুঝতে পারেন। তখন একজন ফেরেশতা বললো, তিনি এখন নিদ্রিত আছেন, আরেকজন বললো; তাঁর চক্ষু নিদ্রিত কিন্তু অন্তর জাগ্রত। তখন ফেরেশতারা বললো দৃষ্টান্তটির ব্যাখ্যা হলো এই-বাড়ী হলো জান্নাত, আর যিনি মানুষকে সে বাড়ীতে আহ্বান করছেন তিনি হলেন স্বয়ং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। যে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা মেনে চললো সে আল্লাহ্ পাকের অনুগত হলো আর যে তাঁর কথা অমান্য করলো সে আল্লাহর অবাধ্য হলো। মানুষের মধ্যে বিভিন্ন দল রয়েছে। (বোখারী শরীফ)

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের "সালাম" শব্দটি ইসলামী সালাম অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু জান্নাতবাসীগণ একে অন্যকে সালাম দেবেন, আর ফেরেশতাগণও তাদেরকে সালাম দেবেন। তাই জান্নাতকে দারুস সালাম বলা হয়েছে।[১]

তফসীরকারগণ লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী বাসস্থানের বদলে চিরস্থায়ী শান্তিবাগের দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন। সকল তফসীরকারই এ মত পোষণ করেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে "দারুস সালাম" অর্থ জান্নাত। পূর্ববর্তী আয়াতে দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার এবং দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে এবং দুনিয়া কিভাবে হঠাৎ ধ্বংস হবে দৃষ্টান্ত দ্বারা তা বোঝানো হয়েছে। আর এ আয়াতে চিরস্থায়ী শান্তির কেন্দ্রের দিকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন, এ আয়াতে মোমেনদের জন্যে বিশেষ নসিহত রয়েছে। কেননা জান্নাতের দিকে আহ্বান করছেন স্বয়ং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন, আর তাঁর গোলাম উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে বিলম্ব করছে। যারা আখেরাতকে অস্বীকার করে তাদের জন্যে রয়েছে আলোচ্য আয়াতে সতর্কবাণী। তাদের উপলব্ধি করা উচিত যে, তারা কার

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৯০

দাওয়াত অস্বীকার করছে? এবং কোন্ দাওয়াত অস্বীকার করছে? দাওয়াত দাতা হলেন স্বয়ং আল্লাহ্ পাক, আর দাওয়াত হলো জান্নাতে প্রবেশের। যারা দুনিয়ার লোভে মোহে মুগ্ধ-মত্ত হয়ে আখেরাতকে ভুলে গেছে তাদের জন্যে রয়েছে এ আয়াতে বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়। তারা কেমন উত্তম বস্তুকে ছেড়ে দিয়ে কত সামান্য বস্তু নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে!

যারা আল্লাহ্ পাকের প্রেমিক তাদের জন্যে রয়েছে এ আয়াতে সুসংবাদ। কেননা তাঁদের জন্যে রয়েছে এতে আল্লাহ্ পাকের খাছ দরবারের দাওয়াত।[১]

وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

"আর আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন"।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে "সিরাতুল মোস্তাকীম" অর্থ হলো ইসলামের পথ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত পথ, আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভের পথ। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে সরল সঠিক পথ দেখান।

আলোচ্য আয়াতের দু'টি কথা

১. আল্লাহ্ পাক সমগ্র মানব জাতিকে জান্নাতে প্রবেশের জন্যে সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি প্রতিটি মানুষকে চিরন্তন সুখের কেন্দ্র, নিরাপত্তা ও শান্তি ধামের দিকে আহ্বান করেন, যেখানে কোন বিপদাপদ নেই। কেননা বেহেশতবাসীরা থাকবে সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং নিশ্চিন্ত। ফেরেশতাগণ তাঁদেরকে জানাবে অভিনন্দন। সবার উপরে স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে তারা লাভ করবে সালামের উপহার।

২. আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত করেন, সঠিক পথের সন্ধান দান করেন। অতএব, মানুষ মাত্রকে সঠিক পথের অন্বেষণ করতে হবে। এজন্যে সূরা ফাতেহায় দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে এভাবে–

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

"হে আল্লাহ্! আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাও"। যারা এভাবে আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে সঠিক পথ অবলম্বনের তৌফিক দান করেন। এটি তাঁর মেহেরবানী, দয়া ও করুণা।

---

[১]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৩৮

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَ زِيَادَةٌ ؕ وَ لَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّ لَا
ذِلَّةٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِيْنَ
كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ مَا لَهُمْ مِّنَ
اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَآ اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ؕ
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ
جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَ شُرَكَآؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا
بَيْنَهُمْ وَ قَالَ شُرَكَآؤُهُمْ مَّا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢٨﴾ فَكَفٰى بِاللّٰهِ
شَهِيْدًۢا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿٢٩﴾ هُنَالِكَ
تَبْلُوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّآ اَسْلَفَتْ وَرُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ وَ ضَلَّ
عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٣٠﴾

তরজমা

(২৬) যারা ভাল কাজ করেছে তাদের জন্যে ভালই রয়েছে, আর তার চেয়ে অধিক কিছুও। কালিমা এবং লজ্জা তাদের মুখমন্ডলকে আচ্ছন্ন করবে না। তারাই জান্নাতবাসী, তারা চিরদিন সেখানে থাকবে।

(২৭) যারা মন্দ কাজ করেছে তাদের প্রতিফলও অনুরূপ ভাবে মন্দই হবে, অপমান তাদের মুখ ঢেকে রাখবে। আল্লাহ পাক থেকে তাদেরকে কেউ রক্ষাকারী নেই। অমানিষার তিমির খন্ডে যেন তাদের মুখ আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছে। তারাই দোযখের অধিবাসী, তারা চিরদিন সেখানে থাকবে।

(২৮) এবং যেদিন আমি তাদের সকলকে একত্রিত করবো এবং যারা শেরক করেছে তাদেরকে বলবো, তোমরা এবং তোমাদের শরীকরা নিজ নিজ স্থানে দন্ডায়মান থাক। এরপর আমি তাদেরকে পরস্পর থেকে পৃথক করে দেব এবং তারা যাদেরকে শরীক করেছিল তারা বলবে; তোমরাতো আমাদের বন্দেগী করতে না।

(২৯) অতএব, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট। আমরা তোমাদের বন্দেগীর কোন সংবাদই রাখিনা।

(৩০) সেদিন তাদের প্রত্যেকে স্বীয় পূর্ব কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত হবে এবং তাদেরকে তাদের সত্যিকার মালিক আল্লাহ পাকের নিকট ফিরিয়ে আনা হবে। আর যে সব মিথ্যা কথা তারা রচনা করেছিল তা বিদায় গ্রহণ করবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁর বন্দাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার কেন্দ্র জান্নাতের দিকে আহ্বান করেছেন। আর এ আয়াতে ভাগ্যবান লোকেরা জান্নাতে যে সৌভাগ্য লাভ করবেন তার বিবরণ রয়েছে।

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَ زِيَادَةٌ ط

যারা দুনিয়ার জীবনে ভাল কাজ করেছে তারা আখেরাতের জীবনে লাভ করবে উচ্চ মর্যাদা, উত্তম আবাস-স্থল তথা জান্নাত; বরং তার চেয়েও অনেক বেশী।

(যারা ভাল কাজ করেছে) اَحْسَنُوا। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম "এহসান" এর ব্যাখ্যা করেছেনঃ তুমি এভাবে আল্লাহর এবাদত করবে যেন এবাদতের সময় তুমি তাঁকে দেখ। যদি এ মর্তবা অর্জন করতে না পার তবে এতটুকু বিশ্বাস কর যে, আল্লাহ্ পাক তোমাকে অবশ্যই দেখছেন। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত ওমর এবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে, তাতে আলোচ্য আয়াতের "আল হোসনা" শব্দটির ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে যে, এর অর্থ হলো উত্তম সওয়াব তথা জান্নাত।

এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমরের (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا। (যারা নেক আমল করে তথা ভাল কাজ করে) আলোচ্য আয়াতের এ কথাটির তাৎপর্য হলো, যারা আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের উপর সাক্ষ্য দেয়, তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত। এরপর زِيَادَةٌ শব্দটির ব্যাখ্যা হলো আল্লাহ্ পাকের দিদার লাভে ধন্য হওয়া।

এবনে জরীর এবং এবনে মরদবিয়া হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-এর সূত্রে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান বাণীর উল্লেখ করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক একজন ঘোষক নিযুক্ত করবেন যে এত উচ্চস্বরে ঘোষণা করবে যে, আগের পরের সকলেই সে ঘোষণা শ্রবণ করবে। ঘোষণা হলো এই –হে জান্নাতবাসীগণ! আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে উত্তম সওয়াব এবং বাড়তি কিছুর ওয়াদা করেছিলেন। উত্তম সওয়াব হলো জান্নাত আর বাড়তি পুরস্কার হলো আল্লাহ্ পাকের দিদার লাভ হওয়া।

এবনে মরদবিয়া একরামার সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাসের (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তাতেও এ বিবরণই রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকেও একথা বর্ণিত আছে। ইমাম মুসলিম এবং এবনে মাজা হযরত সোহায়েব (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জান্নাতবাসীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবেন তখন আল্লাহ্ পাক তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেনঃ তোমরা এর চেয়ে বাড়তি আরো কিছু চাও?

জান্নাতবাসীগণ আরজ করবেনঃ হে আল্লাহ! তুমি কি আমাদের মুখমন্ডলকে নূরানী করে দাওনি? তুমি কি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ দাওনি? এবং তুমি কি আমাদেরকে দোযখ থেকে রক্ষা করোনি? এর চেয়ে বাড়তি আর কোন্ জিনিষের আমরা আকাঙ্খা করতে পারি?

আল্লাহ পাক সঙ্গে সঙ্গে (সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝের) আড়াল সরিয়ে দেবেন এবং জান্নাতবাসীদের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন। তখন অবস্থা এই দাঁড়াবে যে, এ পর্যন্ত বেহেশতে তারা যা পেয়েছেন তার মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় নেয়ামত হবে আল্লাহ পাকের দিদার অর্জন করা (আল্লাহ পাকের দিদারের মোকাবেলায় বেহেশতের সমস্ত নেয়ামত তুচ্ছ মনে হবে)।

ইমাম কুরতবী লিখেছেন, পর্দা সরিয়ে দেয়ার অর্থ হলো আল্লাহ পাকের দিদারের ব্যাপারে যত বাধা-বিপত্তি থাকবে তা দূরীভূত করে দেয়া হবে এবং জান্নাতবাসীগণ স্বচক্ষে আল্লাহ পাকের আজমত ও জালালের নূর এভাবে দেখতে পারবেন যেমন তিনি রয়েছেন।[১]

এতদিন আল্লাহ পাকের যে নেয়ামত তাঁরা ভোগ করছিলেন তার চেয়ে বড় কোন নেয়ামত হতে পারে তা ছিল তাঁদের জন্যে কল্পনাতীত। কিন্তু আল্লাহ পাকের দিদার লাভে ধন্য হওয়ার পর তারা উপলব্ধি করবেন এ নেয়ামতের সমান কিছুই হতে পারেনা। এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত।

وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ

তাদের চেহারা কালিমাচ্ছন্ন হবে না। কোন প্রকার দুশ্চিন্তা বা অবমাননার কারণে তাদের মুখমন্ডল মলিন হবে না; বরং তাদের চেহারা হবে জ্যোতির্ময় এবং নূরানী। সেদিন কোন প্রকার অপমান বা অনুতাপের ছায়া তাদেরকে স্পর্শও করবে না।

এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন, "কতর" সেই বালুকে বলা হয় যা কৃষ্ণ বর্ণের হয়। এ বাক্যটির অর্থ হলো দোযখীদের চেহারা যেমন মলিন এবং কালিমাচ্ছন্ন হবে জান্নাতবাসীদের অবস্থা তেমন হবে না; বরং তাদের চেহারা হবে অত্যন্ত জ্যোতির্ময়। যেমন আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ - اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ - وَوُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ - تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ - (সূরা কেয়ামাহ)

"সেদিন কোন কোন মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে। কোন কোন মুখমন্ডল হয়ে পড়বে বিবর্ণ এই আশঙ্কায় যে, এক ধ্বংসকারী বিপর্যয় আসন্ন"।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে "জেয়াদা" শব্দটির ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তফসীরকারগণ হযরত আলী (রাঃ)-এর

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪৯৭-৯৮

কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, "জেয়াদা" অর্থ হলো বেহেশতের এমনি একটি কক্ষ যা একটি মুক্তা দ্বারা তৈরী করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আলোচ্য আয়াতে الحسنى শব্দটির অর্থ হলো নেকী। আর "জেয়াদা" শব্দের তাৎপর্য হলো ঐ নেকীর দশগুণ। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে "জেয়াদা" শব্দটির ব্যাখ্যা হলো নেক আমলের সওয়াব দশ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, "জেয়াদা" শব্দটির তাৎপর্য হলো আল্লাহ পাকের তরফ থেকে মাগফেরাত এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করা।

এ সমস্ত কথার উদ্ধৃতি দেয়ার পর ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে শব্দটির ব্যাখ্যা হলো জান্নাত। অর্থাৎ যারা দুনিয়াতে নেক আমল করবে তারা জান্নাত লাভ করবে, এরপর যখন "জেয়াদা" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তখন একথা সুস্পষ্ট যে, তা জান্নাত ব্যতীত বাড়তি কিছু। আর তা হলো স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দিদার লাভে ধন্য হওয়া।[১]

أُولَٰئِكَ أَصْحَٰبُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

তারাই হলো জান্নাতবাসী আর তারা চিরদিন সেখানে থাকবে। জান্নাতের নেয়ামত কোন দিন শেষ হবার নয়। এ বাক্যটিতে নেককার বন্দাদেরকে এ নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে যে, দুনিয়ার এ পার্থিব জীবনের সীমিত সময় যদি কোন মানুষ আল্লাহ পাকের বিধান মেনে চলে তবে চিরকাল সে জান্নাতে আরাম এবং আনন্দে বাস করতে থাকবে এবং জান্নাতের নেয়ামত সমূহ কোন দিন বন্ধ হবে না এবং কোন দিন শেষও হবে না।

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّـَٔاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍۭ بِمِثْلِهَا.

(পক্ষান্তরে, যারা মন্দ কাজ করবে তারা সে অনুসারেই বদলা পাবে)

যারা অবাধ্য, যারা নাফরমান তাদের অবস্থা হবে সম্পূর্ণ বিপরীত, তাদের চেহারা হবে কালিমাচ্ছন্ন, অমানিষার গাঢ় অন্ধকার থাকবে তাদের মুখমন্ডলে। (২) অপমান এবং অনুতাপ তাদেরকে পেয়ে বসবে।

مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ.

(৩) আল্লাহ পাকের আযাব এবং গজব থেকে তাদেরকে রক্ষাকারী কেউ থাকবেনা।

كَأَنَّمَآ أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ

এমন মনে হবে যেন অমানিষার আঁধারে তাদের মুখ ঢাকা পড়েছে।

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৭৮

اُولٰٓئِكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ.

এরাই হলো দোযখী, আর দোযখে তারা চিরদিন থাকবে।

এখানে উল্লেখ্য, আল্লাহ পাক নেককারদেরকে জান্নাত প্রদানের পরও বাড়তি নেয়ামত দান করবেন, কিন্তু অবাধ্য নাফরমানদেরকে তাদের গুনাহর অতিরিক্ত শাস্তি দেবেন না, বরং তিনি ইচ্ছা করলে কোন কোন গুনাহ মাফও করতে পারেন, তা সম্পূর্ণ তাঁর ইচ্ছাধীন।

وَيَوۡمَ نَحۡشُرُهُمۡ جَمِيۡعًا ثُمَّ نَقُوۡلُ لِلَّذِيۡنَ اَشۡرَكُوۡا مَكَانَكُمۡ اَنۡتُمۡ وَشُرَكَآؤُكُمۡ.

পূর্ববর্তী আয়াতে আখেরাতে মোমেনদের উচ্চ মর্তবার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কাফেরদের অপমান এবং কঠিন শাস্তির উল্লেখ রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের আরো একটি অবমাননার কথা বর্ণিত হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক কাফের মুশরেকদেরকে একত্রিত করবেন। দুনিয়াতে যে যাকে আল্লাহ পাকের সাথে শরীক করেছে, যে যার পূজা অর্চনা করেছে এবং যে যাকে আল্লাহর নিকট সুপারিশকারী মনে করে উপাস্য বা মা'বুদের পর্যায়ে স্থান দিয়েছে তাদের সকলকে একত্রিত করা হবে।

ইহুদীরা হযরত ওজায়ের (আঃ)-কে এবং খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলেছে (নাউজুবিল্লাহ মিন জালেক), এমনিভাবে তারা তাদের ধর্ম যাজকদেরকে খোদায়ী মর্যাদায় আসীন করেছে। আর মুশরেকেরা তাদের দেব-দেবীর উপাসনা করেছে। এই উপাস্যরা তাদের উপাসনাকারীদের থেকে নিজেদের সম্পর্কচ্ছেদের কথা বলবে। এরপর আল্লাহ পাক তাদের পরস্পরকে পৃথক করে দোযখে নিক্ষেপ করবেন।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন মানব ও জ্বীন জাতিকে উপস্থিত করবেন। ভাল-মন্দ সকলকেই সেদিন হাযির হতে হবে। কাউকে রেহাই দেয়া হবেনা, আল্লাহ পাক মুশরেকদেরকে বলবেন, তোমরা এবং তোমাদের উপাস্যরা নিজ নিজ স্থানে দন্ডায়মান থাক। আর মোমেনদের থেকে পৃথক থাক যেমন পবিত্র কোরআনের সূরা ইয়াসীনে এরশাদ হয়েছেঃ

وَامۡتَازُوا الۡيَوۡمَ اَيُّهَا الۡمُجۡرِمُوۡنَ.

(হে পাপীষ্ঠরা! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও) তাই কেয়ামতের দিন মোমেন ও কাফের পৃথক পৃথক থাকবে। মোমেনগণ আল্লাহ পাকের দরবারে মীমাংসা ত্বরান্বিত করার আরজী পেশ করবে এবং প্রতীক্ষা করার কষ্ট থেকে রেহাই প্রার্থনা করবে।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ কেয়ামতের দিন আমরা সকল লোকের চেয়ে উচ্চ স্থানে থাকবো। তখন আল্লাহ পাক মুশরেকদেরকে সম্বোধন করে বলবেনঃ হে মুশরেকরা! তোমরা যাদের এবাদত করতে তাদের থেকে পৃথক থাক।

فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ

আমি তাদের পরস্পরকে ভিন্ন করে দেব অর্থাৎ কাফের এবং তাদের উপাস্যদেরকে পৃথক করে দেয়া হবে। দুনিয়াতে তাদের পরস্পরের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল তা ছিন্ন করা হবে। তাই বাতিল উপাস্যরা তাদের পূজারীদের সাথে সম্পর্কহীনতার কথা বলবে। অথবা এর অর্থ হলো আমি তাদেরকে মোমেনদের থেকে পৃথক করে দেব।

وَقَالَ شُرَكَآؤُهُمْ مَّا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ

যাদের তারা পূজা করতো তারা বলবে, তোমরা আমাদের পূজা করতে না অর্থাৎ আমাদের পূজা করার জন্যে আমরা তোমাদেরকে আদেশ দেইনি। তোমরা অযথাই আমাদেরকে উপাস্য বানিয়েছ।

আল্লাহ পাক মূর্তিগুলোকে তখন বাক শক্তি দান করবেন এবং তারা কাফেরদের সাথে তাদের সম্পর্কহীনতার কথা বলতে থাকবে। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে شُرَكَآء শব্দ দ্বারা ফেরেশতাগণ এবং হযরত ঈসা (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। কেননা ফেরেশতাগণ তাদেরকে পূজা করার জন্যে কাফেরদেরকে বলেননি। ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীরা তাঁর সম্পর্কে যে ভ্রান্তমত পোষণ করতো তাও তিনি তাদেরকে বলেননি।

বাতিল উপাস্যরা যখন একথা বলবে যে, "তোমরা আমাদের এবাদত করতে না", "তখন মুশরেকরা বলবে অবশ্যই নয়, আমরা তোমাদেরই পূজা করতাম"। তখন বাতিল উপাস্য মূর্তিগুলো যে জবাব দেবে তা পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে–

فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ

সেদিন সকল মিথ্যা ধোকার রহস্য উদঘাটিত হয়ে যাবে। কল্পনা-প্রসূত এবং ভিত্তিহীন ধর্ম বিশ্বাসের বাতুলতা সকলেই উপলব্ধি করবে– তাই উপাস্যরা বলবে, "সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট"। তোমাদের এবাদত সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতাম না। আমাদের শ্রবণ শক্তি ছিল না। আমরা কিছু দেখতামও না। আমাদের কোন কিছু বুঝবারও ক্ষমতা ছিল না।

ইমাম রাজী (রঃ) এ পর্যায়ে লিখেছেন, কেয়ামতের দিন কাফের মুশরেকরা চরম শাস্তি ভোগ করার পাশাপাশি এ কষ্টদায়ক দৃশ্যও দেখবে যে, সারা জীবন যে মূর্তিগুলোর তারা পূজা করেছে বা চন্দ্র সূর্য ও অন্যান্য সৃষ্টির সম্মুখে তারা মাথানত করেছে আজ তারা কেউ তাদের কোন উপকার করতে পারছেনা।

هُنَالِكَ تَبْلُوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّآ اَسْلَفَتْ

সেদিন প্রত্যেকে তার কৃতকর্মের উপকার এবং অপকার দেখতে পাবে। সেদিন সকলেই এ সত্য উপলব্ধি করবে যে, সত্যিকার মালিক আল্লাহ পাক ব্যতীত কোথাও কোন আশ্রয় নেই। সকলকে সেদিন এক আল্লাহ পাকের নিকটই ফিরে যেতে হবে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَرُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ

প্রত্যেকেই তাদের সত্যিকার মালিক আল্লাহ্ পাকের নিকটই ফিরে যাবে তথা আল্লাহ্ পাকের দরবারেই প্রত্যেককে হাযির হতে হবে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ পাকই বিশ্ব স্রষ্টা, পালনকর্তা। তিনিই সকলের মালিক। তাঁর নিকটই সবাইকে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু যারা এ সত্য উপলব্ধি করেনা, যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনে না, সেদিন তারা তাদের কৃতকর্মের শোচনীয় পরিণাম দেখতে পাবে।

উপাস্যরা সকলেই তাদের পূজারীদের সঙ্গে বৈরীভাব প্রকাশ করবে। তারা বলবে, তোমাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্কই ছিলনা, শয়তান তোমাদেরকে এজন্যে প্ররোচনা দিয়েছিল, তোমরা তার কথা মেনেছিলে। আলোচ্য আয়াতে যাদের কথোপকথনের বিবরণ রয়েছে তারা হলো সে সব বাতিল উপাস্য, যাদের সম্মুখে মুশরেকরা মাথা নত করেছে। কাফেরদের দুঃখ ও আক্ষেপ বৃদ্ধি করার জন্যে আল্লাহ্ পাক সেদিন সকল বাতিল উপাস্যকে বাক শক্তি দান করবেন,[১] তারা সেদিন তাদের পূজারীদেরকে এভাবে নিরাশ করবে।

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ

আর কাফের মুশরেকরা যে সব মিথ্যা উপাস্য তৈরী করেছিল সেদিন সবই বিদায় নেবে, সবই হারিয়ে যাবে, যারা মনে করেছিল এ মূর্তিগুলো তাদের জন্যে সুপারিশ করবে, তারাও মহা বিপদের সম্মুখীন হবে। কেননা কোন বাতিল উপাস্য সেদিন কারোই কোন কাজে লাগবে না। সেদিন প্রত্যেকেই তার সারা জীবনের কর্মকান্ডের পরিণাম নিজের সম্মুখে সচক্ষে দেখতে পাবে।

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ
وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ
الْاَمْرَ ؕ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ۚ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٣١﴾ فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ
الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ﴿٣٢﴾ كَذٰلِكَ
حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٣﴾

[১]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৩৯

তরজমা

(৩১) (হে রসূল!) আপনি জিজ্ঞাসা করুন, আসমান জমিন থেকে কে তোমাদেরকে জীবিকা দান করে? অথবা কে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির মালিক? কে মৃত থেকে জীবিতকে বের করে? কে জীবিত থেকে মৃতকে বের করে? এবং কে সব বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে? নিশ্চয় তারা বলে উঠবে আল্লাহ। (হে রসূল!) আপনি জিজ্ঞাসা করুন, তবে কেন তাঁকে তোমরা ভয় করনা?

(৩২) বস্তুতঃ তিনিই আল্লাহ্ পাক, তোমাদের সত্য প্রতিপালক, অতএব, সত্যের পরে মিথ্যা ব্যতীত আর কিইবা বাকী রইল? তবুও তোমরা কোথায় ফিরে যাও?

(৩৩) এভাবেই সেই নাফরমানদের ব্যাপারে আপনার প্রতিপালকের বাণী সত্যে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, তারা ঈমান আনবে না।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরেকদের ভয়াবহ পরিণামের ঘোষণা রয়েছে। আর এ আয়াতে আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদ বা তৌহিদের এমন অকাট্য দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে যা অস্বীকার করার উপায় নেই।[১]

এ আয়াত সমূহে আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের এবং তাঁর সৃষ্টি-নৈপূণ্যের অনেক দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ্ পাকের এমন গুণাবলীর বিবরণ রয়েছে যাকে কোন কাফের মুশরেকও অস্বীকার করতে পারে না। কেননা এ গুণাবলী আল্লাহ্ পাক ব্যতীত আর কারো মধ্যেই নেই। এরপর কাফের মুশরেকদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, এ মহাসত্য উপলব্ধি করার পরও কেন তোমরা এক অদ্বিতীয়, লা-শরীক আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কারো সম্মুখে মাথা নত কর? কেন তোমরা স্বহস্তে নির্মিত মূর্তির পূজা অর্চনা কর?

এ আয়াত সমূহের বর্ণনা-শৈলী এত হৃদয়গ্রাহী যে, মানুষ মাত্রেরই হৃদয়কে আকৃষ্ট করে, মনে দাগ কাটে। এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

(হে রসূল!) আপনি কাফের মুশরেকদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, আসমান জমিন থেকে কে তোমাদেরকে রিয্ক দেয়? আসমান থেকে কে বারি বর্ষণ করে? সূর্যের তাপ কার দান? জমিন কার সৃষ্টি? জমিনের মাঝে উৎপাদন ক্ষমতা কে দান করেছে?

---

১. তফসীরে কবীর খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-১৮
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৬৬

মাটি পানি সংমিশ্রিত হওয়ার পর জমিন থেকে ফলমূল, তরি-তরকারি এক কথায় যাবতীয় খাদ্র-দ্রব্য কে উৎপাদন করে? অন্য আয়াতে কথাটিকে এভাবে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে–

أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ـ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ـ لَوْ نَشَآءُ

لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ. (সূরা ওয়াকেয়াহ)

"তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? তোমরা কি তাকে অংকুরিত কর? না আমি অংকুরিত করি"?

"আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড় কুটোয় পরিণত করতে পারি, তখন তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে"।

إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ـ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ.

"তোমরা বলবে আমাদের তো সর্বনাশ হয়ে গেল, আমরা সম্পূর্ণ হৃতঃস্বর্বস্ব হয়ে পড়েছি"।

অতএব, একথা অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, আল্লাহ্ পাকই মানব জাতিকে রিয্ক দান করেন। পরবর্তী আয়াতাংশে এরশাদ হয়েছেঃ

أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ

আসমান জমিনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে উপলব্ধি করবে যে, আল্লাহ্ পাকই রিয্ক দাতা। তিনিই পালনকর্তা, তিনিই স্রষ্টা, তিনি এক, অদ্বিতীয়। হে আত্মবিস্মৃত মানব জাতি! তোমার নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তোমার নিজের দেহের মধ্যেই রয়েছে আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের প্রকৃষ্ট দলিল প্রমাণ।

মানুষের দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণ শক্তি কার দান, কোন্ মহাশক্তি প্রত্যেকটি মানুষকে দেখার এবং শোনার এ অপূর্ব শক্তি দান করেছেন? কে তোমাদের শ্রবণ শক্তি এবং দৃষ্টি শক্তির উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখে?

কে এই শক্তি দান করে, কে এই শক্তি থেকে বঞ্চিত করে? অথবা এর অর্থ হলো কে তোমাদের শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তির হেফাজত করে? পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক কথাটিকে এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا.

(এবং আল্লাহ্ পাকই বের করেছেন তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের উদর থেকে, অথচ তোমরা কিছুই জানতে না এবং আল্লাহ্ পাক দান করেছেন তোমাদেরকে শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি এবং উপলব্ধি শক্তি, হয়তো তোমরা আল্লাহ্ পাকের দরবারে শোকর গুজার হবে।) যেহেতু শ্রবণ শক্তি এবং দৃষ্টি শক্তি তথা যাবতীয় শক্তি আল্লাহ্ পাকই

মানুষকে দান করেছেন, তাই এসব শক্তি কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে বলেও পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.

(নিশ্চয় শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি এবং উপলব্ধি শক্তি তথা এ সমস্ত শক্তির ব্যবহার সম্পর্কে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে।) তাই আলোচ্য আয়াতে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, মানুষের সকল শক্তি সকল বুদ্ধি কার দান? কে এ সমস্ত শক্তি মানুষকে দান করেছে? আলোচ্য আয়াতে আরো এরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ

"হে আত্মভোলা মানুষ! জীবিতকে মৃত থেকে কে বের করে আনে? আর কে মৃতকে জীবিত থেকে বের করে আনে"?

ডিম তো মৃত কিন্তু ডিম থেকে মোরগের বাচ্চা বের হয়ে আসছে অহরহ। এমনিভাবে জীবিত মুরগী থেকে মৃত ডিম বের হয়ে আসছে। জীবন্ত মানুষ থেকে প্রাণহীন বীর্য বের হয়ে আসছে, আর তা দিয়েই আল্লাহ্ পাক একজন জীবন্ত মানুষকে সৃষ্টি করছেন। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ এমনি দৃষ্টান্ত অহরহ দেখে। অতএব, চিন্তা করে দেখতে হবে এবং এ সত্য উপলব্ধি করতে হবে যে, এসব এক আল্লাহ্ পাকই করছেন, সবই আল্লাহ্ পাকের কুদরতের লীলাখেলা। আরবের মুশরেকরাও এ সত্যকে অস্বীকার করতে পারেনি।

আর চতুর্থ প্রশ্ন হলো–

وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ

ক্ষণিকের জন্য চিন্তা করে দেখ নিখিল বিশ্বের সব কিছুর ব্যবস্থা কে করছে?

فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ

এ কাফের মুশরেকরাও এ প্রশ্নগুলোর জবাবে বলবে, আল্লাহ্ অর্থাৎ এসব কিছু এক আল্লাহ্ পাকই করেন।

فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ

(হে রসূল!) আপনি তাদেরকে বলুন, যখন আল্লাহ্ পাকই রিযক দান করেন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন, তিনিই তোমাদেরকে দান করেন শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি। তোমাদের এসব শক্তির হেফাজতও তিনিই করেন, নিয়ন্ত্রণও তিনি করেন, প্রাণহীন বস্তু থেকে প্রাণবন্ত জীবকে বের করে আনেন, তিনিই নিখিল বিশ্বের নিয়ম শৃংখলা রক্ষা করেন, তিনিই এই বিশাল বিস্তৃত পৃথিবীর একমাত্র মালিক, একমাত্র স্বত্ত্বাধিকারী।

এমন অবস্থায় কেন তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যের সম্মুখে মাথা নত কর? অন্য কিছুকে তাঁর সাথে শরীক কর? আল্লাহ পাকই একমাত্র মালিক, তিনি এক, অদ্বিতীয়। তাঁর

কোন শরীক নেই, তবে কোন্ সাহসে তোমরা তাঁর সাথে শরীক কর? কোন্ যুক্তিতে হীন সৃষ্টির সম্মুখে মাথা নত কর? কেন তোমরা আল্লাহ্‌র আযাবকে ভয় কর না?

فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ

অতএব, আল্লাহ পাকই তোমাদের সত্যিকার প্রতিপালক, তাঁর নিরঙ্কুশ আধিপত্য সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। অতএব, এক আল্লাহ্ পাকের বন্দেগী করাই তোমাদের কর্তব্য।

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ

এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য, এতদ্ব্যতীত সবই মিথ্যা, আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্যের বন্দেগী করা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতা। যে এ সত্যকে পরিহার করে মিথ্যাকে গ্রহণ করে তার ধ্বংস অনিবার্য, তার পরিণাম ভয়াবহ।

فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ

তবুও তোমরা কোথায় ফিরে যাও? একথার তাৎপর্য হলো এই, যখন তোমরা উপলব্ধি করলে যে আসমান জমীনের একমাত্র মালিক আল্লাহ পাক, তিনিই রিয্‌কদাতা, তিনিই মানুষকে দান করেছেন মানুষের যথাসর্বস্ব। বিশাল বিস্তৃত এ পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণকর্তাও তিনি। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিতে পারেন, এতদসত্ত্বেও তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা কোথায় ফিরে যাও? কে তোমাদেরকে হক্ব বর্জন করতে এবং বাতিলকে গ্রহণ করতে প্ররোচনা দিচ্ছে? এ সকল প্রশ্ন করা হয়েছে কাফের মুশরেকদেরকে সম্বোধন করে। পবিত্র কোরআনের এ আয়াত সমূহের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এ প্রশ্নগুলোর মধ্যে একটি অতি সুন্দর, আকর্ষণীয় সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। সর্বপ্রথম রিয্‌কের কথা বলা হয়েছে, জিজ্ঞাসা করা হয়েছে বল, কে তোমাদেরকে রিয্‌ক দান করে? কেননা লালন-পালনের ব্যাপারে এ বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বের অধিকারী। এরপর প্রশ্ন করা হয়েছে ইন্দ্রিয় শক্তির ব্যাপারে। কেননা শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তিসহ অন্যান্য ইন্দ্রিয় শক্তি ব্যতীত মানুষ এবং পাথরের মাঝে পার্থক্য কোথায়?

এরপর জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে এবং সবশেষে নিখিল বিশ্বের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, কে বাতাস প্রবাহিত করে? কে বারিপাত করে? কে সূর্যের তাপ এবং আলো বিতরণ করে? কে আসমানের পানি এবং জমিনের মাটি একত্রিত করে পৃথিবীকে শষ্য-শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ করে? কে জীবিতকে মৃত থেকে আর মৃতকে জীবিত থেকে বের করে আনে? এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব একটিই, আর তা হলো এক আল্লাহ পাকই সবকিছু করেন। এতদসত্ত্বেও কেন তোমরা আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হও? কেন তোমরা এক আল্লাহ পাকের সাথে অন্য কিছুকে শরীক কর?[১]

كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

---

[১]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৪০

এভাবে অর্থাৎ যেভাবে উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, এক আল্লাহ পাকই স্রষ্টা ও পালনকর্তা এবং রিয্ক দাতা, ঠিক এমনিভাবে একথাও প্রমাণিত হলো যে, এই কাফের মুশরেকেরা ঈমান আনবেনা। (অতএব, হে রসূল!) মক্কাবাসী কাফের মুশরেকদের ঈমান না আনার কারণে আপনি ব্যথিত হবেন না। সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হওয়ার পরও যারা পথভ্রষ্ট হয় তাদের জন্যে মর্মাহত হওয়ার কিছুই নেই। এ কাফেরদের অন্যায় আচরণ দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, তারা কখনও ঈমান আনবে না, আল্লাহ্ পাক তাদের সম্পর্কে একথা জানতেন। এ দূরাত্মা কাফেররা তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক যা জানতেন তা বাস্তব সত্যে প্রমাণ করলো।

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ۖ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٣٤﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ
يَّهْدِيْۤ اِلَى الْحَقِّ ۗ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ۗ اَفَمَنْ يَّهْدِيْۤ اِلَى الْحَقِّ
اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْۤ اِلَّاۤ اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ ۟ كَيْفَ
تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ۗ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ
الْحَقِّ شَيْـًٔا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ
اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ
الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٧﴾

তরজমা

(৩৪) (হে রসূল!) আপনি বলুন তোমরা যাদেরকে শরীক কর তাদের মধ্যে এমন কে আছে যে সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দিতে পারে ও পরে পুনরায় জীবিত করতে পারে?

(হে রসূল!) আপনি বলুন আল্লাহ্ পাকই প্রথম সৃষ্টি করেন এবং পুনরায় তিনিই তা করবেন, অতএব, তোমরা কোথায় ফিরে যাও?

(৩৫) (হে রসূল!) আপনি জিজ্ঞাসা করুন তোমরা যাদেরকে শরীক কর তাদের মধ্যে কে আছে যে সঠিক পথের নির্দেশনা দিতে পারে? (হে রসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহ পাকই সঠিক পথের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি সত্যের পথ-নির্দেশ প্রদান করেন, তিনি আনুগত্যের অধিকতর হক্বদার, না যাকে পথ প্রদর্শন না করলে সে পথ পায়না সে হক্বদার? অতএব, তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা কিভাবে বিচার করতে চাও?

(৩৬) তাদের অধিকাংশ লোকই নিছক অনুমানেরই অনুসরণ করে অথচ সত্যের বদলে অনুমান কোন কাজেই আসেনা। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

(৩৭) এই কোরআন এমন নয় যে, আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কেউ তা রচনা করতে পারে। মূলতঃ এ তো পূর্ববর্তী কালামকে সত্যায়িত করে এবং এতে রয়েছে বিধান সমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই কালাম বিশ্ব প্রতিপালকের তরফ থেকে অবতীর্ণ।

তফসীরুল কোরআন

আলোচ্য আয়াত সমূহে তৌহিদ তথা আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের উপর আরো দলিল পেশ করা হয়েছে এবং মুশরেকরা যে নিজেদের হাতে গড়া মূর্তির পূজা-অর্চনা করতো, অকাট্য দলিল প্রমাণ দ্বারা তার বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) আপনি কাফের মুশরেকদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্র শরীক মনে কর তাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা তথা সমগ্র সৃষ্টি জগতকে প্রথম অস্তিত্ব দিতে পারে? এবং এরপর দ্বিতীয়বারও তাকে সৃষ্টি করতে পারে? আর একথা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট যে, তাদের তথাকথিত উপাস্যরা কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, তাদের উপাস্যগুলো সম্পূর্ণ অসহায় অক্ষম। এমন অবস্থায় (হে রসূল!)

قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ

আপনিই জবাব দিন যে, আল্লাহ্ পাকই পৃথিবীর সব কিছুকে সর্বপ্রথম অস্তিত্ব দান করেছেন, এরপর পুনরায় তিনিই তাকে সৃষ্টি করবেন। অতএব, যখন তোমাদের উপাস্যরা কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, সব বিষয়েই তারা অক্ষম, সৃষ্টি করার গুণ একমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই, আর কারো নয় এমন অবস্থায় তোমরা কোথায় ফিরে যাও? তোমরা স্বচক্ষে দেখ তোমাদের অস্তিত্ব একমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই দান, তোমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা তথা তোমাদের যাবতীয় শক্তি এক আল্লাহ্ পাকই দান করেছেন, আসমান জমিন এক কথায় নিখিল বিশ্ব আল্লাহ্ পাকেরই সৃষ্টি। এ সত্য তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট আর তোমরা এসব সত্য মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতে বাধ্য, এমন অবস্থায় পুনরায় তোমাদের সৃষ্টির ব্যাপারে তোমরা কেন সন্দিহান হও?

বিশেষতঃ যখন আল্লাহ্র প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দান করেছেন এবং অবশেষে হাশরের ময়দানে প্রত্যেককে একত্রিত করা হবে এবং প্রত্যেকটি মানুষের জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব দিতে হবে বলে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন এমন অবস্থায় তোমরা পুনর্জীবনের কথা, হাশরের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার কথা কোন্ যুক্তিতে অস্বীকার কর?

একথা অনস্বীকার্য যে, সমগ্র বিশ্ব জগৎ সর্বপ্রথম আল্লাহ্ পাকই সৃষ্টি করছেন, সমগ্র মানব জাতির অস্তিত্বও আল্লাহ্ পাকেরই সৃষ্টি-নৈপুণ্যের জীবন্ত নিদর্শন। এর পাশাপাশি এ

কথাও ধ্রুব সত্য যে, মানুষকে আল্লাহ্ পাক পুনঃজীবন দান করবেন এবং তাঁর দরবারে হাযির করবেন, সৃষ্টির শুরুও তাঁর হাতে এবং শেষও তাঁর হাতে। এমন অবস্থায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের নির্দেশিত পথ ছেড়ে তোমরা কোথায় যাও?

يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ

"আজ পলায়নের স্থান কোথায়"?

فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ

"তোমরা কোথায় ফিরে যাও"?

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِىْٓ اِلَى الْحَقِّ ط

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদ বা তৌহিদের উপর আরো একটি দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ (হে রসূল!) আপনি জিজ্ঞাসা করুন, তোমরা যাদেরকে আল্লাহ্র শরীক মনে কর তাদের মধ্যে কে আছে যে নবী রসূলগণকে প্রেরণ করে, দলিল প্রমাণ দিয়ে মানুষকে সরল সঠিক পথের নির্দেশনা দেয়? কে মানুষকে হেদায়েত করে?

কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, তাদের তথাকথিত উপাস্যরা কোন মানুষকে সঠিক পথ দেখানো তো দূরের কথা তারা নিজেরাইতো পথ চেনে না, তারা দেখতে পারে না, চলতেও পারে না। তারা কিছুই করতে পারে না। তাই অন্যকে কিভাবে তারা পথ দেখাবে? তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

قُلِ اللّٰهُ يَهْدِىْ لِلْحَقِّ

(হে রসূল!) আপনি বলে দিন, শুধু এক আল্লাহ্ পাকই সত্য পথের দিকে হেদায়েত করেন, সরল সঠিক পথের সন্ধান দেন। এ শক্তি আর কারো নেই। আল্লাহ্ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করেছেন এবং তিনি যা বলেছেন পবিত্র কোরআনে এভাবে তার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছেঃ

اَلَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ ـ وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ ـ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ.

"তিনিই আল্লাহ্ পাক যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে হেদায়েত করেছেন। তিনিই আল্লাহ্ পাক, যিনি আমাকে পানাহার দান করেন, আর আমি যখন অসুস্থ হই, তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন"।

وَالَّذِىْ يُمِيْتُنِىْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ. وَالَّذِىْٓ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِىْ خَطِيْٓـئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ

"আর আল্লাহ্ পাকই আমাকে মৃত্যুমুখে পতিত করবেন, এরপর পুনঃর্জীবন দান করবেন। আর তিনিই সেই আল্লাহ পাক যাঁর সম্পর্কে আমি এ আকাঙ্খা করি যে, তিনি কেয়ামতের দিন আমার গুনাহ মাফ করে দেবেন"।

এমনিভাবে পবিত্র কোরআনে হযরত মূসা (আঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে এভাবে-

رَبُّنَا الَّذِىٓ اَعۡطٰى كُلَّ شَىۡءٍ خَلۡقَهٗ ثُمَّ هَدٰى

"আমাদের প্রতিপালক তিনিই, যিনি প্রত্যেকটি বস্তুকে অস্তিত্ব দান করেছেন, এরপর হেদায়েত করেছেন"। যেমন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ পাক এভাবে নির্দেশ দিয়েছেন-

سَبِّحِ اسۡمَ رَبِّكَ الۡاَعۡلَى الَّذِىۡ خَلَقَ فَسَوّٰى- وَالَّذِىۡ قَدَّرَ فَهَدٰى

"(হে রসূল!) আপনার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতার মহিমা ঘোষণা করুন, যিনি সৃষ্টি করেন, সুঠাম করেন এবং যিনি পরিমিত বিকাশ সাধন করেন ও পথ-নির্দেশ করেন"।[১]

অতএব, আল্লাহ্ পাকের হেদায়েত ব্যতীত কারোই সঠিক পথে চলার সুযোগ নেই, এমনকি অধিকারও নেই। নবী রসূলগণ যেহেতু আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ অহরহ পেয়ে থাকেন তাই তাঁদের হেদায়েত হয় নির্ভরযোগ্য।

অতএব, সৃষ্টির শুরু এবং শেষ যাঁর হাতে, যাঁর সর্বময় ক্ষমতা এবং অধিকার সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, হেদায়েত তাঁরই। যে তাঁর হেদায়েত মেনে চলে তার জীবন-সাধনা সার্থক হয়। আর যে তাঁর হেদায়েত অমান্য করে তার ধ্বংস অনিবার্য।

اَفَمَنۡ يَّهۡدِىۡۤ اِلَى الۡحَقِّ اَحَقُّ اَنۡ يُّتَّبَعَ اَمَّنۡ لَّا يَهِدِّىۡۤ اِلَّاۤ اَنۡ يُّهۡدٰى.

অতএব, যিনি সত্য পথের নির্দেশ দান করেন তিনি অনুসরণ করার যোগ্য? নাকি যাকে হেদায়েত না করলে সে পথই পায় না সে অনুসরণীয়?

যদি আল্লাহ্ পাক তাকে হেদায়েত করেন তবে সে হেদায়েত পায় এবং অন্যকেও হেদায়েত করতে পারে। আর আল্লাহ্ পাকের হেদায়েত ব্যতীত সে কিছুই করতে পারে না। যেমন হযরত ঈসা (আঃ) এবং হযরত ওজায়ের (আঃ)-কে যারা আল্লাহ্র পুত্র বলে ভ্রান্ত ধারণ করেছে, তাদের অবস্থাই প্রনিধাণযোগ্য। তাঁরা উভয়ে আল্লাহ্র হেদায়েতের মুখাপেক্ষী। আল্লাহ্র পাক হেদায়েত না করলে তাঁরাও হেদায়েত পেতেন না।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে হেদায়েত শব্দটির অর্থ হলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া অর্থাৎ মুশরেকরা যে মূর্তিগুলোর পূজা-অর্চনা করে তারা এত অসহায় যে এক স্থান থেকে নিজে অন্য স্থানে যেতেও পারে না, বরং তাদেরকে কেউ বহন করে নিলে তাদের স্থান পরিবর্তন সম্ভব হয়, এমন অসহায় বস্তু কিভাবে মানুষের উপাস্য হতে পারে?

---

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড ১৭, পৃষ্ঠা-৯০

তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছে–

فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ

হে কাফেররা! তোমাদের কি হলো? তোমরা কিভাবে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছো যার বাতুলতা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট।

وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا

আর এত দলিল-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও দূরাত্মা মুশরেকদের অধিকাংশ লোকই তাদের ভ্রান্ত ধারণা এবং ভিত্তিহীন অনুমান অনুসারে চলে। কোন যুক্তি এবং দলিলের অনুসারী তারা হয় না; বরং নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা এবং অবান্তর অনুমানের উপর ভিত্তি করেই তারা কোন মত পোষণ করে, তারা বিবেক-বুদ্ধি, দলিল-প্রমাণ কোন কিছুরই ধার ধারে না।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে যদিও অধিকাংশ কাফেরদের কথা বলা হয়েছে তবে এর দ্বারা সকল কাফেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, কোন কাফেরই শেরকের পক্ষে কোন দলিল পেশ করতে পারে না। শেরকের পক্ষে কোন দলিলই নেই, শেরক হলো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মিথ্যা, সর্বশ্রেষ্ঠ অন্যায়, সর্বশ্রেষ্ঠ জুলুম, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতারণা।

اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

পূর্ববর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছে যে, কাফেররা নিছক ধারণার অনুসারী হয়। আর এ বাক্যে এরশাদ হয়েছে যে, "একথা সর্বজনবিদিত, সত্য বিষয়ে ভিত্তিহীন ধারণা কোন কাজে আসেনা"।

এর দ্বারা একথা জানা যায় যে, যে সব বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতে হয় সে সব বিষয়ের দলিল প্রমাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে ঈমান এবং এক্বীন অর্জন করতে হয়।

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তাদের কীর্তি কলাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই। অতএব, কাফেরদের শাস্তি অবধারিত। এতে কাফেরদের জন্যে রয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী।

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

আর এই কোরআন এমন নয় যে, আল্লাহ্ পাক ব্যতীত আর কেউ তা রচনা করতে পারে, বরং এটি আল্লাহ্ পাকেরই কালাম। এর পূর্বে যে সব আসমানী গ্রন্থ নাযিল হয়েছে সেগুলো সত্যায়িত করে এ মহান গ্রন্থ। আর এতে মানব জীবনের জন্যে যাবতীয় বিধান বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ গ্রন্থে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই, বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে এই মহান গ্রন্থ অবতীর্ণ।

একথা সন্দেহাতীত রূপে বলা চলে যে, পৃথিবীতে শুধু পবিত্র কোরআনই মানব জাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়, প্রকৃত তত্ত্ব ও তথ্য বিশ্ব মানবের সম্মুখে তুলে ধরে। পবিত্র কোরআনের ভাষার মাধুর্য, বর্ণনা-শৈলীর বৈশিষ্ট্য এবং বিধি-নিষেধের গুরুত্ব ও মহিমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে একথা স্বীকার করতে হয় যে, পবিত্র কোরআন আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকেই অবতীর্ণ। কোন মানুষের পক্ষে এমন কালাম পেশ করা সম্ভব নয়; এজন্যে কোরআন করীম একটি ক্ষুদ্রতম সূরা রচনা করার যে চ্যালেঞ্জ চৌদ্দশ' বছর পূর্বে দিয়েছিল তা আজও বিশ্ববাসীর সম্মুখে বর্তমান রয়েছে। কিন্তু এ সুদীর্ঘ সময়ে কেউ এর মোকাবেলা করতে অগ্রসর হয়নি, আর কোন দিন হবেও না।

এ আয়াতে পবিত্র কোরআনের অলৌকিক মহিমার কথা বর্ণিত হয়েছে। মুশরেকরা পবিত্র কোরআন সম্পর্কে এ ভ্রান্ত ধারণা করতো যে, এটি আল্লাহ্‌র কালাম নয়, বরং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজেই তা তৈরী করেছেন। (নাউজুবিল্লাহি মিন জালেক) তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসন-কল্পেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে এবং কাফের মুশরেকদেরকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে যে, যদি পবিত্র কোরআন মানুষের তৈরী হয় তবে তোমাদের কবি-সাহিত্যিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তোমরা একটি ক্ষুদ্রতম সূরা রচনা করে হাযির কর। কিন্তু যখন তোমরা এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছ তবে কোন্ যুক্তিতে পবিত্র কোরআনের এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা কর?

এমন অলৌকিক জ্ঞান সমৃদ্ধ নূরানী কালাম যা মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে, যার মোকাবেলা করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় তা শুধু বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকেরই কালাম, আর কারো নয়।

পবিত্র কোরআন অলৌকিক, জ্যোতির্ময়

এ আয়াতে পবিত্র কোরআনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছেঃ

১. এই কোরআন এমন গ্রন্থ নয় যা কোন মানুষের পক্ষে রচনা করা সম্ভব; বরং এটি আল্লাহ্ পাকের জ্যোতির্ময় মহান বাণী।

২. পবিত্র কোরআন পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থ সমূহকে সত্যায়িত করে।

৩. হালাল হারাম সহ যাবতীয় বিধানের বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে এ মহান গ্রন্থে।

৪. এ গ্রন্থটির কোন কথা এমন নেই যার উপর সন্দেহ করা যায়; বরং এর সব কিছুই সন্দেহাতীত।

৫. বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে যে এ মহান গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, এটি যে তাঁরই পবিত্র কালাম এবং অলৌকিক, একথা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট এবং দেদীপ্যমান।[১]

---

[১]. তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪০৭

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে ইমাম রাজী (রঃ) বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যেহেতু কাফের মুশরেকরা পবিত্র কোরআনের প্রতি এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের প্রতি বিশ্বাস করতো না, তাই এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, পবিত্র কোরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পাকের কালাম, তাঁর মহান বাণী। আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কোন মানুষের পক্ষে এমন কালাম পেশ করা অসম্ভব, অকল্পনীয়।

দ্বিতীয়ত, এ পর্যায়ে একথা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় যে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেছেন, নবুওয়্যত লাভের পূর্বে তিনি মক্কায়ই জীবন অতিবাহিত করেছেন। কারো নিকট কোন কিছু শেখার জন্যে কখনও তিনি গমন করেননি। যদি পবিত্র কোরআন স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের কালাম না হতো তাহলে অতীত কালের বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের বিশুদ্ধ ইতিহাস বর্ণনা করা তাঁর পক্ষে কিভাবে সম্ভব হলো?

তৃতীয়ত, পবিত্র কোরআনে শুধু যে অতীত কালের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে তাই নয়; বরং অনেক বিষয় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীও রয়েছে। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ (১)

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِى الْاَرْضِ (২)

এ আয়াতসমূহে যত ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তার সবই অবশেষে বাস্তব সত্যে প্রমাণিত হয়েছে। যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র রসূল না হতেন, যদি পবিত্র কোরআন আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে তাঁর প্রতি নাযিল না হতো তবে কিভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হলো, আর কিভাবে তা সত্যে বাস্তবায়িত হলো? বুদ্ধিমান মাত্রই এ সহজ সত্যটি উপলব্ধি করতে পারে।

এতদ্ব্যতীত, আলোচ্য আয়াতে পবিত্র কোরআনের আরো একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে–

وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ

অর্থাৎ এ বিস্ময়কর মহান গ্রন্থে রয়েছে সব কিছুর বিস্তারিত বিবরণ। কেননা পবিত্র কোরআন শুধু মাত্র একটি গ্রন্থ নয়, বরং এটি হলো আল্লাহ পাকের কালাম, এ হলো সমগ্র বিশ্ব মানবের নামে মহান আল্লাহ্ পাকের সর্বশেষ পয়গাম, এ হলো এক বিরাট জ্ঞান-ভান্ডার। এতে শুধু ধর্মীয় নীতি কথাই নেই; বরং এতে রয়েছে ইতিহাস, বিজ্ঞান, রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়ম-কানুন, ব্যক্তি জীবনের পাশাপাশি সমাজ ও জাতীয় জীবনের বিধি-নিষেধ। মানব জাতির অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে বিস্তারিত হেদায়েত নামা। স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্কের তাৎপর্য, মানুষের কর্তব্য, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের নিয়ম-কানুন সবই এ মহান গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনকে হেফাজত করছেন, তাই তার প্রতিটি অক্ষর সংরক্ষিত রয়েছে।

অতএব, সত্যের খাতিরেই স্বীকার করতে হয় যে, পবিত্র কোরআন বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের মহান বাণী, যা বিশ্বনবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم
مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا
بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَانظُرْ
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٣٩﴾ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم
مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٤٠﴾ وَإِن كَذَّبُوكَ
فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ
مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾

তরজমা

(৩৮) তারা কি বলে যে, তিনি তা রচনা করে এনেছেন? (হে রসূল!) আপনি বলুন, তবে তোমরা এর অনুরূপ একখানি সূরা তৈরী করে পেশ কর, আল্লাহ্ পাক ব্যতীত যাকে পার ডেকে আন যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

(৩৯) মূল কথা হলো যা বুঝবার শক্তি তাদের নেই এবং যার তাৎপর্য কখনও তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়নি, তারা তাকেই মিথ্যা বলে বেড়ায়। এভাবে তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল। অতএব, দেখ জালেমদের পরিণাম কত ভয়াবহ হয়েছিল।

(৪) তাদের কেউ কেউ পবিত্র কোরআনকে বিশ্বাস করবে, আর কিছু লোক বিশ্বাস করবে না। আর আপনার প্রতিপালক অশান্তি সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

(৪১) আর (হে রসূল!) যদি তারা আপনার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে আপনি বলুন আমার কর্মের দায়িত্ব আমার, আর তোমাদের কর্মের দায়িত্ব তোমাদের। আমি যা কিছু করি সে বিষয়ে তোমরা দায়ী নও। আর তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কেও আমি দায়ী নই।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের ন্যায় এ আয়াতেও পবিত্র কোরআনের সত্যতা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের প্রতি ঈমান আনয়নের আহ্বান রয়েছে। পবিত্র কোরআন সম্পর্কে কাফের মুশরেকরা যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতো অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় এবং অকাট্য দলিল প্রমাণ দ্বারা তা নিরসন করা হয়েছে। মক্কার কাফেরদের ভ্রান্ত

ধারণা ছিল এই যে, পবিত্র কোরআন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রচনা, আল্লাহ্ পাকের কালাম নয়। এ ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ

তারা কি বলে যে, পবিত্র কোরআন তিনি রচনা করে এনেছেন? অর্থাৎ কাফেররা এ কথা বলতে চায় যে, পবিত্র কোরআন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহে ওয়াসাল্লামের রচনা (নাউজুবিল্লাহ), (হে রসূল!) আপনি কাফেরদেরকে বলুন, তোমরা যদি এমন অপবাদ দিতে চাও এবং এ ভিত্তিহীন কথা বল যে, কোরআন আমি তৈরী করেছি তবে জেনে রেখো, আমি যেমন মানুষ তোমরাও তেমনি মানুষ। তোমরা পবিত্র কোরআনের ন্যায় একটি মহান গ্রন্থ নয়, বরং একটি ক্ষুদ্রতম সূরার সমান সূরা রচনা করে হাযির কর। তামরা জান আমি উম্মী, আমি কোন মানুষের নিকট লেখা পড়া শিখতে যাইনি। যদি আমার পক্ষে এমন কোরআন রচনা করা সম্ভব হয় তবে তোমাদের পক্ষে কেন সম্ভব হবে না?

এতদ্ব্যতীত তোমাদের এক দু'জন নয়; বরং বিশ্বের সমস্ত গুণী-জ্ঞানী, দক্ষ, অভিজ্ঞ কবি-সাহিত্যিক-শিক্ষাবিদ-ভাষাবিদ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি ক্ষুদ্রতম সূরা রচনা করার আহ্বান জানাই। তবে জেনে রেখো তোমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেও পবিত্র কোরআনের অনুরূপ কোন সূরা পেশ করতে সক্ষম হবে না। তাই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا
يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا. (সূরা) বনী ইসরাইল)

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, যদি সমগ্র মানব জাতি এবং জ্বীন জাতি একত্রিত হয় এ বিষয়ের উপর যে, কোরআনের ন্যায় কোন সূরা আনয়ন করবে তারা কোন দিন তা পারবে না, যদিও তারা একে অন্যের সাহায্যকারী হয়"।

এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

পবিত্র কোরআনের অনুরূপ সূরা আনয়নের লক্ষ্যে সাহায্য করার জন্যে আল্লাহ্ পাক ব্যতীত তোমরা যাকে ইচ্ছা তাকে ডাকতে পার, যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও। তাদের দাবী হলো, পবিত্র কোরআন মানুষের রচিত গ্রন্থ (নাউজুবিল্লাহ মিন জালেক)। এর জবাব হলো এই, যদি কোরআন শরীফ কোন মানুষ তৈরী করতে পারে তবে তোমরা এক দু'জন নয়; বরং সমগ্র মানব জাতি একত্রিত হয়ে পবিত্র কোরআনের কোন একটি ক্ষুদ্রতম সূরার ন্যায় সূরা রচনা করে পেশ কর, যদি সাহস থাকে

তবে করে দেখাও। এমনিভাবে সূরায়ে বাকারায়ও কাফের মুশরেকদেরকে পবিত্র কোরআনের মোকাবেলা করার জন্যে আহ্বান করে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ.... الاية

"যদি তোমরা আমি যা কিছু আমার বন্দার প্রতি নাযিল করেছি সে সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ কর তবে তোমরা অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন কর এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের তথাকথিত সাহায্যকারীদেরকেও আহ্বান করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও"।

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ.

অতএব, যদি পবিত্র কোরআনের অনুরূপ সূরা রচনায় সক্ষম না হও আর কখনও সক্ষম হবে না তবে সেই দোযখকে ভয় কর যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং প্রস্তর, যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্যে। যদিও কাফেররা পবিত্র কোরআনের কোন সূরার অনুরূপ সূরা আনয়নে সক্ষম হয়নি কিন্তু পবিত্র কোরআনের শত্রুতাও তারা পরিত্যাগ করেনি; বরং পবিত্র কোরআনের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র সর্বদা অব্যাহত থাকে। কিন্তু আল্লাহ পাকের কুদরত ও রহমতে পবিত্র কোরআন আজও স্ব-মহিমায় বিরাজমান রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। কেউ কোন দিন পবিত্র কোরআনের মহিমাকে বাঁধা দিতে পারেনি এবং কোন দিন পারবেও না।

بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ

বরং তারা এমন বিষয়ের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে যা বুঝবার ক্ষমতা তাদের নেই এবং যার তাৎপর্য কখনও তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়নি। তাই তারা মিথ্যা বলে বেড়ায়। অর্থাৎ যেহেতু তারা কোরআনে করীমের মর্মকথা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, আল্লাহ্ পাকের মহান বাণীর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না, জানতে চেষ্টাও করেনা, এ সম্পর্কে চিন্তাও করেনা তাই তারা মূর্খতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন অবস্থায় কোরআনে করীমের উপর মিথ্যা আরোপ করে। পবিত্র কোআন স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের কালাম যা বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে, বিশ্বনবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হযেছে। এ জ্যোতির্ময় মহান বাণী রচনা করা মানুষের শক্তির উর্ধ্বে। মানুষের জন্যে এমন কালাম রচনা করা সম্পূর্ণ অচিন্ত্যনীয়। পবিত্র কোরআনে যে গায়বী খবর রয়েছে, বিশ্ব জগতের সৃষ্টি ও লয় সম্পর্কে যে তথ্য রয়েছে, নেক আমলের সওয়াব, মন্দ কাজের শাস্তির যে ঘোষণা রয়েছে তা এখনও প্রকাশিত হয়নি। তাই তারা সওয়াব বা আযাব কিছুই দেখছে না। আর মূর্খতার কারণে নিজেদের পরিণাম সম্পর্কেও চিন্তা করতে পারছে না। বুদ্ধিমানের কাজ হতো যদি তারা পূর্ব-কালের আসমানী কিতাব সমূহের পারদর্শী লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করতো যে, কোরআনে করীমে এসব কথা আছে অন্যান্য আসমানী কিতাব সমূহেও কি এসব কথার উল্লেখ রয়েছে? এভাবে পবিত্র কোরআনের সত্যতা তাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হতো।

পবিত্র কোরআনের ভাষার মাধুর্য, অলৌকিক মহিমা, মর্মস্পর্শী বর্ণনা-ভঙ্গী এবং হৃদয়গ্রাহী যুক্তি, ভাষার অলংকার প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য শুধু সে সব লোকের নিকট প্রকাশিত হয় যারা এ সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করে এবং কোরআনের বিষয় সমূহের জ্ঞান অর্জনে প্রয়াসী হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ এ কাফেররা পবিত্র কোরআনের প্রাঞ্জল ভাষার প্রতিও লক্ষ্য করেনি, তার পন্ডিত্যপূর্ণ, মর্মস্পর্শী তত্ত্ব ও তথ্যের সন্ধানও করেনি। অথচ এই নূরানী কালামকে তারা অস্বীকার করেছে। তাদেরকে বার বার আল্লাহ্ পাকের মহান বাণী শ্রবণের জন্যে আহ্বান জানানো হয়ছে অথচ তারা আল্লাহ্ পাকের পূতঃ পবিত্র কালামের মোকাবেলায় সর্বশক্তি নিয়োগ করে। আর এভাবে তারা এ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে যে, পবিত্র কোরআনের মোকাবেলা করে তাকে প্রতিরোধ করা যাবে না। আর তারা এ সত্যও উপলব্ধি করে যে, পবিত্র কোরআন অলৌকিক। তার মোকাবেলা করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। পবিত্র কোরআনে প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ একের পর এক সত্য প্রমাণিত হলো। যেমন–

الٓمٓ - غُلِبَتِ الرُّوْمُ

রোমানরা পরাজিত হয়ে গেল কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে পুনরায় তারা বিজয়ী হবে এবং অবশেষে এ সত্যই প্রমাণিত হয়েছে যে, পবিত্র কোরআনের গায়বী খবর সত্য। ঠিক এমনিভাবে–

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ

এ সূরায় আবু লাহাবের ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, আর তা অতি অল্প সময়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। এসব দেখে কিছু লোক ঈমান এনেছে আর কিছু লোক জেদের বশীভূত হয়ে ঈমান আনেনি, কাফেরই রয়ে গেছে। তারাও এ সত্য উপলব্ধি করেছে যে, নিঃসন্দেহে পবিত্র কোরআন আল্লাহর কালাম। কিন্তু শত্রুতার কারণে তা তারা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আর আল্লাহর কালাম এবং আল্লাহর প্রেরিত নবী রসূলকে তারা অস্বীকার করেছে, এমনকি তাঁর বিরোধিতায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। আর এটি নতুন কিছু নয়; বরং

كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

পূর্ববর্তী লোকেরাও এভাবেই আল্লাহর কিতাবকে এবং নবীগণকে অস্বীকার করেছে। অতএব, যেভাবে পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম শোচনীয় হয়েছে ঠিক এভাবে যারা পবিত্র কোরআনকে বাঁধা দেয় তাদের পরিণামও ভয়াবহ হবে। তাই এরশাদ হয়েছে–

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ

দেখো জালেমদের পরিণাম কি হয়েছে? বর্তমানে যারা আল্লাহর রসূলের বিরোধিতা করে যদি তারা এ অন্যায় থেকে বিরত না হয় তবে তাদের পরিণতিও তেমনই হবে যেমন পূর্বকালের জালেমদের হয়েছিল।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ

এদের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যে, চিন্তা চর্চার পর তারা পবিত্র কোরআনের সত্যতার উপর ঈমান আনে। অথবা এর অর্থ হলো যখন ভবিষতে কোরআনে করীমের সত্যতা তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দেবে তখন তারা ঈমান আনবে এবং কুফর ও নাফরমানী থেকে তওবা করবে। আর তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা কখনও ঈমান আনবে না। অত্যন্ত নির্বোধ এবং অপরিণামদর্শী হওয়ার কারণে তারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি কখনও ঈমান আনবে না। তারা কাফের অবস্থায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ

(হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক অশান্তি সৃষ্টিকারীদেরকে খুব ভাল ভাবেই জানেন আর যারা অশান্তি উপদ্রব সৃষ্টি করে আল্লাহ্র অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, জুলুম অত্যাচার এবং দৌরাত্মে অবিচল থাকে, তাদের আযাবের ব্যবস্থা রয়েছে বিরাট আকারে। আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ভাল ভাবেই জানেন। অতএব, তাদের রেহাই পাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই।

وَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ

এটি এ পর্যায়ের শেষ কথা, যখন আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদ, রসূলের রেসালত এবং পবিত্র কোরআনের সত্যতার যাবতীয় দলিল প্রমাণ পেশ করা হয় তখনও দূরাত্মা কাফের মুশরেকরা (হে রসূল!) আপনার সত্যতাকে অস্বীকার করে, পবিত্র কোরআনের প্রতি ঈমান আনেনা।

আপনার রেসালতকে অমান্য করে এবং আপনাকে মিথ্যাজ্ঞান করে তখন আপনি তাদেরকে বলে দিন, আমার আমল আমার জন্যে, তোমাদের আমল তোমাদের জন্যে। প্রত্যেকেই আল্লাহ্ পাকের দরবারে নিজের কৃতকর্মের জন্যে দায়ী থাকবে। আমার আমলের জন্যে তোমরা দায়ী হবে না, আর তোমাদের আমলের জন্যেও আমি দায়ী হবো না। আমার কর্মের বিনিময় আমি পাব, আর তোমাদেরকে তোমাদের কর্মের বদলা দেয়া হবে। আমি তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসন্তুষ্ট। তাই তোমাদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসিত হবো না। আমি তোমাদেরকে যা কিছু বলি তা তোমাদের কল্যাণের জন্যেই বলি।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ্ পাক যে জিনিস দিয়ে আমাকে প্রেরণ করেছেন তার এবং আমার অবস্থার দৃষ্টান্ত হলো সে ব্যক্তির ন্যায় যে তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলেছে, আমি ঐ পাহাড়ের অপর দিকে শত্রু বাহিনী দেখে এসেছি, যারা রাতের শেষ প্রহরে তোমাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে তোমাদেরকে হত্যা করবে। আমি তোমাদেরকে এ মহা বিপদ সম্পর্কে অবহিত করছি। তোমরা অতি সত্বর এখান থেকে বের হয়ে যাও, অনতিবিলম্বে পলায়ন কর, এই ব্যক্তির কথা কিছু লোক বিশ্বাস করলো। রাতের অবকাশের সদ্ব্যবহার করে সে স্থান থেকে পলায়ন করলো এবং দুশমনের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হলো। কিন্তু কিছু লোক ঐ

ব্যক্তিকে মিথ্যাজ্ঞান করে। সকাল পর্যন্ত সে স্থানেই রয়ে গেল। দুশমন অতি প্রত্যুষে তাদের উপর আক্রমণ করে সকলকে ধ্বংস করলো। এ অবস্থাই সে সব লোকের, যারা আমি যে শিক্ষা নিয়ে এসেছি তা মেনে চলেছে এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। অথবা আমাকে মিথ্যাজ্ঞান করে আমার প্রতি ঈমান আনেনি। এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ ؕ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوْا لَا يَعْقِلُوْنَ
﴿٤٢﴾ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّنْظُرُ اِلَيْكَ ؕ اَفَاَنْتَ تَهْدِى الْعُمْىَ وَ لَوْ كَانُوْا لَا
يُبْصِرُوْنَ ﴿٤٣﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَّلٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ
يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ ؕ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوْا
مُهْتَدِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَ اِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ
فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٤٦﴾

তরজমা

(৪২) (হে রসূল!) তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপনার দিকে কান পেতে থাকে। আপনি কি বধিরকে শোনাবেন? যদিও তারা বুঝতে না পারে।

(৪৩) তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপনার দিক তাকিয়ে থাকে, আপনি কি অন্ধকে পথ দেখাবেন? তারা না দেখলেও?

(৪৪) আল্লাহ্ পাক মানুষের প্রতি কিছু মাত্রও অবিচার করেন না, কিন্তু মানুষ নিজেদের প্রতি অবিচার করে।

(৪৫) আর যেদিন তিনি তাদেরকে সমবেত করবেন (সেদিন) তারা মনে করবে যেন দিনের একটি মুহূর্ত মাত্র তারা অবস্থান করেছিল, তারা পরস্পরকে চিনতে পারবে। যারা আল্লাহ্ পাকের মোলাকাতকে অস্বীকার করেছে তারা সর্বস্বান্ত হয়েছে। মূলতঃ তারা সঠিক পথই পায়নি।

(৪৬) আর (হে রসূল!) আমি তাদেরকে যে বিষয়ে ভয় প্রদর্শন করেছি তার কোন একটা যদি আপনাকে দেখাই বা আপনাকে ওফাত দান করি তবুও তাদেরকে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে। আর তারা যা কিছু করে আল্লাহ্ পাকই তার সাক্ষী।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ মানুষের মধ্যে দু' দল রয়েছে, এক দল আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনে আর একদল ঈমান আনেনা।

আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যারা ঈমান আনেনি তারাও দু' ভাগে বিভক্ত। তাদের একদল হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চরম শত্রু, ইসলামের ঘোর বিরোধী। আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনতে রাজি নয়। আর একদল এমন নয়। আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের প্রথম দলের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ (হে রসূল!) তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা আপনার কথা কান পেতে শ্রবণ করে, যখন আপনি পবিত্র কোরআন পাঠ করেন, শরীয়তের মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্য বর্ণনা করেন তখন দেখা যায় প্রকাশ্যে তারা কান পেতে শ্রবণ করে এবং তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা আপনারা দিকে তাকিয়ে দেখে কিন্তু তাদের এই দেখা বা শোনার সঙ্গে তাদের মনের কোন মিল থাকেনা। অতএব, তাদের দেখা বা না দেখা, শোনা বা না শোনা একই সমান। এ দু' অবস্থার মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। এজন্যে মওলানা রুমী (রঃ) বলেছেনঃ

این سخن راز گوش دل باید شنود = گوش گل اینجا ندارد ہیچ سود

"একথা (দ্বীন ইসলামের কথা) শ্রবণ করতে হবে মনের কর্ণে, চর্মের কর্ণ এখানে কোন প্রকার উপকারে আসেনা। তারা আসলে অন্ধ এবং বধিরের ন্যায়, চক্ষু থাকা সত্ত্বেও তারা অন্ধ, আর শ্রবণ শক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা বধির"।

প্রিয়নবী (সা.)-কে সান্ত্বনা

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, কাফেররা আপনার প্রতি ঈমান আনেনা এজন্যে আপনি মর্মাহত হবেন না। কেননা, তারা মনের দিক থেকে অন্ধ ও বধির। তারা আপনার কথা এবং পবিত্র কোরআন সত্যিকার অর্থে-তথা মনের কর্ণে শ্রবণ করেনা। এজন্যে তাদের ঈমান থেকে মাহরুম হওয়ার ব্যাপারে আপনার কোন দায়িত্ব নেই। যারা বধির আপনি তাদেরকে শোনাতে পারবেন না। এমনিভাবে তারা আপনার চরিত্র মাধুর্য দেখে, আপনার নবুওয়্যতের জীবন্ত নিদর্শন সমূহ দেখে কিন্তু দেখেও তারা যেন দেখে না, তাই তারা অন্ধ। আর (হে রসূল!) আপনি অন্ধকে পথ দেখাতে পারবেন না। অতএব, তাদের ঈমান না আনায় দুঃখিত হবেন না, কেননা আপনি অন্ধ বধিরকে হেদায়েত করতে পারবেন না।[১]

---

১. তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১১, পৃষ্ঠা-৬০

ইমাম রাজী (রঃ) আরো লিখেছেন, কোন মানুষের অন্তরে যখন অন্য মানুষর ব্যাপারে চরম শত্রুতা থাকে তখন সে তার শত্রুর দোষ অন্বেষণে তৎপর থাকে। ঐ ব্যক্তির গুণ সে দেখেও দেখে না তার ভাল কথা শুনেও শোনেনা। কাফেরদের শত্রুতা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল বলেই তারা হেদায়েত লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে।[১]

তাদের মধ্যে যারা আপনার দিকে তাকিয়ে দেখে তারা সত্যের উজ্জ্বল প্রমাণ এবং নবুওয়্যতের সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ আপনার মধ্যে দেখতে পায়। কিন্তু যেহেতু তাদের মন অন্ধ, তাই তাদের চর্ম চক্ষের দেখা তাদের জন্যে উপকারী হয় না। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَفَاَنْتَ تَهْدِى الْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوْا لَا يُبْصِرُوْنَ

(হে রসূল!) তবে কি আপনি অন্ধদেরকে পথ দেখাবেন যদিও তারা কিছুই বোঝে না? যেহেতু তাদের মন ঈমান আনয়নে প্রস্তুত নয়, সত্য-সন্ধানে আগ্রহী নয় তাই তাদেরকে অন্ধ বলা হয়েছে। প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অসাধারণ গুণাবলী, তাঁর ফজিলত ও মাহাত্ম এবং তাঁর বিস্ময়কর মোজেযা তথা অলৌকিক ক্ষমতা তারা চোখে দেখে কিন্তু মন যেহেতু বিদ্রোহী তাই তারা ঈমান আনেনা, তারা যে অন্ধ বধির।

বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যের অনেক লেখক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী প্রকাশ করে বহু গ্রন্থ রচনা করেছে। ইসলামের প্রশংসায়ও তারা ক্ষেত্র বিশেষে পঞ্চমুখ কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইসলামের ক্ষতি সাধনে তারা তৎপর এবং ইসলামের মহান শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত। তাই তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত বিশেষভাবে প্রযোজ্য।[২]

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـًٔا

নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক মানুষের প্রতি কিছুমাত্র অবিচার করেন না, কিন্তু মানুষ নিজেরাই নিজেদের প্রতি অবিচার করে। মানুষ মাত্রকে আল্লাহ্ পাক বিবেক বুদ্ধি দান করেছেন, যার মাধ্যমে সে ভাল এবং মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে, কিন্তু মানুষ যখন বিবেক বুদ্ধিকে সঠিকভাবে প্রয়োগ না করে তখন সে আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করে না, স্বভাব ধর্ম ইসলামকে গ্রহণ করতে রাজি হয় না, ইসলামের মহান শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করে।

দ্বীনি শিক্ষার দৃষ্টান্ত

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ্ পাক যে দ্বীনি শিক্ষা দিয়ে আমাকে প্রেরণ করেছেন তার দৃষ্টান্ত হলো এই, যেমন কোন জমিনের উপর বৃষ্টিপাত হলো। জমিনের যে অংশ ভাল হয় তা পানিকে গ্রহণ করে। ফলে সে

---

১. তফসীরে কবীর খন্ড-১৭ পৃষ্ঠা-১০০-০১

২. তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৪২

এলাকা শস্য-শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ হয়। আর জমিনের যে অংশটি পাথরে পূর্ণ এবং শক্ত হয় সে পানিকে নিজের মধ্যে আটকে রাখে (পানির কারণে সে জমিনে কোন উদ্ভিদ জন্ম গ্রহণ করে না) কিন্তু আল্লাহ্ পাক তার দ্বারা মানুষকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দান করেন। মানুষ সে পানি ব্যবহার করে ফসলের জমি সেচ করে। কিন্তু জমিনের কিছু অংশ এমনও হয় যা উন্মুক্ত ময়দান। পানি বর্ষিত হয় এবং প্রবাহিত হয়। সে উন্মুক্ত ময়দান পানিকে নিজের ভেতর ধরে রাখতে পারে না, আর তা দ্বারা জমিনে সজীবতাও সৃষ্টি হয়না।

ঠিক এ অবস্থাই দ্বীন ইসলামের। কিছু সংখ্যক লোক দ্বীন ইসলামকে বোঝে। আল্লাহ্ পাক যে শিক্ষা দিয়ে আমাকে প্রেরণ করেছেন তা দ্বারা তারা উপকৃত হয়, নিজে শেখে অন্যকে শেখায়। আর কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা দ্বীন ইসলামের দিকে কখনও ফিরেও তাকায় না এবং যে হেদায়েত দিয়ে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে তা গ্রহণ করে না (হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত এই হাদীস সকল হাদীস গ্রন্থেই সংকলিত হয়েছে)।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী আলোচ্য আয়াতের এ অর্থ বর্ণনা করেছেনঃ "নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক মানুষের প্রতি অবিচার করেন না"। এর অর্থ হলো আল্লাহ্ পাক বিবেক বুদ্ধি এবং অনুধাবনের শক্তি ছিনিয়ে নিয়ে কাউকে হেদায়েত গ্রহণের আদেশ দেন না। আল্লাহ্ পাক এমন জুলুম কারো প্রতিই করেন না। একথার তাৎপর্য হলো এই-মানুষকে আল্লাহ্ পাক কর্ম শক্তি ও স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দান করেছেন। এ শক্তি তিনি ছিনিয়ে নেননা। ভাল মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার শক্তিও দান করেছেন। যদি কোন ব্যক্তি এ শক্তির সদ্ব্যবহার না করে অথবা অন্যায় কাজ করে তবে এটি অপরাধ। এর দ্বারা বতিল ফেরকা জবরিয়ার ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিবাদ হয়, যারা মানুষকে পাথরের মত অসহায় এবং বাধ্য মনে করে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাও করেছেন যে, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে এবং পবিত্র কোরআনকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে রয়েছে এ আয়াতে বিশেষ সতর্কবাণী। কেয়ামতের দিন তারা যে কঠোর কঠিন আযাব ভোগ করবে তা তাদের প্রতি জুলুম হবে না; বরং সম্পূর্ণ ন্যায় বিচার হবে। কেননা, আযাবের সকল উপকরণ তারা নিজেরাই অবলম্বন করেছিল, যার পরিণামে তাদের প্রতি আযাব হবে।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন যে, আল্লাহ্ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি সকলের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। তিনি কারো প্রতি জুলুম করেন না।

হাদীসে কুদসীতে রয়েছে, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ হে আমার বন্দাগণ! আমি জুলুম করা নিজের উপর হারাম করে নিয়েছি। আমি তোমাদের উপরও জুলুম করা হারাম ঘোষণা করছি। অতএব তোমরা একে অন্যের প্রতি জুলুম করোনা, তোমাদের যাবতীয় কৃতকর্ম আমার দৃষ্টিতে রয়েছে। আমি প্রত্যেক কর্মেরই বিনিময় দান করি। যে উত্তম

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫০৮

বিনিময় পায় তার কর্তব্য হলো আল্লাহ্ পাকের শোকর আদায় করা, আর যে শাস্তি ভোগ করে তার উচিত নিজেকেই তিরস্কার করা।[১]

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَّمْ يَلْبَثُوٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ

কাফেরদের পরিতাপ

যারা প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতকে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর মহান আদর্শকে অমান্য করেছে, পূর্ববর্তী আয়াতে তাদের নির্বুদ্ধিতার কথা বলা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে তারা কেয়ামতের দিনের ভয়ংকর অবস্থা দেখে দুনিয়ার জীবনের জন্যে যে আক্ষেপ করবে তার বিবরণ রয়েছে। যেমন কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে কাফেরদের আক্ষেপ এবং পরিতাপের কথা এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا.

(কেয়ামতের দিন) কাফেররা আক্ষেপ করে বলবে হায় আক্ষেপ! যদি আমরা মাটিই থাকতাম অর্থাৎ যদি মানব রূপ ধারণ না করতাম তবে আজ এই মহা বিপদের সম্মুখীন হতাম না।

আর অন্যত্র তাদের আক্ষেপের কথা এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ

(যদি এ জীবনের জন্যে আমরা কিছু করে পাঠাতাম) ঠিক এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতেও কাফেররা তাদের এ জীবনের ব্যর্থতা এবং আখেরাতের আযাব দেখে যে আক্ষেপ করবে তা এরশাদ হয়েছেঃ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَّمْ يَلْبَثُوٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ

যেদিন আল্লাহ পাক তাদেরকে একত্রিত করবেন সেদিন তারা উপলব্ধি করবে যে, পৃথিবীতে এক মুহূর্তের বেশী তারা অবস্থান করেনি, কেয়ামতের দিনের ভয়াবহ দৃশ্য দেখে তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবে যে দুনিয়ার আনন্দ উল্লাস, আরাম-আয়েশ যেন ক্ষণিকের ব্যাপার ছিল এবং এ বিপদের তুলনায় দুনিয়ার আনন্দ-উল্লাস ছিল অতি তুচ্ছ, অতি হীন। কেয়ামতের দিনের মহা বিপদ লক্ষ্য করে তাদের পরিতাপের অন্ত থাকবে না। অথচ দুনিয়াতে তারা অনেক দিন অতিবাহিত করেছে এবং আলমে বরজখ বা মধ্যলোকেও তারা সুদীর্ঘ কাল রয়েছে। কিন্তু আখেরাতের চিরস্থায়ী বিপদ সংকুল জীবনের তুলনায় তা মনে হবে যেন এক মুহূর্তই অতিবাহিত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

---

[১]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১১, পৃষ্ঠা-৬০

হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা থানবী (রঃ) লিখেছেন, যেহেতু কেয়ামতের দিন অতি সুদীর্ঘ এবং অত্যন্ত কঠিন হবে, তাই দুনিয়ার এবং মধ্যলোকের জীবন সম্পর্কে মনে হবে যে, অতি শীঘ্র তা অতিবাহিত হয়েছে।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ সম্পর্কে লিখেছেন, যেহেতু কাফেররা এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের আনন্দ উল্লাসে এবং এখানকার সম্পদ আহরণে মুগ্ধ-মত্ত থাকে, পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে কোন সহায় সম্বল সংগ্রহ করে না তাই এ জীবন হয় ব্যর্থ, এর কোন অস্তিত্ব ছিল বলে তাদের মনে হয়না, বিশেষতঃ যখন তারা আখেরাতের ভয়ংকর দৃশ্য দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হবে তখন দুনিয়ার জিন্দেগীর আনন্দ-উল্লাসের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যাবে। দ্বিতীয়ত, আখেরাতের চিরস্থায়ী আযাবের মোকাবেলায় ক্ষণস্থায়ী জীবনের আনন্দ-উল্লাসের কোন গুরুত্বই থাকে না।

তৃতীয়ত, যেহেতু কেয়ামতের ময়দানের এক দিন দুনিয়ার ৫০ হাজার বছরের সমান হবে, এভাবে তারা লক্ষ লক্ষ বছর চরম কষ্টে হিসাব-নিকাশের অপেক্ষায় থাকবে। এ অবস্থায় দুনিয়ার জীবন অতি সামান্য মনে হবে। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

لَّمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ

"তারা উপলব্ধি করবে যে, পৃথিবীতে তারা এক মুহূর্তের বেশী অবস্থান করেনি"।

يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ

অর্থাৎ তারা পুনরুত্থানের পর একে অন্যকে চিনতে পারবে, যেমন দুনিয়াতে একের সঙ্গে অন্যের পরিচয় ছিল, তখন মনে হবে পরস্পর ইতিপূর্বে একত্রেই ছিল। অল্পক্ষণ বিচ্ছিন্ন থাকার পর পুনরায় তারা একত্রিত হয়েছে। কিন্তু পারস্পরিক এ পরিচয় কারো কোন কাজেই আসবে না। কেননা প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। নিজের চিন্তায় এত অস্থির এবং ব্যাকুল থাকবে যে, অন্যের সম্পর্কে চিন্তা করার অবস্থাই থাকবেনা, যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ - وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ - وَصَٰحِبَتِهِۦ وَبَنِيهِ

"সেদিনকে স্মরণ কর যেদিন মানুষ তার ভাই থেকে, মা থেকে, বাপ থেকে, স্ত্রী থেকে এবং সন্তান থেকে পলায়ন করবে"।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, পরস্পরের পরিচয় হবে কবর থেকে পুনরুত্থানের পর, তবে কেয়ামতের ভয়ংকর অবস্থা দেখার পর একে অন্যের পরিচয় ভুলে যাবে।

কোন কোন হাদীসে একথাও আছে যে, মানুষ তার নিকটস্থ ব্যক্তিকে চিনে ফেলবে, কিন্তু ভয়-ভীতি এত বেশী থাকবে যে, একে অন্যের সঙ্গে কথা বলতে সক্ষম হবেনা।

---

[১]। তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা-৪৩৫

দুনিয়ার সম্পদ অতি সামান্য

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে কেয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য তলে ধরা হয়েছে যে– "তোমরা স্মরণ কর সেদিনকে যখন পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হবে, তখন মানুষ মাত্রই উপলব্ধি করবে যে, দুনিয়াতে সে দিনের কিছু অংশ হয় সকাল বেলা, অথবা বিকেল বেলা অতিবাহিত করেছে"। যারা পাপীষ্ঠ তারা বলবে না, আমরা এক ঘন্টার বেশী দুনিয়াতে অতিবাহিত করিনি। এ উপলব্ধি এ সত্যের প্রমাণ যে, আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন অতি সামান্য, অত্যন্ত নগণ্য। পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ.

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, দুনিয়ার সম্পদ অতি সামান্য।

[illegible] ছেঃ

وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى.

আর আখেরাত উত্তম এবং চিরস্থায়ী"। সেদিন জিজ্ঞাসা করা হবে তোমরা দুনিয়াতে কত দিন অতিবাহিত করেছ? পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ - قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْبَعْضَ يَوْمٍ

তোমরা দুনিয়ার জীবনে কত বছর অতিবাহিত করেছ? তারা বলবে একদিন অথবা তার চেয়ে কম। কেয়ামতের দিন পিতা-পুত্র, মাতা-কন্যা সকলেই একে অন্যের পরিচয় পাবে, কিন্তু সেদিনের ভয়াবহ অবস্থার কারণে একে অন্যকে সাহায্য করার সুযোগ থাকবে না।[১]

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ

যারা আল্লাহ পাকের মোলাকাতকে মিথ্যা বলেছে তারা সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। যারা কেয়ামতের দিনকে অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হতে হবে এ কথাকে অবিশ্বাস করেছে, কেয়ামতের দিন তাদের ধ্বংস অনিবার্য হবে। বস্তুতঃ তারা হেদায়েত প্রাপ্ত ছিল না, এ কারণেই তারা সর্বস্বান্ত হবে।

যারা আল্লাহর মোলাকাতকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে তথা আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হতে হবে এবং জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব দিতে হবে– একথায় যারা বিশ্বাস করেনা তারা কেয়ামতের দিন চরম বিপদের সম্মুখীন হবে।

وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ

---

[১]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১১, পৃষ্ঠা-৬১

(হে রসূল!) কাফেরদের সম্পর্কে যে আযাবের অঙ্গীকার করেছি যদি তা আপনাকে দেখিয়ে দেই তবে আপনি দেখে নেবেন (অর্থাৎ আযাব নাজিল হওয়ার পূর্বে) অথবা যদি আপনাকে আমি ওফাত দিয়ে দেই, তবে আপনি আখেরাতে তা দেখবেন। আর আমার নিকটইতো সকলকে ফিরে আসতে হবে। অতএব, তাদের কেউ এ আযাব থেকে রক্ষা পাবে না।

ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ

আর একথা সর্বজন বিদিত যে, আল্লাহ পাক তাদের যাবতীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। আর এ অবগতির ভিত্তিতেই তাদেরকে তিনি শাস্তি দেবেন। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে ثُمَّ (সুম্মা) "এবং" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ হবে আল্লাহ পাক তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত, তাদের সকলকে আল্লাহ্ পাকের দরবারে ফিরে যেতে হবে।

ارے عاقل نہ ہو غافل تجھے دنیا سے جانا ہے = تجھے آخر خدا کو منہ اپنا ایک دن دکھانا ہے

"হে বুদ্ধিমান! গাফেল হয়োনা"। তোমাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে, অবশেষে তোমাকে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হতেই হবে"। তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, আল্লাহর আযাবের যে অংশটি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখানো হয়েছে তাহলো, বদরের যুদ্ধের দিনের আযাব। মক্কার পৌত্তলিক সর্দারদের পরাজয় বরণ এবং তাদের হত্যা ও চিরস্থায়ী শাস্তি।

আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিশেষভাবে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছেঃ (হে রসূল!) কাফেরদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে এবং ইসলামের বিজয় অবশ্যই হবে। এ ওয়াদার কিছু কিছু অংশ (হে রসূল!) আপনার জীবদ্দশায়ই আপনাকে দেখাবো। যেমন বদরের যুদ্ধে আপনি কাফেরদের শোচনীয় পরিণাম দেখেছেন। আর যদি কোন কারণবশতঃ তাদের শাস্তি বিধানের পূর্বেই আপনাকে ওফাত দান করি তবুও তাদের শাস্তি অবশ্যই হবে, শাস্তি থেকে তাদের রেহাই নেই। কেননা, তাদেরকে অবশেষে আমার নিকটই হাযির হতে হবে। তাদের পলায়নের কোন স্থান নেই, তাই তাদের রক্ষা পাওয়ারও কোন সম্ভাবনা নেই। তফসীরকারগণ এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ইসলামের বিজয় সম্পর্কে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তার কোন কোন অংশ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই বাস্তবায়িত হবে, আর কোন কোন অংশ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবর্তমানে তাঁর খলিফাদের যুগে বাস্তবায়িত হবে। অবশেষে তাই হয়েছিল।[১]

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-২৭৬

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ
﴿٤٨﴾ قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ لِكُلِّ
اُمَّةٍ اَجَلٌ ؕ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا
يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٤٩﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُهٗ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا
مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٥٠﴾ اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ
آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا
ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٥٢﴾

তরজমা

(৪৭) প্রত্যেক জাতির জন্যেই রয়েছেন একজন রসূল। তাদের নিকট যখন রসূল এসেছেন তখন ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে মীমাংসা হয়েছে, তাদের প্রতি কোন প্রকার অবিচার হয়নি।

(৪৮) আর তারা বলে যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে বল এ ওয়াদা কবে পূর্ণ হবে?

(৪৯) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহ্ পাক যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার ভাল মন্দের উপরও আমার নিজের কোন অধিকার নেই, প্রত্যেক জাতির জন্যেই একটি সময় নিদৃষ্ট রয়েছে, যখন সে সময় উপস্থিত হবে তখন তারা এক মুহূর্তও বিলম্ব বা তাড়াহুড়া করতে পারবে না।

(৫০) (হে রসূল!) আপনি জিজ্ঞাসা করুন তোমরা কি ভেবে দেখেছ যদি তাঁর শাস্তি রাত্রে কি দিনে এসে পড়ে তবে পাপীষ্ঠরা কি ত্বরান্বিত করতে চায়?

(৫১) তবে কি যখন আযাব এসে পড়বে তখনই তোমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস করবে? এখন তোমরা উপলব্ধি করেছ যে, এরই জন্যে তোমরা তাড়াহুড়া করেছিলে।

(৫২) এরপর পাপীষ্ঠদেরকে বলা হবে চিরস্থায়ী আযাব ভোগ করতে থাক, তোমরা যা কিছু করেছিলে শুধু তারই বদলা তোমরা ভোগ করছো, এতদ্ব্যতীত আর কিছু নয়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর উম্মতের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে সামগ্রিক ভাবে সকল জাতির ব্যাপারে যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তার উল্লেখ রয়েছে।

এখানে একথা প্রনিধাণযোগ্য যে, আল্লাহ্ পাক প্রত্যেক জাতির মধ্যেই নবী রসূল প্রেরণ করেছেন, যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ.

(আর প্রত্যেক জাতির নিকটই ভয় প্রদর্শনকারী গিয়েছেন) আরো এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

"কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে রসূল প্রেরণ করা ব্যতীত আমি তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করিনা"। বস্তুতঃ কোন সম্প্রদায় বা জাতিকে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে অবহিত না করে, ভাল কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক না করে আল্লাহ্ পাক কারো শাস্তি বিধান করেন না। নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহ্ পাকের বিশেষ মেহেরবানী ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ

"আর প্রত্যেক জাতির জন্যেই একজন রসূল রয়েছেন, যখন তাদের নিকট রসূল পৌছেছেন তখন তাদের মাঝে ন্যায় বিচারের ভিত্তিতেই মীমাংসা হয়েছে এবং তাদের প্রতি কোন প্রকার জুলুম করা হয়নি"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যখন আল্লাহর রসূল তাঁর নবুওয়্যতের দলিল স্বরূপ মোজেযা পেশ করেছেন, আল্লাহ্ প্রদত্ত অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন তখনও কাফেররা তাঁর রেসালত মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এমন অবস্থায় আল্লাহ্ পাক ন্যায় নীতির সঙ্গে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, যারা রসূলকে অস্বীকার করেছে তাদেরকে ধ্বংস করেছেন, আর তাঁর রসূলকে এবং মোমেনদেরকে রক্ষা করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ

অর্থাৎ তাদের ব্যাপারে ইনসাফের সঙ্গে ফয়সালা করা হয়েছে তথা শাস্তি বিধানের ব্যাপারে তাদের প্রতি জুলুম করা হয়নি।

মুজাহেদ (রঃ) এবং মোকাতেল (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, প্রত্যেক উম্মতের নিকট আল্লাহ পাক তাঁর রসূল প্রেরণ করেছেন। কেয়ামতের দিন প্রত্যেক রসূল তাঁর উম্মতের ব্যাপারে ঈমান ও কুফরের সাক্ষ্য প্রদান করবেন। তখন আল্লাহ্ পাক ইনসাফ তথা সুবিচারের ভিত্তিতে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা করবেন। মোমেনদেরকে নাজাত দেবেন কাফেররা শাস্তি ভোগ করবে, যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَجِاْيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم

"এবং সেদিন নবীগণকে এবং সাক্ষীগণকে হাযির করা হবে এবং তাদের ব্যাপারে ফয়সালা করা হবে"।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ

কাফেররা শুধু যে আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনেনি এবং তাঁর বিরোধিতা থেকে বিরত হয়নি তাই নয়; বরং তাদেরকে তাদের অন্যায় অনাচারের জন্যে যে আযাবের ভয় প্রদর্শন করা হয় তার প্রতি বিদ্রুপ করে তারা বলতো যে, আল্লাহ্র তরফ থেকে আযাবের যে ঘোষণা করা হয়েছে তা কবে আসবে? আর ঐ আযাব আসতে এত বিলম্ব কেন?

দূরাত্মা কাফেররা এ কথাটি শুধু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নয়; বরং তাঁর সঙ্গী সাহাবায়ে কেরামকেও সম্বোধন করে বলতো, তাই পরবর্তী বাক্যাংশে বহু বচনের শব্দ ব্যবহার করে বলা হয়েছেঃ

إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ

"যদি তোমরা আযাবের ঘোষণার ব্যাপারে সত্যবাদী হও তবে ঐ আযাব কবে আসবে বল"? এটি কাফের মুশরেকদের ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নয় কেননা, আযাবের কথা শ্রবণ করে তাদের কর্তব্য ছিল ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া এবং নিজেদের ভয়াবহ পরিণাম চিন্তা করে শেরক সহ যাবতীয় পাপাচার পরিহার করা তথা ইসলাম গ্রহণ করা। কিন্তু তাদের দৌরাত্মের শেষ নেই, তাই তারা প্রশ্ন করলো ঐ আযাব কবে আসবে? সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেনঃ

قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ

(হে রসূল!) আপনি বলে দিন, আযাব কখন প্রেরণ করা হবে তা আল্লাহ পাকই জানেন। কেননা, আযাব প্রেরণ করা না করা শুধু আল্লাহ পাকেরই কাজ। এতে কারো কোন অধিকার নেই। তোমাদের প্রতি আযাব দেয়ার কোন অধিকার আমার নেই, আমি আল্লাহর বন্দা ও রসূল! আল্লাহ পাক আমাকে ওহীর মাধ্যমে যা জানিয়ে দেন আমি তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করি, আমার নিজের ভাল-মন্দের অধিকারও আমার নেই। আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর হাতেই রয়েছে সব কিছুর এখতিয়ার।

إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ

অর্থাৎ আমি আমার লাভ-ক্ষতির ব্যাপারেও কোন অধিকার রাখিনা শুধু যতটুকুর জন্যে আল্লাহ পাক মর্জি করেন। অথবা এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নেই।[১]

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫১০

অথবা এর অর্থ হলো, আমিতো মানুষ, আমি নিজের কোন উপকার করার অথবা কোন অপকার দূরীভূত করার শক্তিও রাখিনা। যা আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জি, তাই হয়। এমন অবস্থায় আমি তোমাদের জন্যে আযাব কি করে আনতে পারি?

আল্লাহ পাক আযাবের কথা ঘোষণা করেছেন, কিন্তু তিনি তার জন্যে কোন সময় নিদৃষ্ট করেননি। যখন তাঁর ইচ্ছা তখনই তিনি তোমাদের প্রতি আযাব নাযিল করবেন।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) আলোচ্য বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, কোন বন্দা তার লাভ বা ক্ষতির ব্যাপারে কোন অধিকার বা এখতিয়ার রাখেনা, তবে একটি অধিকার আছে তা হলো আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার অথবা অবাধ্য নাফরমান হওয়ার। অর্থাৎ আল্লাহ পাক মানুষকে এ জীবনে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দান করেছেন। ইচ্ছা করলে সে আল্লাহ পাকের অনুগত হয়ে জীবন-সাধনাকে সার্থক করতে পারে। আর ইচ্ছা করলে নাফরমান হয়ে নিজের সর্বনাশ করতে পারে।[২]

لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ

তোমরা তোমাদের জন্যে আযাবকে কেন ত্বরান্বিত করতে চাও? অথচ প্রত্যেক জাতির জন্যেই একটা সময় নিদৃষ্ট রয়েছে। সে নিদৃষ্ট সময় আসবে, এক মুহূর্তও বিলম্ব করা হবে না।

আর সে মুহূর্তের পূর্বেও ঐ আযাব আসবে না। আর সে মুহূর্ত কখন আসবে তা এক আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ জানে না। তাঁর ইচ্ছা এবং মর্জি মোতাবেকই তিনি সময় নিদৃষ্ট করে রেখেছেন। বিলম্বে হোক অথবা শীঘ্র সে আযাব অবশ্যই আসবে। অতএব, আযাবকে ত্বরান্বিত করার অপচেষ্টা করোনা, যেমন অন্য আয়াতেও এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا.

অর্থাৎ যখন কারো সময় উপস্থিত হয় তখন তাতে এক মুহূর্তও বিলম্ব হয়না। আর কাফেরদের প্রতি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হঠাৎ আযাব আসবে।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُهٗ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا

(হে রসূল!) আপনি জিজ্ঞাসা করুন যদি দিনে কি রাত্রে তোমাদের উপর আযাব আপতিত হয় তবে তোমরা কি করবে? রাত্রে যখন তোমরা নিদ্রিত থাক অথবা দিনে যখন তোমরা নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাক তখন যদি হঠাৎ আল্লাহ পাকের আযাব আপতিত হয় তখন আত্মরক্ষার জন্যে তোমরা কি করবে? অথচ এখন তোমরা আল্লাহর নাফরমানীতে মগ্ন রয়েছ, আল্লাহর আযাবকে ভয় কর-না। তোমাদের সর্বনাশ অবধারিত দেখেও আত্মরক্ষার সঠিক পন্থা অবলম্বন কর-না। দিনে কি রাতে যখন আল্লাহর আযাব তোমাদের প্রতি অতর্কিতে আক্রমণ করবে তখন তোমরা আত্মরক্ষার জন্যে অবকাশ পাবে কি?

---

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (র:) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫১০

[২]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-১০৮

আল্লাহ্র আযাবের মধ্যে এমন কি আনন্দ বা কল্যাণ রয়েছে যার জন্যে তোমরা তা ত্বরান্বিত করতে চাও? যখন তোমাদের প্রতি আযাব এসে পড়বে তখন তোমরা কি করবে?

أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ

তবে কি যখন আযাব আপতিত হবে তখনই তোমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস করবে? অথবা এর অর্থ হলো যখন তোমরা আযাবে নিপতিত হবে তখনও কি তোমরা তা ত্বরান্বিত করবে? বা আযাবের ব্যাপারে সতর্ককারীকে বিশ্বাস করবে?

آلْآنَ

আযাব দেখাব পর অথবা মৃত্যুর মুহূর্তে যদি তোমরা ঈমান আনয়ন করও তবু তা গ্রহণযোগ্য হবে না। অতএব, সে মুহূর্তে যদি তোমরা বিশ্বাস কর তবে তা তোমাদের জন্যে উপকারী হবে না। কেননা এ বিশ্বাস হবে নিতান্ত বাধ্য হয়ে। শরীয়তের বিধান হলো যখন আযাবের ফেরেশতা দেখা যায়, আলমে বরজখের কাজ শুরু হয়ে যায় তখন তওবা ও ঈমান গ্রহণযোগ্য হয়না।

وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ

অথচ আযাবের কথা মিথ্যা মনে করে এবং বিদ্রুপ করে তোমরা সে আযাবকে ত্বরান্বিত করেছিলে। তখন তোমরা আত্মরক্ষার কোন সুযোগ পাবে না এবং তখন তোমাদের কান্নাকাটি বা বিলাপও কোন উপকারী হবে না। অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا (সূরা মোমেন)

অর্থাৎ তারা আমার আযাব দেখে যদি ঈমান আনে তবে তা তাদের জন্যে উপকারী হবে না।

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ

এরপর জালেমদেরকে বলা হবে যে, তোমাদেরকে শুধু তোমাদের কৃতকর্মের বদলাই দেয়া হলো। একথাটি বলবেন আযাবের ফেরেশতাগণ।

ইমাম কুরতবী লিখেছেন, এ কথাগুলো বলবেন দোযখের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ফেরেশতাগণ। আলোচ্য আয়াতে الذين ظلموا (যারা জুলুম করেছে) বাক্য দ্বারা মুশরেকদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে শেরককে সবচেয়ে বড় জুলুম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

"নিশ্চয় শেরক হলো সর্বশ্রেষ্ঠ জুলুম"। অতএব যারা শেরক করে তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ জালেম। আর এ জালেমদের জন্যে রয়েছে দোযখের কঠিন শাস্তি। এ শাস্তি হবে চিরস্থায়ী।

তফসীরকারগণ বলেছেন, যতক্ষণ কোন অপকর্মের শাস্তি না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অনুতপ্ত হওয়া এবং তওবা করা উপকারী হয়। কিন্তু যখন অন্যায় আচরণের শাস্তি আপতিত হয় তখন তওবা গ্রহণযোগ্য হয় না।

এখানে এ-ও উল্লেখ্য, মোমেনের প্রতি দুনিয়াতে যদি কোন বালা-মসিবত আসে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার অবসান ঘটে। পক্ষান্তরে কোন কাফেরের প্রতি যদি কোন বালা-মসিবত বা আযাব আসে তবে তার মৃত্যুর পরও আযাব অব্যাহত থাকে। অবশ্য আযাবের প্রকার পরিবর্তিত হয়।[১]

وَ يَسْتَنْبِئُوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ ؕ قُلْ اِىْ وَرَبِّىْٓ اِنَّهٗ لَحَقٌّ ؕۚ وَمَآ اَنْتُمْ
بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٥٣﴾ وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ
ؕ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ۚ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُوْنَ ﴿٥٤﴾ اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ
حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٥﴾ هُوَ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ وَ اِلَيْهِ
تُرْجَعُوْنَ ﴿٥٦﴾ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ
وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٧﴾ قُلْ بِفَضْلِ
اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٥٨﴾

তরজমা

(৫৩) (হে রসূল!) তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে এটি কি সত্য? আপনি বলুন, আমার প্রতিপালকের শপথ, এটি অবশ্যই ধ্রুব সত্য। তোমরা তা ঠেকাতে পারবে না।

(৫৪) আর যদি দুনিয়ার সমস্ত কিছুও প্রত্যেকটি পাপীষ্ঠ ব্যক্তির নিকট থাকে তবে সে তার বিনিময়ে সব কিছু দান করতে প্রয়াসী হবে এবং যখন তারা আযাব দেখতে পাবে তখন মনে মনে আক্ষেপ করতে থাকবে। তাদের মধ্যে ইনসাফের ভিত্তিতে বিচার করা হবে, তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না।

(৫৫) সাবধান! আসমান জমিনে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহ পাকের। মনে রেখো! নিশ্চয় আল্লাহ পাকের প্রতিশ্রুতি সত্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানেনা।

১। খোলাসাতুত্তাফাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৩০

(৫৬) তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু মুখে পতিত করেন, আর তাঁর দরবারেই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

(৫৭) হে মানব জাতি! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের কাছে এসেছে উপদেশ এবং তোমাদের অন্তরের ব্যাধির নিরাময় এসেছে। আর মোমেনদের জন্যে তাতে রয়েছে হেদায়েত ও রহমত।

(৫৮) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহ পাকের দয়া এবং মেহেরবানীতেই, অতএব, তাতে তাদের আনন্দ বোধ করা উচিত। তারা যা কিছু জমা করছে তা অপেক্ষা নিঃসন্দেহে এটি উত্তম।

তফসীরুল কোরআন

কাফেররা বিস্মিত হয়ে তোমাদেরকে পুনর্জীবন লাভের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে, এ কথাটি কি সত্য? অর্থাৎ আমরা কি মৃত্যুর পর সত্যি সত্যিই আবার জীবিত হব এবং চিরদিন আযাব ভোগ করতে থাকব, আমাদের হাড় গোশ্‌ত মাটির সঙ্গে মিশে যাবে এরপরও কি আমরা পুনর্জীবন লাভ করবো?

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, (হে রসূল!) তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে আল্লাহ পাকের তৌহিদ, আপনার রেসালত, পবিত্র কোরআন, কেয়ামত, হিসাব-নিকাশ এসবই কি সত্য?

قُلْ إِيْ وَرَبِّيْٓ إِنَّهٗ لَحَقٌّ .

(হে রসূল!) আপনি বলুন, আমার প্রতিপালকের শপথ! এ সত্য। এতে বিস্ময়ের কি আছে? যা অবশ্যই হবে, তাহলো জীবনের অবসান ঘটবে মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধানের মাধ্যমে। এরপর আলমে বরজখ বা মধ্যলোকে থাকতে হবে অনেক দিন, অবশেষে পুনর্জীবন বা পুনরুত্থান হবে এবং প্রত্যেককে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হতে হবে। পবিত্র কোরআনের একখানি ক্ষুদ্র আয়াতে আল্লাহ পাক এ সমস্ত কথা এরশাদ করেছেনঃ

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

"এই মাটি থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি আর এই মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনবো এবং মাটি থেকেই পুনরায় তোমাদেরকে বের করবো"। আরো এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ.

"তিনি বললেন, তাতেই তোমরা জীবন-যাপন করবে, আর সেখানেই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে, এরপর তোমাদেরকে সেখান থেকে বের করা হবে"। অতএব, তোমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হও অথবা মাটির সঙ্গে মিশে যাও কিন্তু একথা ধ্রুব সত্য যে, অবশেষে তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির করা হবে। মানব জীবনের এ পরিণতিই

অপরিহার্য, অনিবার্য। এ পরিণতিকে তোমরা প্রতিরোধ করতে পারবে না। বিষয়টির উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করার লক্ষ্যে শপথ করে এ সত্য ঘোষণা করা হয়েছে। ঠিক এভাবে পবিত্র কোরআনের সূরা সাবায় এ কথাটিকে শপথ করে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ ط قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ

(সূরা সাবা, আয়াত-৩)

"কাফেররা বলে, আমাদের নিকট কেয়ামত আসবেনা। (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমার প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয় তোমাদের নিকট তা আসবেই"।

আরো এরশাদ হয়েছেঃ

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ط قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ

بِمَا عَمِلْتُمْ ط وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ. (সূরা তাগাবুন, আয়াত-৭)

"কাফেররা ধারণা করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবেনা, (হে রসূল!) আপনি বলুন নিশ্চয় হবে। আমার প্রতিপালকের শপথ, তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করেছ তোমাদেরকে সে সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করা হবে। তা আল্লাহর পক্ষে সহজ"। আরও এরশাদ হয়েছেঃ

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ. (সূরা তাগাবুন, আয়াত-৯)

"স্মরণ কর সেদিনকে যেদিন তিনি তোমাদেরকে একত্রিত করবেন, সমাবেশের দিনে, সেদিন হবে লাভ-লোকসানের দিন"।

এভাবে কোরআনে করীমের বহু আয়াতে কেয়ামতের কঠিন দিনের কথা এবং মানব জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ.

"আর যদি পৃথিবীর সব কিছু প্রত্যেক পাপীষ্ঠ ব্যক্তির নিকট থাকে তবে নাজাতের পরিবর্তে তা দান করতে তারা প্রয়াসী হবে"।

অর্থাৎ পাপীষ্ঠরা যখন কেয়ামতের দিনের ভয়াবহ দৃশ্য দেখবে তখন তাদের অবস্থা এমন হবে যে সম্ভব হলে সারা বিশ্বের সমস্ত সম্পদ মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে তারা আযাব থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা আযাব থেকে রক্ষা পাবেনা।

وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ج

কেয়ামতের দিন দূরাত্মা পাপীষ্ঠরা কঠিন আযাব দেখে অত্যন্ত লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হবে, তাদের দোষ-ত্রুটির ফিরিস্তি যেন মানুষের সম্মুখে প্রকাশ না পায় সেজন্যে তারা আপ্রাণ চেষ্টা করবে। কিন্তু সেদিন তাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। অবশেষে তাদের

যাবতীয় অপকীর্তি প্রকাশ পাবে। তারা অপদস্থ হবে। তখন তারা বলবে, পবিত্র কোরআনের ভাষায় ঃ

يٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِىْ جَنْۢبِ اللّٰهِ

"হায় আক্ষেপ! আল্লাহ্ পাকের দরবারে আমরা কতই না অপরাধ করেছি"!

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ বাক্যটির অর্থ হল, নেতৃস্থানীয় অপরাধীরা তাদের অনুসারীদের থেকে নিজেদের অপরাধের ফিরিস্তিকে গোপন রাখতে সচেষ্ট হবে যেন তাদের অনুসারীরা তাদেরকে এ মর্মে তিরস্কার না করে যে, তোমাদের কারণেই আজ আমরা বিপদগ্রস্ত হয়েছি।

কোন কোন তফসীরকার এ বাক্যটির আরও একটি ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁরা বলেছেন, লজ্জাকে গোপন করার অর্থ হল কথা বলতে সক্ষম না হওয়া। অর্থাৎ কেয়ামতের দিনের কঠিন আযাব দেখে তারা এমন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে যে, তাদের বাকশক্তি রহিত হয়ে যাবে, তখন তারা কোন কথা বলতে পারবে না।[১]

وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ.

আর সুবিচারের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে ফয়সালা করা হবে, তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। অর্থাৎ অপরাধ ব্যতীত কাউকে শাস্তি দেয়া হবেনা। জালেমদেরকে তাদের জুলুমের কারণে শাস্তি দেয়া হবে এবং ইনসাফের ভিত্তিতেই তাদের মধ্যে ফয়সালা করা হবে।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, কাফেররা সকলেই কাফের হিসেবে আযাব ভোগ করবে। কিন্তু তাদের জালেম এবং মজলুমের মধ্যে ইনসাফ ভিত্তিক ফয়সালা এভাবে হবে যে, কাফের জালেমের শাস্তি কঠোরতর হবে আর মজলুম কাফেরের শাস্তি তার চেয়ে লঘু হবে।[২]

اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ আসমান জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্ পাকের, তিনিই নিখিল বিশ্বের মালিক, সমগ্র সৃষ্টি জগৎ তাঁরই কর্তৃত্বাধীন, তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন, সমগ্র বিশ্বে তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য সম্পূর্ণ সুপ্রতিষ্ঠিত। এমন অবস্থায় কোন অপরাধীই পলায়ন করে আত্মরক্ষা করতে পারবে না। তাদের শাস্তি অবধারিত। যেহেতু বিশাল বিস্তৃত এ পৃথিবীর একমাত্র অধিপতি এক আল্লাহ্ পাক, যেহেতু তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর নাফরমানদেরকে যে কোন সময় যে কোন স্থানে শাস্তি দিতে পারেন এবং যারা তাঁর তাবেদার বন্দা তাদের প্রতি যে কোন স্থানে রহমত নাযিল করতে পারেন, তাঁর দ্বীনকে যে কোন স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, তাই কাফেরদের তরফ থেকে দ্বীন ইসলামের প্রতি

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫১২
[২]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-১১২

যে বিদ্রুপ করা হয় তাতে কিছু যায় আসেনা; বরং যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনে এবং নেক আমল করে তাদের জন্যে সওয়াব সুনিশ্চিত রয়েছে। আর যারা আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অমান্য করে তাদের শাস্তি অবধারিত রয়েছে।

اَلَآ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ

আর সওয়াব প্রদানের এবং শাস্তি বিধানের একথা আল্লাহ্ পাকের ওয়াদা, আল্লাহ্ পাকের এ ওয়াদা ধ্রুব সত্য, তা অবশ্যই পূর্ণ হবে।

وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ.

কিন্তু অধিকাংশ লোকই এ সম্পর্কে অবগত নয়, নিজেদের নির্বুদ্ধিতার করণে এ মহা সত্য সম্পর্কে তারা উদাসীন রয়েছে।

هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ.

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের হাতেই রয়েছে মানুষের জীবন ও মৃত্যু। তিনিই মানুষকে জীবন দান করেন। আর তিনিই মানুষকে মৃত্যু মুখে পতিত করেন। তিনিই মানুষকে প্রথম সৃষ্টি করেছেন এবং মৃত্যুর পর তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন।

وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

অবশেষে প্রত্যেকটি মানুষকে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে ফিরে যেতে হবে।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ.

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে পবিত্র কোরআনের অলৌকিকত্ব বর্ণিত হয়েছে, আর এ আয়াতে পবিত্র কোরআনের শান, গুণাবলী, ফজিলত ও মাহাত্ম এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে।

পবিত্র কোরআনের বৈশিষ্ট্য

হে মানব জাতি! তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে তোমাদের নিকট এসেছে উপদেশ, এতে রয়েছে মনের ব্যাধির নিরাময়, মোমেনদের জন্যে পবিত্র কোরআন হল হেদায়েত এবং রহমত, পবিত্র কোরআনই মানুষকে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির পথ-প্রদর্শন করে আল্লাহর রহমত লাভের যোগ্য করে তোলে, মানুষকে যাবতীয় অমঙ্গল এবং অকল্যাণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা দেয় এবং মানব মনের দূরারোগ্য ব্যাধির অব্যর্থ মহৌষধের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করে।

পবিত্র কোরআন সমগ্র মানব জাতির নামে আল্লাহ্ পাকের সর্বশেষ পয়গাম। এজন্যে আয়াতের শুরুতে يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ (হে মানব জাতি!) বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ এতে রয়েছে সমগ্র মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ। পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ ব্যতীত কোন মানুষের জীবনই সার্থক হতে পারেনা। কোন জাতি তার সাধনায় সফল হতে পারেনা, যে পর্যন্ত না সে পবিত্র কোরআনের মহান জ্যোতির্ময় শিক্ষাকে বরণ করে নেয়। পৃথিবীর মানুষ নিজেদের কল্যাণের জন্যে অনেক মতবাদ উপস্থাপন করেছে; অনেক পথ ও পন্থা নিজেদের ধী শক্তির মাধ্যমে রচনা করেছে। কিন্তু পরবর্তীতে মানব রচিত পথ ও পন্থার বাতুলতা লক্ষ্য করে তারা নিজেরাই তা পরিহার করেছে। কেননা, আল্লাহ্ পাক সমগ্র মানব জাতির জন্যে একখানি হেদায়েত নামা দিয়েছেন, আর তা হল পবিত্র কোরআন। পবিত্র কোরআনের হেদায়েত অমান্য করে পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি, সমাজ, জাতি কোনদিনও সাফল্যমন্ডিত হতে পারেনা।

আধুনিক বিশ্বে বিগত সত্তর বছর যাবত পৃথিবীর এক বিরাট মানব গোষ্ঠী সমাজতন্ত্রকে একটি সফল মতবাদ হিসেবে বরণ করে নিয়েছিল, এর ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিলো সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা। সকলেই এ মতবাদের প্রশংসায় ছিল পঞ্চমুখ। কিন্তু আজ সমাজতন্ত্রের পূজারীরা তার বিপজ্জনক জোয়াল থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে পৃথিবীর বহুদেশ সমাজতন্ত্রের বিষাক্ত ছোবল থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। এখানেই ফিরে আসতে হয় পবিত্র কোরআনের চিরন্তন ঘোষণার দিকে যা এ আয়াতের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। "হে মানব জাতি! তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে এসেছে একটি নসিহত"। যে নসিহত ঘুমন্ত জাতিকে জাগ্রত করে, বিভ্রান্ত মানুষকে পথ-প্রদর্শন করে, রুগ্ন অন্তরকে নিরাময় দান করে, যা মানুষকে আত্মশুদ্ধি লাভে সহায়ক হয়।

পবিত্র কোরআন আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ, এটি আল্লাহ্ পাকের নিজস্ব কালাম-মহান কল্যাণ বাণী। এতে রয়েছে তাঁর বিধি-নিষেধ। আল্লাহ্ পাকের প্রতিটি কথা হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ, তাই পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষায় রয়েছে মানব জাতির সামগ্রিক কল্যাণ।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে পবিত্র কোরআনের চারটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে।

مَّوْعِظَةٌ شِفَآءٌ هِدَايَتٌ رَحْمَتٌ

মানব অন্তরের হেদায়েত তথা আত্মশুদ্ধি লাভের চারটি স্তর রয়েছে। আলোচ্য আয়াতের চারটি শব্দই ঐ চারটি স্তরের দিকে ইঙ্গিত করে।

১. আল্লাহ্ পাকের অপছন্দনীয় কাজ তথা যাবতীয় পাপাচার পরিহার করে আত্মশুদ্ধি লাভ করা। এ উদ্দেশ্যে موعظة বা নছিহত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

২. বাতিল আকিদা, ভ্রান্ত চিন্তাধারা বর্জন করা, চারিত্রিক দুর্বলতা পরিহার করা। এ উদ্দেশ্য شفاء (শেফা বা দূরারোগ্য ব্যাধির নিরাময়) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

৩. আধ্যাত্মিক সাধনার তৃতীয় স্তর হল সঠিক আকীদা ও বিশ্বাস অর্জন করা, নৈতিক মান উন্নত করা। এ স্তরটি হেদায়েতের অন্তর্ভুক্ত।

৪. আল্লাহ পাকের নূরে নিজের অন্তরকে আলোকিত করা, আল্লাহর রহমতের অমৃতধারায় মনকে পরিপূর্ণ করা, এটি হল রহমতের মাকাম।

একথা সন্দেহাতীতরূপে বলা চলে যে, পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার অনুসরণের মাধ্যমে মানব অন্তর এ সমস্ত স্তর অতিক্রম করে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হতে পারে।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এবনে মরদবিয়ায় সংকলিত এবং হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমি আমার বক্ষে ব্যথা অনুভব করি, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তুমি পবিত্র কোরআন পাঠ করতে থাক কেননা, আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন সম্পর্কে বলেছেনঃ

وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ.

"তাতে রয়েছে অন্তর সমূহের রোগের নিরাময়"।

এই কোরআন হলো হেদায়েত এবং রহমত মোমেনদের জন্যে। যদিও আয়াতের শুরুতে সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। ইতিপূর্বে পবিত্র কোরআনের দু'টি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু শেষ দু'টি বৈশিষ্ট্য শুধু মোমেনদের সাথে সম্পর্কীয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা পবিত্র কোরআনের এই বৈশিষ্ট্য তথা হেদায়েত শুধু মোমেনগণই কবুল করে। আর হেদায়েতের বরকত স্বরূপ রহমত নাযিল হয়, সে রহমত লাভ করে মোমেনগণ। পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারার শুরুতেই আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে ঘোষণা করেছেনঃ

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ.

"এই কিতাব, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই, এই কিতাব হেদায়েতকারী হল সে সব লোকদের জন্যে যারা আল্লাহকে ভয় করে"। অতএব, হেদায়েত লাভের পূর্বশর্ত হল মানব মনে আল্লাহর ভয় থাকতে হবে। আর এটি মোমেনগণেরই বৈশিষ্ট্য। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, পবিত্র কোরআন মানুষকে সহীহ আকিদা ও বিশ্বাসের নির্দেশনা দেয় এবং আল্লাহ পাকের নৈকট্যের পথ-নির্দেশ করে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

يقال لصاحب القران اقرء وارتق ورتل كما كنت

---

[১]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৪৫
তফসীরে রুহুল মা'আনী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১৩৯

ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر اية تقرءها

(আহমদ, তিরমিজী, আবু দাউদ, নেসায়ী)

কেয়ামতের দিন পবিত্র কোরআন পাঠকদের বলা হবে, তুমি কোরআনে করীম পাঠ কর এবং উপরের দিকে উঠতে থাক, যেভাবে দুনিয়ায় তুমি পবিত্র কোরআন তরতীলের সঙ্গে পাঠ করতে ঠিক তেমনি তরতীলের সঙ্গে পাঠ করতে থাক। কেননা, যেখানে তোমার তেলাওয়াত শেষ হবে, সেখানেই হবে তোমার মঞ্জিল।

وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ.

"আর পবিত্র কোরআন হল হেদায়েত এবং রহমত মোমেনদের জন্যে"।

কেননা মোমেনগণই পবিত্র কোরআন দ্বারা হেদায়েত লাভ করে এবং পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার অনুসরণ করে আল্লাহর রহমত লাভে ধন্য হয়।

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত পবিত্র কোরআনের গুণাবলী প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী হিসেবেও পরিগণিত হতে পারে কেননা, তাঁর (১) নসিহত পথহারা মানুষকে সুপথের সন্ধান দিয়েছে (২) তিনি ছিলেন মানব অন্তরের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞ চিকিৎসক (৩) তাঁর হেদায়েত লক্ষ লক্ষ দিশেহারা মানুষকে দিয়েছে সঠিক পথের দিশা। (৪) তিনি হলেন রহমতুল্লিল আলামীন।[১]

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ

(হে রসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহ পাকের বিশেষ দানে এবং রহমতেই এ নেয়ামত সমূহ লাভ হয়েছে। আমাদের কোন যোগ্যতায় নয়; বরং আল্লাহ পাকের দান এবং রহমতেই পবিত্র কোরআনের অবতরণ বা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয়েছে। অতএব, এজন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে শোকর গুজার হওয়া কর্তব্য।

فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا.

অতএব, আল্লাহ পাকের এ নেয়ামত সমূহের কারণে আনন্দিত হওয়া উচিত। আলোচ্য বাক্যটির বর্ণনা-শৈলীর কারণে এর অর্থ হল যদি আনন্দিত হওয়ার কিছু থাকে তবে এই নেয়ামতই।[২]

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে "আল্লাহর ফজল ও রহমত" দ্বারা পবিত্র কোরআন অবতরণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

মুজাহেদ (রঃ) এবং কাতাদা (রহঃ) বলেছেন, "আল্লাহর ফজল" হল আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের তৌফিক। আর আল্লাহর রহমত হল পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়া।

---

[১]। খোলাসাতুত্তাফাসীর, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৩১

[২]। তফসারে কবীর খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-১১৭

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহর ফজল হল ঈমান, আর আল্লাহর রহমত হল তিনি আমাদেরকে পবিত্র কোরআন দান করেছেন। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত আল্লাহর অনুগ্রহে তথা কোরআনের বরকতে এবং আল্লাহর রহমতে, এজন্যে যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে পবিত্র কোরআন পাঠকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর ফজল হল ইসলাম। আর আল্লাহর রহমত হল এই যে, আল্লাহ পাক আমাদের অন্তরে ইসলামকে প্রিয় এবং পছন্দনীয় করে দিয়েছেন। হযরত খালেদ এবনে মে'দান বলেছেনঃ আল্লাহর ফজল হল ইসলাম আর আল্লাহর রহমত হল হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুন্নত। আর একথাও বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর ফজল হল ঈমান আর আল্লাহর রহমত দ্বারা জান্নাতকে বোঝানো হয়েছে।[১]

هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ.

মানুষ পার্থিব জগতের যে সম্পদ সঞ্চয় করে তার চেয়ে অতি উত্তম হল কোরআনে করীম। কেননা, দুনিয়ার জীবনের লাভ, আনন্দ, উপকার, ভোগ সবই সামান্য এবং নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী, অথচ পবিত্র কোরআনের উপকার অনেক এবং চিরস্থায়ী।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে কোন কোন তফসীরকার একথাও বলেছেন, আল্লাহর ফজল এবং রহমত উভয় শব্দ দ্বারাই কোরআনে করীমের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এজন্যে আদেশ হয়েছে যে, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে এত বড় নেয়ামত দান করেছেন তার উপর তোমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। আর যেহেতু দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তাই তফসীরকারগণ বলেছেন, ফজল শব্দ দ্বারা কোরআনকে বোঝানো হয়েছে আর রহমত শব্দ দ্বারা ইসলামকে বোঝানো হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) মতে, আয়াতের ব্যাখ্যা হলোঃ (হে রসূল!) আপনি আপনার সাহাবাদেরকে বলুন, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে পবিত্র কোরআন দান করেছেন এবং ইসলাম গ্রহণের তৌফিক দান করেছেন। এ দু'টি নেয়ামতের জন্যে তোমরা আনন্দিত হও এবং আল্লাহর শোকর আদায় কর। আর মনে রেখ ইহুদী এবং মুশরেকরা যে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করছে তার চেয়ে তোমাদেরকে প্রদত্ত এ নেয়ামত অনেক উত্তম।[২]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াত সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হযরত ওমর (রাঃ)-এর আমলে যখন ইরাক থেকে সরকারী রাজস্ব হিসেবে অনেক ধন-সম্পদ আসে, তখন তিনি তা পরিদর্শনে গমন করলেন। অগণিত উষ্ট্র দেখে তিনি বললেন, আল্লাহ পাকের শোকর। তখন তাঁর খাদেম বললেন, আল্লাহর শপথ! এটিই আল্লাহর ফজল এবং রহমত। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, না, এ আয়াতে আল্লাহর ফজল ও রহমত বলে আল্লাহ পাক কোরআনকে বুঝিয়েছেন। আর ধন-সম্পদ يجمعون শব্দ দ্বারা যা বোঝানো হয়েছে তার অন্তর্ভুক্ত।[৩]

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫১৪
[২]। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-১৭৬
[৩]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১১, পৃষ্ঠা-৬৪

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا ؕ
قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ﴿۵۹﴾ وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ
عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿۶۰﴾ وَمَا تَكُوْنُ فِىْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ
قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ
وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَلَآ
اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرَ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿۶۱﴾

তরজমা

(৫৯) (হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে আল্লাহ্ পাকই তোমাদের জন্যে উপজীবিকা নাযিল করেছেন, এরপর তোমরাই তার মধ্যে কোনটাকে হারাম এবং কোনটাকে হালাল করেছ। (হে রসূল!) আপনি জিজ্ঞাসা করুন, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহ্ পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করছো?

(৬০) যারা আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে কেয়ামত সম্পর্কে তাদের কি ধারণা? নিশ্চয় আল্লাহ পাক মানব জাতির প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ পরায়ণ। কিন্তু তাদের অনেকেই তাঁর প্রতি শোকর গুজার হয়না।

(৬১) (হে রসূল!) আপনি যে কোন অবস্থায় থাকেন না কেন আর পবিত্র কোরআনের যে কোন আয়াত পাঠ করেন না কেন, এবং তোমরা যে কোন কাজ কর না কেন, যখন তোমরা তাতে মশগুল হও আমি অবশ্যই তখন তোমাদের নিকট থাকি। (হে রসূল!) আসমান জমীনের তিল পরিমাণ অথবা তার চেয়ে ছোট বড় এমন কিছুই নেই যা আপনার প্রতিপালকের অগোচর, যা সুস্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নেই।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে তৌহিদ, রেসালত এবং কেয়ামতের ব্যাপারে দলিল প্রমাণ পেশ করা হয়েছে এবং কাফেরদের তরফ থেকে উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব প্রদান করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, কাফেরদের কর্মপন্থা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, অসুন্দর, ভিত্তিহীন এবং বিবেক বর্জিত ও মিথ্যা রটনা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ

পূর্ববর্তী আয়াতে একথা ঘোষণা করা হয়েছে, পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে সমগ্র মানব জাতির জন্যে নসিহত এবং মানব অন্তরের রোগ নিরাময় স্বরূপ, বিশেষতঃ মোমেনদের জন্যে হেদায়েত এবং রহমত স্বরূপ। অতএব, মানব জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান পবিত্র কোরআনই দেবে। এটিই স্বাভাবিক। আর জীবনের প্রতি ক্ষেত্রের জন্যে পবিত্র কোরআন থেকেই হেদায়েত গ্রহণ করতে হবে।

কিন্তু কাফের মুশরেকরা তাদের মূর্খতা এবং অবাধ্যতার কারণে নিজের ইচ্ছায়ই হালাল হারামের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আল্লাহ্ পাক যে রিয্ক দান করেছেন তাদের কোনটিকে তারা হারাম এবং কোনটিকে হালাল বলেছে অথচ এটি তাদের ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ

(হে রসূল!) আপনি জিজ্ঞাসা করুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ আল্লাহ্ পাক যে রিয্ক তোমাদের জন্যে নাযিল করেছেন তার কোন্টিকে তোমরা হারাম এবং কোনটিকে হালাল করেছ। অথচ এর কোন অধিকার তোমাদের নেই।

قُلْ

(হে রসূল!) আপনি জিজ্ঞাসা করুন, আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছেন নাকি তোমরা আল্লাহ্ পাকের প্রতি মিথ্যা রচনা করছো। মূলতঃ আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে এর অনুমতি দেননি, তোমরা আল্লাহ্ পাকের নামে মিথ্যা রচনা করছো।

وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

আর যারা আল্লাহ্ পাকের নামে মিথ্যা রচনা করে কেয়ামতের দিন সম্পর্কে তাদের কি ধারণা? কেয়ামতের দিন সম্পর্কে তোমরা কি ভাবছো কেয়ামত কি আসবে না? কেয়ামতের দিন কি শাস্তি হবেনা? যদি তোমরা তাই ভেবে থাক তবে তোমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। প্রকৃত অবস্থা এই যে, কেয়ামত অবশ্যই আসবে, কেউ তাকে প্রতিরোধ করতে পারবে না। আর কেয়ামতের দিন কাফেরদের আযাব অনিবার্য, অবশ্যম্ভাবী।

কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে কাফের মুশরেকদের ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। দুনিয়াতে আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম দয়ার কারণে হয়তো তিনি অবকাশ দিয়ে থাকেন, কৃত অপরাধের জন্যে তাৎক্ষণিকভাবে অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে ক্ষেত্র বিশেষে অপরাধীকে আত্ম-সংশোধনের সুযোগ দিয়ে থাকেন কিন্তু এ সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে যদি কেউ পাপাচারে লিপ্ত হয় তবে তার শাস্তি অবধারিত হয়। এজন্যেই মরমী কবি বলেছেনঃ

حلم حق باتو مواسا ہا کند = چون تو از حد بگذری رسول کند

"আল্লাহ্ পাকের উদারতা তোমাদের প্রতি দয়া ও রহমতের কারণ হয় কিন্তু যখন তোমরা সীমালঙ্ঘন কর তখন তিনি তোমাদেরকে অপমানিত করেন"।

বর্বরতার যুগের কাফের মুশরেকরা যা ইচ্ছা তাই করতো, যেমন ইচ্ছা তেমন চলতো, যা ইচ্ছা তাকে হারাম বা হালাল বলে দিত। অথচ এ কাজ আল্লাহ্ পাকের বিধান ব্যতীত কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আল্লাহ্ পাকই সব কিছুর স্রষ্টা। অতএব, কোন কিছুকে হারাম বা হালাল বলার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ পাকের। তাই পবিত্র কোরআন আলোচ্য আয়াতে বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে।

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ

নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তাঁর বন্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান, তিনিই মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন, আর মানুষের হেদায়েতের জন্যে আসমানী গ্রন্থ্ সমূহ নাযিল করেছেন এবং তাঁর নবীগণকে প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ্ পাক মানব জাতির প্রতি অত্যন্ত দয়াবান

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় এবনে জরীর (রঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্ পাক মানব জাতির প্রতি অত্যন্ত দয়াময়", এর মর্ম হল আল্লাহ্ পাক দুনিয়াতে কাফেরদের শাস্তিকে ত্বরান্বিত করেন না।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ আল্লাহ্ পাক মানুষের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান, এর অর্থ হল আল্লাহ্ পাক দুনিয়াতে এমন বহু বস্তু সৃষ্টি করেছেন, যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় আর তিনি এমন বহু ক্ষতিকর বস্তুকে হারাম ঘোষণা করেছেন যার কারণে মানুষের অনেক ক্ষতি হয়। কিন্তু মানুষ অকৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ পাকের এ সমস্ত নেয়ামতের জন্যে অধিকাংশ লোকই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত সমূহকে নিজেদের জন্যে হারাম মনে করে আর নিজেদেরকে কষ্টে ফেলে রাখে।

মূসা এবনে সাবাহ থেকে এ আয়াত সম্পর্কে একখানি হাদীস বর্ণিত আছে। কেয়ামতের দিন তিন প্রকার আল্লাহ্ ওয়ালা লোককে হাযির করা হবে। আল্লাহ্ পাক প্রত্যেক দলকে জিজ্ঞাসা করবেন। এক প্রকার লোককে জিজ্ঞাসা করবেন, তোমরা কি উদ্দেশ্যে নেক আমল করেছিলে? তারা বলবে, হে পরওয়ারদেগার! তুমি জান্নাত সৃষ্টি করেছ তাতে অগণিত নেয়ামত রেখেছ, আর জান্নাত হাসিল করার জন্যেই আমরা বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করেছি এবং সারাদিন রোজা রেখেছি। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেন, তুমি যখন জান্নাত লাভের উদ্দেশ্যেই নেক আমল করেছ তাই তোমার ঠিকানা জান্নাত হবে কিন্তু এটি তোমার আমলের বদলা নয়; আমি তোমাকে দোযখ থেকে নাজাত দিচ্ছি। এটি তোমাদের প্রতি আমার দান। আর আমি তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাচ্ছি, এটি আমার দান। এরপর দ্বিতীয় প্রকার লোকদেরকে ডাকা হবে, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে

অনুরূপ প্রশ্ন করবেন, তখন তারা বলবে, হে পরওয়ারদেগার! তুমি দোযখ সৃষ্টি করেছ এবং তাতে পাপীষ্ঠ লোকদের জন্যে অনেক শাস্তির ব্যবস্থা করেছ, তাই ঐ শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে আমি আমার জীবনের রাতগুলো এবাদতে অতিবাহিত করেছি এবং ঐ আযাবের ভয়েই আমি দিনগুলোতে রোজা রেখেছি। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেন, তুমি দোযখের ভয়ে আমার এবাদত করেছ, তাই দোযখ থেকে তোমাকে নাজাত দিচ্ছি আর এটি তোমার প্রতি আমার দান। এরপর আমি তোমাকে জান্নাত দিচ্ছি। তখন তারা জান্নাতে দাখিল হবে।

এরপর তৃতীয় প্রকার লোককে হাযির করে অনুরূপ প্রশ্ন করা হবে। তারা বলবে, হে পরওয়ারদেগার! আমরা শুধু তোমার মহব্বতেই তোমার এবাদত করেছি, সারা রাত তোমার রেজামন্দি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তোমার মোলাকাতের আকাঙ্খায় এবাদত করেছি, দিনগুলোতে রোজা রেখেছি। তখন আল্লাহ্ পাক তাদেরকে তাঁর দীদার নছীব করবেন এবং এরশাদ করবেন, তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত লাভ করেছ। আমি আমার দানে তোমাদেরকে দোযখ থেকে নাজাত দিচ্ছি এবং জান্নাত দান করছি, আমার ফেরেশতাগণ তোমাদের কাছেই থাকবে। আমার তরফ থেকে তোমাদের জন্যে রয়েছে নিরাপত্তা। এরপর তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে।[১]

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ.

আল্লাহ্ পাকের এত দান এবং এত অনুগ্রহ সত্ত্বেও অধিকাংশ লোক তাঁর শোকর গুজার হয়না। যদি মানুষ আল্লাহ্ পাকের শোকর গুজার হতো, তবে আল্লাহ্র নাফরমানী করতো না। তাঁর অবাধ্য হতো না এবং পাপাচারে লিপ্ত হতো না।

আলোচ্য আয়াতের এ অর্থও হতে পারে। আল্লাহ্ পাক তাঁর বন্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান, বন্দারা তাঁর নাফরমানী করে কিন্তু এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ পাক দুনিয়াতে তাদের শাস্তিকে ত্বরান্বিত করেন না।[২]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "আল্লাহ্ পাক মানব জাতির প্রতি অত্যন্ত দয়াবান"-এর তাৎপর্য হলো, আল্লাহ্ পাক মানুষকে ভাল মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার জন্যে বিবেক বুদ্ধি দান করেছেন এবং মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্যে নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। আর জীবন বিধান হিসাবে আসমানী কিতাব সমূহ নাযিল করেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ লোক আল্লাহ্ পাকের এ নেয়ামত সমূহের জন্যে শোকর গুজার হয়না। শোকর গুজার না হওয়ার তাৎপর্য হলো তারা বিবেক বুদ্ধি ব্যয় করে আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত দলিল সমূহের উপর চিন্তা করেনা এবং নবী রসূলগণের আহ্বানে সাড়া দেয়না এবং আসমানী কিতাব সমূহ শ্রবণ করে তা দ্বারা উপকৃত হয়না।[৩]

"অধিকাংশ লোক আল্লাহ্ পাকের শোকর গুজার হয়না"–একথার তাৎপর্য সম্পর্কে আল্লামা মাজেদী (রঃ) লিখেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ অকৃতজ্ঞতা হলো এই যে, পবিত্র কোরআনের

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১১, পৃষ্ঠা-৬৫

২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫১৬

৩। তফসরে কবীর খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-১২০

হেদায়েত দ্বারা আত্ম-সংশোধন করাতো দূরের কথা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত এবং পবিত্র কোরআনে পরিবেশিত কেয়ামত সম্পর্কীয় খবরের উপর তারা বিশ্বাসও করেনা। পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করে ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুতও হয়না।

তফসীরকারগণ একথাও বলেছেন, আল্লাহ্ পাকের ফজল ও অনুগ্রহ হিসেবে এটিও একটি যে, তিনি কেয়ামত কায়েম হওয়ার বহু পূর্বে মানুষকে এর সংবাদ দিয়েছেন এবং এ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন শুধু তাই নয়, বরং যারা অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত তাদেরকে তওবা করে আত্মসংশোধনের বিরাট অবকাশ এবং সুবর্ণ সুযোগ দিয়েছেন, এটি আল্লাহ্ পাকের দান ব্যতীত আর কিছুই নয়।[১]

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَّمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيضُوْنَ فِيْهِ.

আল্লাহ্ পাকের নিকট কোন কিছু গোপন নেই

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদ বা তৌহিদের কথা এরশাদ হয়েছে, আর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাকের এলম সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আসমান জমিনের কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই। ক্ষুদ্রতম বালু কণা পরিমাণ বস্তুও তাঁর নখদর্পণে রয়েছে। তিনি সর্বক্ষণ পৃথিবীর সব কিছু লক্ষ্য করছেন।

بر و علم یک ذره پوشیده نیست = که بیدا و پنہاں بنزدش یکے است.

আল্লাহ্ পাকের নিকট পৃথিবীর একটি বালুকণাও গোপন নয়। এখানকার প্রকাশ্য ও গোপন তাঁর নিকট সবই এক সমান।

আল্লাহ্ পাকের এ বৈশিষ্ট্য বর্ণনার দু'টি উদ্দেশ্য

১. কাফের ও মুশরেকদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা যে, তোমরা আমার রসূল এবং আমার দ্বীনের বিরুদ্ধে যে শত্রুতা এবং চক্রান্ত করছো তা আমার নিকট গোপন নেই। তোমাদের চক্রান্ত কখনও সফল হবে না। আল্লাহ্ পাক তাঁর রসূলের হেফাজত করবেন, আল্লাহ্ পাক তোমাদের প্রতিটি পদক্ষেপের হিসাব নেবেন।

২. হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া যে, আপনি কাফেরদের শত্রুতা এবং ষড়যন্ত্রে চিন্তিত হবেন না, তাদের কোন কর্মকান্ডই আল্লাহ্ পাকের নিকট গোপন নেই, তাদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্মকান্ডও আল্লাহ পাকের নখদর্পণে রয়েছে। আসমান জ্বীনে যা কিছু আছে এবং হচ্ছে সে সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত। (হে রসূল!) আপনি যখন যে অবস্থায় থাকেন আর কোরআনে করীমের কোন

[১]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৪৬

আয়াত বা সূরা পাঠ করেন সবই আল্লাহ্ পাক প্রত্যক্ষ করেন। হে মানব জাতি! তোমরা যখন যা কিছু কর এবং যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ কর আল্লাহ্ পাক তার সাক্ষী থাকেন।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, যেহেতু হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সমগ্র মানব জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী এবং তাঁর মর্তবা এবং মান সর্বোচ্চে, তাই আলোচ্য আয়াতে সর্বপ্রথম তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে, এরপর সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, আকাশে বা পাতালে একটি বালুকণা পরিমাণ বস্তুও আল্লাহ্ পাকের নিকট গোপন নেই। আর ছোট বড় কোন কিছুই এমন নেই যা লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত নেই।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে যদিও আসমান জমিনের উল্লেখ রয়েছে, এর উদ্দেশ্য হল সমগ্র সৃষ্টিজগৎ, কেননা মানুষ আসমান জমিনকেই দেখে, এর বাইরের কোন কিছু সাধারণতঃ মানুষের বোধগম্য হয় না।[২]

কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, পবিত্র কোরআনে রয়েছে নসীহত, অন্তরের দূরারোগ্য ব্যাধির নিরাময়। হেদায়েত ও রহমত। কিন্তু যাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয় না, তারা পবিত্র কোরআনের এ নেয়ামত থেকে উপকৃত হয়না। ঠিক এমনিভাবে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে যে মহান অনুপম, আদর্শ পেশ করেছেন, তারা তাও বরণ করে নেয় না অথচ আল্লাহ্ পাক সর্বক্ষণ তাদের যাবতীয় কার্যক্রম লক্ষ্য করছেন। যেমন হাদীস শরীফে আছেঃ

فان لم تكن تراه فانه يراك.

যদি তুমি তাঁকে নাও দেখতে পার কিন্তু তিনি তোমাকে দেখেন, পৃথিবীতে কোন কিছুই তাঁর অগোচর নেই। এমন অবস্থায় কাফের মুশরেকরা কোন্ সাহসে আল্লাহ্ পাকের নামে মিথ্যা রচনা করে এবং কেয়ামতের দিনকে অস্বীকার করে।

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৮২
[২]। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫১৬

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٢﴾ اَلَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى
الْاٰخِرَةِ ۗ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٤﴾
وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ
﴿٦٥﴾ اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ
الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَآءَ ۗ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ
هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿٦٦﴾

তরজমা

(৬২) মনে রেখো, যারা আল্লাহর ওলী, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না।

(৬৩) যারা ঈমান এনেছে এবং সর্বদা (আল্লাহ পাককে) ভয় করেছে,

(৬৪) তাদের জন্যে সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনে এবং পরকালে। আল্লাহ পাকের কথায় কোন প্রকার পরিবর্তন হবার নয়। এটিই বিরাট সাফল্য।

(৬৫) (হে রসূল!) কাফেরদের কথায় দুঃখিত হবেন না। সকল শক্তি মূলতঃ এক আল্লাহ পাকেরই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

(৬৬) হুশিয়ার! আসমান জমিনে যারা রয়েছে (ফেরেশতা, জ্বীন ও মানুষ) সবই আল্লাহ পাকের। আর আল্লাহ পাক ব্যতীত অপরকে যারা শরীকরূপে ডাকে তারা কিসের অনুসরণ করে? বস্তুতঃ তারা শুধু অনুমানেরই অনুসরণ করে। তারা শুধু খেয়াল খুশীর ঘোড়া দৌড়ায়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহর দুশমনদের তথা কাফের ও মুশরেকদের অবস্থা ও পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে আল্লাহর বন্ধুদের তথা আওলিয়ায়ে কেরামের অবস্থা এবং শুভ পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে। যারা আল্লাহর পেয়ারা, যারা আল্লাহর ওলী কেয়ামতের দিন তাদের কোন ভয়-ভীতি থাকবে না। তারা কোন প্রকার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না, তাদের কোন দুঃখ-বেদনা থাকবেনা। এমনকি দুনিয়াতেও তাদের কোন দুঃখ থাকবেনা। কোন

আশা-আকাঙ্খা অপূর্ণ থাকবেনা, তারা থাকবেন আল্লাহর নৈকট্য-ধন্য। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

"মনে রেখ, নিশ্চয় আল্লাহর ওলীদের কোন ভয় নেই, কোন চিন্তা নেই"। প্রশ্ন হতে পারে আল্লাহর ওলী কারা? পরবর্তী বাক্যে তার জবাব রয়েছেঃ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ.

"যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং সর্বদা আল্লাহকে ভয় করতে থাকে"। অতএব, আল্লাহর প্রতি ঈমান হল আল্লাহর ওলী হওয়ার পূর্বশর্ত। যাদের অন্তর আল্লাহর প্রতি ঈমানের নূরে আলোকিত এবং যাদের অন্তর আল্লাহর ভয়ে থাকে সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত, তারা বেলায়েতের মর্তবা লাভ করতে পারে।

আল্লাহ পাকের নৈকট্যের সর্বপ্রথম সোপান হল ঈমান, যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟

যারা ঈমানদার আল্লাহ পাক তাদের ওলী-তাদের বন্ধু। বস্তুতঃ ঈমানই হলো আল্লাহর নৈকট্য লাভের পন্থা, আর এ নৈকট্যের সর্বশেষ মর্তবা হল আম্বিয়ায়ে কেরামের। আর আম্বিয়ায়ে কেরামের দলপতি হলেন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

আল্লাহর ওলীর পরিচয়

সুফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায়, আল্লাহর ওলী তাকে বলা হয় যার অন্তর সর্বদা আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকে। সকাল সন্ধ্যা তথা সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনায় মশগুল থাকে। আল্লাহর মহব্বতে তার অন্তর পরিপূর্ণ থাকে। সেই অন্তরে আর কারো মহব্বতের স্থান থাকেনা। পিতা-পুত্র, ভাই-বেরাদর বা পরিবারবর্গের সঙ্গে তার যে মহব্বত থাকে, তা শুধু আল্লাহকে রাজি করার উদ্দেশ্যে। কারো সাথে শত্রুতা থাকলেও তা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। তিনি যদি কাউকে কিছু দান করেন তবে তা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, আর যদি দান করা থেকে বিরত থাকেন তবে তাও আল্লাহকে রাজি করার লক্ষ্যে। আল্লাহর ওলীগণ শুধু আল্লাহর মহব্বতেই পরস্পর মহব্বত রাখেন। সুফিগণের পরিভাষায় এ অবস্থাকে "ফানায়ে ক্বলব" বলা হয়।

আল্লাহর ওলীগণ তাকওয়া পরহেযগারীর গুণে গুণান্বিত হন। আল্লাহ্ পাকের অপছন্দনীয় কাজ থেকে তাঁরা সর্বদা দূরে থাকেন। তাদের মধ্যে তিলার্ধ পরিমাণ শেরক থাকতে পারেনা। অহংকার, হিংসা-পরশ্রীকাতরতা, লোভ-লালসা থেকে ওলী আল্লাহগণের মন পবিত্র থাকে। সুফিয়ায়ে কেরাম এ অবস্থাকে "ফানায়ে নফস" বলে আখ্যা দেন। সুফিয়ায়ে কেরাম বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি এ মর্তবায় পৌঁছে তখন তার শয়তান তার নিকট পরাজয় স্বীকার করে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর ওলীর পরিচয় বর্ণনা করে এরশাদ হয়েছেঃ

الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا.

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনে, ঈমানের নূরে তাদের ক্বলব আলোকিত হয়। আল্লাহ্ পাকের স্মরণে তাদের অন্তরে শান্তি এবং সান্ত্বনা সৃষ্টি হয়। ক্ষণিকের জন্যেও অন্তর আল্লাহ্ পাকের স্মরণ থেকে গাফেল হয় না। আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কোনদিকে তারা মনোনিবেশ করেন না। তাই সাধক কবি বলেছেনঃ

ہر کس کہ ترا شناخت جان راچہ کند = بر دید وعیال وخان ومان راچہ کند

"যে তোমার পরিচয় পেয়েছে সে তার জীবন নিয়ে কী করবে? স্ত্রী, পুত্র, পরিবার দিয়ে সে কি করবে"?

دیوانہ کنی ردو جہاں بخشی = دیوانہ تو ہر دو جہاں راچہ کند

"যে তোমার দেওয়ানা হয়েছে তাকে যদি দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহান দান কর তবে তা দিয়ে সে কি করবে"?

আল্লাহর ওলীদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করে এরশাদ হয়েছেঃ

وَكَانُوۡا يَتَّقُوۡنَ

অর্থাৎ যারা যাবতীয় পাপাচার থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ্ পাকের সকল বিধান মেনে চলে, সর্বদা পরহেযগারী অবলম্বন করে।

আবু দাউদ হযরত ওমর এবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর বর্ণনা সংকলন করেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কিছু লোক এমন রয়েছে যারা নবীও নন, শহীদও নন, কিন্তু কেয়ামতের দিন তাদের নৈকট্যের মর্তবা দেখে নবী ও শহীদগণও বিস্ময় বোধ করবেন। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! তাদের পরিচয় কি? তখন তিনি এরশাদ করলেন, যারা আল্লাহর বন্দাদের সঙ্গে শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত রাখে, কোন আত্মীয়তার বন্ধনে নয়, অর্থ-সম্পদের লেন-দেনের কারণে নয়; বরং শুধু আল্লাহ্ পাকের মহব্বতের কারণে আল্লাহর বন্দাদের সাথে তারা মহব্বত রাখে। আল্লাহর শপথ! কেয়ামতের দিন তাদের চেহারা হবে জোতির্ময়, নূরের প্রতীক। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট اَلَآ اِنَّ اَوۡلِيَآءَ اللّٰهِ আয়াতখানির অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তখন তিনি এরশাদ করেন, তারা সে সব লোক, যারা শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পর মহব্বত রাখে।

একখানি হাদীসে কুদসীতে আছে, (আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন) আমার বন্দা নফল এবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করে, এমনকি আমি তাকে ভালবাসতে শুরু করি। যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার কান হয়ে যাই যা দ্বারা সে শ্রবণ করে, আমি তার চোখ হয়ে যাই যা দ্বারা সে দেখে। আল-হাদীস।[১] (বোখারী শরীফ)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যাদেরকে সর্বদা আল্লাহ পাকের জিকর ফিকরে থাকতে দেখা যায়, তারাই হলেন আল্লাহর ওলী।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আল্লাহর ওলী কে? তিনি এরশাদ করলেনঃ সে সব লোক যাদেরকে তুমি সর্বক্ষণ আল্লাহর জিকরে মশগুল দেখবে।

হযরত আবু মালেক আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, বিভিন্ন গোত্রের লোক চতুর্দিক থেকে একত্রিত হবে, তাদের মধ্যে কোন আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না। কিন্তু তারা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একে অন্যের সঙ্গে মহব্বত রাখবে, পরস্পর বন্ধু থাকবে, তাদের পরস্পরের মধ্যে অত্যন্ত আন্তরিকতা থাকবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাদের জন্যে নূরের মিম্বর তৈরী করবেন যাতে তারা উপবিষ্ট হবে। কেয়ামতের দিন যখন লোকেরা অত্যন্ত অস্থির হয়ে থাকবে তখন তারা থাকবে নিশ্চিন্ত এবং শান্ত, এরাই আল্লাহর ওলী।[২]

বস্তুতঃ যাঁরা খাঁটি মোখলেস মোমেন, যাঁরা আল্লাহর ওলী, তাদের মন আল্লাহর মহব্বতে থাকে পরিপূর্ণ, তাঁরা আল্লাহর জিকরে সর্বক্ষণ থাকেন মশগুল, এক আল্লাহ পাকের প্রতিই থাকে তাঁদের ভরসা, এক আল্লাহ পাকের নিকটই থাকে তাঁদের সকল আশা। তাই কোন দুশমনের দুশমনী বা কোন বিপদাপদ তাদের মনে ভয়ের সঞ্চার করতে পারে না। যাঁরা আল্লাহ পাকের প্রতি খাঁটি ঈমান আনে এবং ঈমানের দাবী মোতাবেক তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করতে থাকে, যারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করে এবং আল্লাহর মহব্বতের কারণেই আল্লাহর বন্দাদেরকে মহব্বত করে, আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কারো সাথে তারা আন্তরিক সম্পর্ক রাখেনা, এমন ব্যক্তিরাই হলেন আওলিয়ায়ে কেরাম।

বেলায়েতের মর্তবা লাভের পন্থা

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুকরণের মাধ্যমেই বেলায়েতের মর্তবা লাভ হয়। সরাসরি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পর্ক হোক অথবা অন্য কারো মাধ্যমে।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অথবা তাঁর অনুসারীদের মহব্বত এবং তাঁদের সংসর্গ বেলায়েত লাভের ক্ষেত্রে জরুরী। সুন্নতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫১৭-১৮

[২]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১১, পৃষ্ঠা-৬৭

ওয়াসাল্লামকে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে এ পথে অগ্রসর হতে হয়। অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকর এ পথে সাহায্যকারী হয়। এভাবে মনের কালিমা দূরীভূত হয়। ক্বলব পরিচ্ছন্ন হয়। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুকরণে আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি পায়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর এবনুল আস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস ইমাম মালেক (রঃ) এবং ইমাম আহমদ (রঃ) সংকলন করেছেন। আর বায়হাকী হযরত মুআজ এবনে জবল (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত মুআজ (রাঃ) বলেন, আমি নিজে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ যে দু' ব্যক্তি আমার জন্যে পরস্পর মহব্বত করে, আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই একত্রিত হয় এবং আমার রেজামন্দির লক্ষ্যেই অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে তাদের জন্যে আমার মহব্বত ওয়াজিব হয়ে যায়।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! সে ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি বলেন, যে কোন সম্প্রদায়কে মহব্বত করে কিন্তু সে ব্যক্তির আমল উক্ত সম্প্রদায়ের আমলের পর্যায়ে পৌঁছেনা। তিনি এরশাদ করলেনঃ ঐ ব্যক্তি সে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের সঙ্গে সে মহব্বত রাখে। হযরত আনাস (রাঃ) থেকেও এমনি হাদীস বর্ণিত আছে। বায়হাকী শোয়াবুল ঈমানে লিখেছেন, হযরত আবু রাজীন (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, আমি কি তোমায় বলব, এ কাজের ভিত্তি কিসের উপর, যাতে তোমার দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণ নিহিত রয়েছে? তুমি সর্বদা আল্লাহর জিকরকারীদের মজলিসে হাযির থাকবে, আর যদি একা থাক তবে যথাসাধ্য আল্লাহর জিকরে তোমার রসনাকে মশগুল রাখ, আল্লাহ্ পাকের জন্যেই মহব্বত রাখ আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই কারো সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ কর (অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই হতে হবে মহব্বত এবং শত্রুতা), কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং উদ্দেশ্য এতে থাকবে না।

ইমাম আহমদ এবং আবু দাউদ হযরত আবুজর (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাকের দরবারে সবচেয়ে প্রিয় আমল শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মহব্বত এবং শত্রুতা রাখা।

আল্লাহর প্রিয় কে?

আউলিয়ায়ে কেরামের মধ্যে একদল লোক আল্লাহ পাকের মাহবুব বা প্রিয় হওয়ার তৌফিক লাভ করেন। মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সংকলিত হয়েছে। হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক যখন কোন বন্দাকে ভালবাসেন তখন জীব্রাঈল (আ.)-কে ডাক দিয়ে হুকুম দেন, আমি অমুক বন্দাকে ভালবাসি, অতএব তুমিও তাকে ভালবাস। নির্দেশ মোতাবেক জীব্রাঈল (আঃ) তাকে ভালবাসতে থাকেন।

এরপর জীব্রাঈল (আঃ) আসমানবাসীকে জানিয়ে দেন আল্লাহ্ পাক অমুক বন্দাকে ভালবাসেন, অতএব তোমরাও তাকে ভালবাস তখন আসমানবাসীও তাকে ভালবাসে।

এরপর পৃথিবীতে তাকে মকবুলিয়ত দান করা হয় (ফলে সে জনপ্রিয় হয়)।

আর যখন আল্লাহ্ পাক কোন লোককে অপছন্দ করেন তখন জিব্রাঈল (আঃ)-কে ডাক দিয়ে বলেন, আমি অমুক বন্দাকে অপছন্দ করি, তুমিও তাকে অপছন্দ কর। নির্দেশ মোতাবেক জিব্রাঈল (আঃ) তাকে অপছন্দ করেন, এরপর জিব্রাঈল (আঃ) আসমানবাসীকে জানিয়ে দেন যে, অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ পাক অপছন্দ করেন অতএব, তোমরাও তাকে অপছন্দ কর।

আসমানবাসীগণ তাকে অপছন্দ করতে শুরু করে। এরপর পৃথিবীতে তাকে অপছন্দনীয় করে দেয়া হয়। তখন জমিনের অধিবাসীরা তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে।

আল্লাহর ওলীগণের চিহ্ন

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল আল্লাহর ওলীর চিহ্ন কি? তিনি এরশাদ করলেনঃ "যাকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়"। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ আমার বন্দাদের মধ্যে আমার ওলী তারাই, যাদের স্মরণ আমার জিকরের মাধ্যমে এবং আমার স্মরণ তাদের জিকরের মাধ্যমে হয়।

হযরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি এরশাদ করেছেনঃ আমি কি তোমাদেরকে বলবো না? যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল লোক কে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! অবশ্যই বলুন। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ যাদেরকে দেখলে আল্লাহ পাকের কথা স্মরণ হয়। (এবনে মাজা)

এ কারণেই যাঁরা আল্লাহর ওলী তাঁরা আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য-ধন্য হন। তাঁরা যেন সর্বদা আল্লাহ্ পাকের দরবারেই হাযির থাকেন। এজন্যে তাঁদের মোলাকাত আল্লাহ্ পাকের স্মরণের কারণ হয়। এর একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে যখন দর্পণকে সূর্যের সম্মুখে রাখা হয় তখন সূর্যের আলোক রশ্মির কারণে দর্পণটি আলোয় ঝলমল করে ওঠে। আর ঐ দর্পণের সম্মুখে যা কিছু রাখা হয় তাও আলোকিত হয়।

এতদ্ব্যতীত আল্লাহ্ পাক তাঁর আউলিয়াকে অন্যকে প্রভাবান্বিত করার বিশেষ শক্তি দান করেন। এজন্যে তাঁদের নিকট হাযির হওয়া আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির হওয়ার কারণ হয় এবং তাঁদেরকে দেখা আল্লাহ্ পাকের জিকরের কারণ হয়, তবে শর্ত হল যারা আল্লাহর ওলীকে দেখবে বা তাঁদের সম্মুখে বসবে তাদের অন্তরে ঈমান থাকতে হবে। যে আল্লাহকে অস্বীকার করে সে আওলিয়ায়ে কেরামের ফয়েজ থেকে মাহরুম হয়। এজন্যেই কোরআনে করীমে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ.

অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান ও আনুগত্য রাখেনা, আল্লাহ পাক এমন সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। এ পর্যায়ে আরও একখানি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে আমার ওলীর সাথে শত্রুতা করে আমি তার বিরুদ্ধে নিজের তরফ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা দিচ্ছি। (বোখারী শরীফ)

একবার হযরত হানজালা (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমরা যখন হুজুরের দরবারে থাকি, আপনি দোযখ এবং জান্নাতের কথা বর্ণনা করেন, তখন আমরা যেন স্বচক্ষে জান্নাত দোযখ দেখি। কিন্তু যখন আপনার নিকট থেকে বাইরে চলে যাই এবং স্ত্রী পুত্র পরিবার এবং সংসারের কাজে মগ্ন হই তখন অনেক কিছু ভুলে যাই। তখন তিনি এরশাদ করলেন, শপথ সেই আল্লাহ পাকের! যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, যদি তোমরা সর্বদা ঐ অবস্থায় থাকতে যখন আমার নিকট থাক বা আমার নসীহত শ্রবণ কর তবে ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানায় তোমাদের সাথে মোছাফেহা করতো। কিন্তু হানজালা বিশেষ বিশেষ সময় হয় (অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হওয়ার সময় এবং তাঁর দরবার থেকে দূরে থাকার মধ্যে পার্থক্য থাকবে)। এই শেষ শব্দগুলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তিনবার বলেছেন। (মুসলিম শরীফ)

কাশ্‌ফ ও কারামত

কোন কোন ওলীয়ে কামেল দ্বারা সময় বিশেষে কারামত জাহের হয়। তাঁদের দ্বারা অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। আল্লাহ্ পাকের বিশেষ কুদরতেই এমনটি হয়। আর কোন কোন বুজর্গের কাশ্‌ফও হয়। কিন্তু এটি আল্লাহর ওলী হওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত নয়, কেননা অনেক আওলিয়ায়ে কেরাম এমনও ছিলেন যাঁদের কাশ্‌ফ ও কারামত হয়নি। অলৌকিক ঘটনা যখন কোন নবীর মাধ্যমে ঘটে তখন তাকে মোজেযা বলা হয়। আর যখন কোন ওলীর মাধ্যমে ঘটে তখন তাকে কারামত বলা হয়।

মূলতঃ এ কাজটি আল্লাহ পাকের। এজন্যে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, কারামতের কারণে একজন ওলীর উপর আরেকজন ওলীর ফজিলত প্রমাণিত হয় না।[১]

হাকীমুল উম্মত মওলানা থানবী (রহঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে বেলায়েতের দু'টি ভিত্তি বর্ণিত হয়েছে (১) ঈমান (২) তাকওয়া। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর ওলী হওয়ার জন্যে কারো দ্বারা কারামত প্রকাশিত হওয়া শর্ত নয়।[২]

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ

"তাদের জন্যে রয়েছে দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে সু-সংবাদ"।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫২২

২। তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা-৪৩৯

সাহাবায়ে কেরামের জন্যে সু-সংবাদ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে অনেক সুসংবাদ দিয়েছেন এবং বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামকে বিশেষ খোশ খবরী দিয়েছেন।

তিরমিযী হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ)-এর সূত্রে এবং এবনে মাজা হযরত সাঈদ এবনে যায়েদের বর্ণনা সংকলন করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আবু বকর (রাঃ) জান্নাতে তথা জান্নাতী, ওসমান (রাঃ) জান্নাতী, আলী (রাঃ) জান্নাতী, তালহা (রাঃ) জান্নাতী, আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ) জান্নাতী, সা'দ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) জান্নাতী। আবু দাউদ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম হে আবুবকর! তুমি জান্নাতে যাবে।

তিরমিজী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সর্বপ্রথম জমিন বিদীর্ণ হলে আমি বের হব, এরপর আবু বকর (রাঃ), এরপর ওমর (রাঃ)।

তিরমিযী হযরত তালহা এবনে ওবায়দুল্লাহর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, প্রত্যেক নবীর একজন বন্ধু থাকবে। জান্নাতে আমার বন্ধু হবে ওসমান (রাঃ)। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত সাদ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আলীকে (রাঃ) লক্ষ্য করে এরশাদ করেছেন, তুমি আমার সঙ্গে এমন অবস্থানে রয়েছ যে অবস্থানে হারুন (আঃ) মূসা (আঃ)-এর নিকট ছিলেন (অর্থাৎ হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট হযরত হারুন (আঃ) যে নৈকট্য লাভ করেছিলেন সে নৈকট্য হযরত আলী (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পেয়েছেন)। কিন্তু আমার পরে কোন নবী নেই।

হযরত যায়েদ এবনে আরকাম (রাঃ)-এর সূত্রে ইমাম আহমদ (রঃ) এবং ইমাম তিরমিজী বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি যার মাওলা (সর্দার, দোস্ত) আলীও (রাঃ) তার মাওলা।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত মাছওয়ার এবনে মাখরামা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ফাতেমা আমার অংশ, যে তাঁকে অসন্তুষ্ট করলো, সে আমাকে অসন্তুষ্ট করলো।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীস তিরমিজী শরীফে সংকলিত হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ হাসান, হোসাইন জান্নাতী যুবকদের সর্দার। তিনি আরও এরশাদ করেছেনঃ জান্নাতী স্ত্রীলোকদের মধ্যে সর্বোত্তম মরয়ম বিনতে এমরান এবং খাদীজা বিনতে খোয়াইলাদ। তিনি আরও এরশাদ করেছেনঃ স্ত্রীলোকদের মধ্যে আয়েশা (রাঃ)-এর মর্যাদা এমন, যেমন সারীদের মর্যাদা অন্যান্য খাবারের মধ্যে। তিনি আরও এরশাদ করেছেন, আবদুল্লাহ অর্থাৎ আবদুল্লাহ এবনে ওমর

নেককার ব্যক্তি। আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) সম্পর্কে বলেছেনঃ সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি আরও এরশাদ করেছেনঃ মোমেন ব্যতীত আনসারদের সাথে কেউ মহব্বত রাখেনা, মুনাফেক ব্যতীত কেউ আনসারদের সাথে দুশমনী রাখেনা (অর্থাৎ আনসারদের সঙ্গে মহব্বত ঈমানের আলামত, আর তাঁদের সাথে দুশমনী রাখা মুনাফেকীর চিহ্ন)। যে তাদের সাথে মহব্বত রাখবে, আল্লাহ পাক তাকে ভালবাসবেন। আর যে তাদের সাথে দুশমনী রাখবে আল্লাহ পাক তাকে অপছন্দ করবেন। তিনি আরও এরশাদ করেছেনঃ ওসায়েদ এবনে জবল কত ভাল মানুষ! মুআজ এবনে আমর এবনে জুমুহ কত ভাল মানুষ! তিনি আরও এরশাদ করেছেনঃ জান্নাত তিন ব্যক্তির জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, আলী (রাঃ) আম্মার (রাঃ) এবং সালমান (রাঃ)। এভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অনেক সাহাবায়ে কেরামের সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে সুসংবাদ দিয়েছেন। আর কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক সমস্ত সাহাবায়ে কেরামকে সুসংবাদ দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ

وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى

"আর আল্লাহ পাক প্রত্যেক সাহাবীর সাথে জান্নাতের ওয়াদা করেছেন"।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা আমার সাহাবায়ে কেরামকে মন্দ বলোনা, কেননা যদি তোমাদের কেউ ওহোদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণ আল্লাহর রাহে ব্যয় করে তবে সাহাবাদের এক সের কি আধা সের দানের সমানও তোমাদের দান হবে না। (বোখারী, মুসলিম)

রাজীন হযরত ওমর (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার সাহাবায়ে কেরাম নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায়, তোমরা যাঁরই অনুসরণ কর-না কেন, হেদায়েত লাভ করবে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম লোক হলো আমার যুগের (অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম)।

এরপর যারা তাদের পরবর্তী যুগে আসবে (অর্থাৎ তাবেয়ীন), এরপর যারা তাদের পরবর্তী যুগে আসবে (অর্থাৎ তাবে তাবেয়ীন)।[১]

হযরত ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে আখেরাতের যে সুসংবাদের কথা রয়েছে তা তো জান্নাত কিন্তু দুনিয়ার সুসংবাদটি কি?

তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ এ সুসংবাদ হলো সত্য স্বপ্ন যা কোন ব্যক্তি নিজে দেখে বা তার সম্পর্কে অন্য কাউকে দেখানো হয়। আর এ সত্য স্বপ্ন নবুওয়্যতের সত্তর বা ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কোন মানুষ ভাল কাজ করে। লোকেরা তার প্রশংসা করে,

[১]। তফসীরে মাজহারী খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা-৫২২-২৩

এটি যেন মোমেনের জন্যে দুনিয়াতেই জান্নাতের খোশখবরী। অতএব, যে ভাল স্বপ্ন দেখে সে যেন মানুষের নিকট তা বর্ণনা করে, আর যে মন্দ স্বপ্ন দেখে তা শয়তানের তরফ থেকে হয় এবং ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্যেই শয়তান তা করে। মন্দ স্বপ্ন দেখলে তিন বার বাঁ দিকে থু-থু ফেলবে এবং আল্লাহর নামের তকবীর পাঠ করবে এবং কারো নিকট বর্ণনা করবে না।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, ভাল স্বপ্ন আল্লাহর তরফ থেকে সুসংবাদ।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে বাশারত বা সুসংবাদের তাৎপর্য হলো, মোমেনের মৃত্যুর সময় ফেরেশতাগণ তাকে জান্নাত এবং মাগফেরাতের সুসংবাদ প্রদান করেন, যেমন কোরআনে করীমেও রয়েছে এর ঘোষণা ঃ

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَٰئِكَةُ أَلَّا

تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ.....

"নিশ্চয় যারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ পাক, এরপর আমৃত্যু একথার উপর সুদৃঢ় থাকে, তাদের উপর ফেরেশতাগণ নাযিল হবে এবং বলবেঃ তোমরা ভয় করোনা, চিন্তিত হয়োনা, তোমাদেরকে সেই জান্নাতের সুসংবাদ, যার অঙ্গীকার তোমাদের সঙ্গে করা হয়েছে। দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্যে রয়েছে সেসব বস্তু, যা তোমাদের মন চায়। আর যা কিছুর জন্যে তোমরা ফরমায়েশ করবে, তা-ও রয়েছে তোমাদের জন্যে সেখানে। এটি দয়াবান আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে তোমাদের জন্যে উপঢৌকন"।

হযরত বরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যখন মোমেনের মৃত্যুর সময় আসে তখন অতি উজ্জ্বল সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট, সাদা পোষাক পরিহিত ফেরেশতাগণ তার নিকট এসে বলে হে পবিত্র রূহ! তোমার প্রতিপালকের দিকে চল, যিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। তখন এ রূহ এভাবে বের হয়ে পড়ে যেভাবে মশক থেকে পানি বের হয়। যেমন আল্লাহ্ পাক কোরআনে করীম এরশাদ করেছেনঃ যার মর্ম হলো "কেয়ামতের কঠিন মুহূর্ত তাদেরকে ভীত করবে না"। ফেরেশতারা তাদেরকে সেদিন বলবেঃ এটিই সেদিন, যেদিন সম্পর্কে তোমাদের সাথে ওয়াদা করা হয়েছে। সেদিন মোমেনদের সম্মুখে এবং ডানে নূর চলতে থাকবে। আজ তোমাদের জন্যে এমন জান্নাতের সুসংবাদ যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত, আর এটি সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য।[১]

হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে (لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا) আয়াতাংশের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ যখন থেকে আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেছি তখন থেকে এ পর্যন্ত তোমার পূর্বে কেউ আমার নিকট এ আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চায়নি। আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১১, পৃষ্ঠা-৬৭

আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি এরশাদ করেছিলেন, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর তুমি ব্যতীত আর কেউ এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেনি। আলোচ্য আয়াতে بشرى শব্দটির অর্থ, সত্য স্বপ্ন যা মোমেনকে দেখানো হয়। দুনিয়ার জীবনেও তার জন্যে সুসংবাদ আর আখেরাতের জীবনেও রয়েছে জান্নাতের সুসংবাদ।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, সত্য স্বপ্ন বলতে সাধারণ মানুষের স্বপ্ন নয়; বরং আওলিয়ায়ে কেরাম ও নেককারদের স্বপ্ন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, স্বপ্ন তিন প্রকার (১) আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সু-সংবাদ (২) কল্পনা প্রসূত, (৩) শয়তানের তরফ থেকে ভয় প্রদর্শন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত এই হাদীস তিরমিজী এবং এবনে মাজায় সংকলিত হয়েছে।

২. البشرى শব্দের আরও একটি ব্যাখ্যা হল সাধারণ সুসংবাদ, যার সম্পর্ক জান্নাত এবং সওয়াবের সঙ্গে।

৩. بشرى অর্থাৎ সৎ কাজের জন্যে মানুষের প্রশংসা।

৪. মৃত্যুর সময় ফেরেশতা যে সুসংবাদ দেবেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

وَفِى الْاٰخِرَةِ

অর্থাৎ আওলিয়ায়ে কেরামের জন্যে সুসংবাদ রয়েছে দেহ থেকে রূহ বের হওয়ার সময় মোমেনের রূহকে আল্লাহ পাকের নৈকট্যের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির সুসংবাদ দেয়া হয়। আর কেয়ামতের দিন পুনরুত্থানের সময়ও তাকে সুসংবাদ দেয়া হবে।

হযরত ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হওয়া পছন্দ করে, আল্লাহ পাকও তার উপস্থিতি পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হওয়া পছন্দ করেনা আল্লাহ পাকও তার উপস্থিতি অপছন্দ করেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) অথবা অন্য কোন উম্মুল মোমেনীন আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমরা যে মৃত্যুকে পছন্দ করিনা, তখন তিনি এরশাদ করলেন, এর এই অর্থ নয়, বরং যখন মোমেনের মৃত্যুর সময় আসে তখন তাকে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং রহমতের সুসংবাদ দেয়া হয়। আর সে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হওয়ার জন্যে আকাঙ্খা করে। পক্ষান্তরে, কাফেরের মৃত্যু যখন ঘনিয়ে আসে তখন তাকে আল্লাহর আযাব এবং শাস্তির কথা বলা হয়। আসন্ন শাস্তি তার কাছে সর্বাধিক অপ্রিয় হয়। এজন্যে সে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হওয়া পছন্দ করেনা, আর আল্লাহ পাকও তার উপস্থিতি অপছন্দ করেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

তথা কলেমায়ে তাইয়্যেবায় বিশ্বাসীদের মৃত্যুর সময় ভয় হবেনা এমনকি, কবরেও না, আর কবর থেকে পুনরুত্থানের সময়ের দৃশ্য যেন আমার সম্মুখে। যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে তখন ঈমানদারগণ মাথার উপর থেকে বালু ঝেড়ে বলবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ.

"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের জন্যে যিনি আমাদের থেকে কষ্ট দূর করেছেন"। (তেবরানী)

لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ.

আল্লাহ পাকের কথার মধ্যে কোন পরিবর্তন হবার নয় অর্থাৎ মোমেনদের সাথে যে ওয়াদা করা হয়েছে তার বরখেলাফ করা হবে না।

ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

অর্থাৎ মোমেনদের জন্যে দুনিয়া আখেরাতের যে সুসংবাদ দান করা হয়েছে, তাই হল সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য।.

وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ.

(হে রসূল!) কাফের মুশরেকদের কষ্টদায়ক কথা যেন আপনাকে চিন্তিত না করে অর্থাৎ তারা যে শেরকের কথা বলে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতকে মিথ্যা জ্ঞান করে, এসব যেন আপনাকে মর্মাহত না করে।

اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا.

কেননা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, শক্তি-সামর্থ এবং প্রাধান্য, সম্মান এবং মর্যাদা এক কথায় সবই আল্লাহ পাকের হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে সম্মানিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে অপমানিত করেন।

هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত, সকলের কথা তিনি শ্রবণ করেন, সকলের অবস্থা সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন। কাফেরদের যাবতীয় কথা-বার্তা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল, অবশেষে তিনি সত্যকে বিজয় দান করবেন, আর সত্যের দুশমনদেরকে পরাজিত এবং অপমানিত করবেন।

اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ.

মনে রেখ, আসমান জমিনে যা কিছু আছে ফেরেশতা, জ্বীন এবং মানুষ সবই আল্লাহর সৃষ্টি। আসমান জমিনের সর্বত্র আল্লাহ পাকের একচ্ছত্র কতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। মুশরেকেরা যে মূর্তিগুলোর পূজা অর্চনা করে, আল্লাহ ব্যতীত যা কিছুকে তারা ডাকে তা তাদের কোন ক্ষতিও করতে পারে না কোন উপকারও করতে পারেনা। আর মুশরেকদের কাছে তাদের মতবাদের সত্যতার কোন দলিলও নেই।

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ.

বস্তুতঃ তারা শুধু অনুমানেরই অনুসরণ করে, তারা আল্লাহ পাকের সাথে যা কিছুকে শরীক করে তা শুধু তাদের কল্পনা এবং অনুমানের ভিত্তিতেই করে। এর পক্ষে তাদের নিকট কোন যুক্তি বা দলিল বলতে কিছুই নেই।

وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ.

তারা শুধু খেয়াল খুশির ঘোড়া দৌড়ায়। যা তাদের মনে আসে তাই তারা করে। কেননা নিজের হাতে গড়া মূর্তিকে উপাস্য মনে করা এবং তাকে আল্লাহ পাকের সাথে শরীক করার মত মিথ্যা ধোকা এবং আত্ম-প্রবঞ্চনা আর কী হতে পারে!

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ الْغَنِيُّ ۖ
لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَٰذَا ۚ
أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ
الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ
نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

তরজমা

(৬৭) তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত তোমাদের বিশ্রামের জন্যে এবং দিন দেখবার জন্যে। যে সম্প্রদায় কথা শোনে নিশ্চয় তাদের জন্যে এতে রয়েছে বহু নিদর্শন।

(৬৮) তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন, তিনি পবিত্র, মহান, তিনি বে-নিয়াজ, কারো মুখাপেক্ষী নন। আসমান, জমিনে যা কিছু আছে সবই তাঁর। তোমাদের নিকট এ বিষয়ে কোন সনদ নেই। তোমরা কি আল্লাহ পাক সম্পর্কে এমন কথা বল যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই।

(৬৯) (হে রসূল!) আপনি বলুন, যারা আল্লাহ পাক সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে তারা সফলকাম হবেনা।

(৭০) তাদের জন্যে পৃথিবীতে আছে সামান্য সুখ-সম্ভোগ, এরপর আমার নিকট তাদেরকে ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তাদেরকে কুফরী ও নাফরমানীর কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াত সমূহে তৌহিদের বর্ণনা রয়েছে এবং আল্লাহ পাকের কয়েকটি নেয়ামতের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে, যে নেয়ামত সমূহের মাধ্যমে মানুষের জীবন-সাধনা অব্যাহত থাকে। এরশাদ হয়েছেঃ

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ.

তিনিই রাত সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ কর। দিন এবং রাত আল্লাহ পাকেরই সৃষ্টি আর তা আশরাফুল মাখলুকাত মানব জাতির উপকারার্থেই। সারা দিন কর্মময় জীবন যাপনের পর চাই একটু বিশ্রাম, একটু আরাম আর এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ পাক দান করেছেন রাতের আঁধার। রাতে বিশ্রাম গ্রহণের পর যেন মানুষ পরদিন নব উদ্যমে জীবন-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে-দিবারাত্রির পরিবর্তন এরই বাস্তব ব্যবস্থা।

এতদ্ব্যতীত, আঁধারের পর আলো তথা রাতের পর যেভাবে দিনের আবির্ভাব হয় ঠিক তেমনি কাফের মুশরেকদের পথভ্রষ্টতার অন্ধকার ভেদ করে পবিত্র কোরআনের আলোকে তাদের মন আলোকিত হতে পারে, যদি আল্লাহ পাকের মর্জি হয়। যেমন সূরা ইব্রাহীমের শুরুতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

الٓرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ.

"এই কিতাব (হে রসূল!) আপনার নিকট নাযিল করেছি যেন আপনি মানুষকে গোমরাহীর অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসেন তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে"।

কাফের ও মুশরেকদের গোমরাহীর ঘন অন্ধকারের পর যেন কোরআনের আলো বিচ্ছুরিত হয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তরগুলো আলোকিত করে। রাতের পর যেমন দিন আসে, ঠিক তেমনি বর্বরতার অন্ধকার যুগের পর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব এবং পবিত্র কোরআনের অবতরণের মাধ্যমে এসেছে আলোর যুগ।[১]

আলোচ্য আয়াতের তফসীরে হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা থানবী (রঃ) লিখেছেনঃ

لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ.

---

[১]। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-২৫৭

(যেন তোমরা বিশ্রাম কর) বাক্য দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানীগণ একথা প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহর এবাদতে সারা রাত জাগ্রত থাকার স্থলে কিছুক্ষণ নিদ্রিত থাকা উত্তম। এতেই রয়েছে আল্লাহ পাকের মর্জি, কেননা রাতকে তিনি মানুষের বিশ্রামের জন্যেই সৃষ্টি করেছেন বলে আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করেছেন।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ একথাও বলেছেন যে, এ আয়াতে রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে সান্ত্বনা। যেভাবে কখনও রাত হয় কখনও দিন, কখনও আলো কখনও অন্ধকার ঠিক তেমনি মানব জীবনের বিভিন্ন পর্যায়েও কখনও দুঃখ-কষ্ট থাকে, কখনও আনন্দ উল্লাস। একথা দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে এ বিষয়ের দিকে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক যিনি রাতকে দিনে আর দিনকে রাতে প্রবেশ করান, তাঁর হাতেই রয়েছে ইজ্জত-সম্মান এবং অপমান। অতএব, (হে রসূল!) আপনি কাফেরদের কথায় মনক্ষুন্ন হবেন না। আল্লাহ পাক যখন ইচ্ছা কাফেরদেরকে অপমানিত অপদস্ত করবেন। আর ইসলামের পতাকাকে উড্ডীন করবেন, মোমেনদেরকে সম্মানিত করবেন।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ.

এতে নিঃসন্দেহে নিদর্শন সমূহ রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্যে যারা কথা শোনে। অর্থাৎ আল্লাহ পাক রাত এবং দিন সহ অন্যান্য ব্যাপারে যে হেকমত রেখেছেন তাতে তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি-নৈপূণ্যের এবং বিস্ময়কর কুদরতের বহু জীবন্ত নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু এ নিদর্শন সমূহ সে সব লোকদের পক্ষেই উপকারী হয় যারা আল্লাহ পাকের কালামকে মনযোগ সহকারে শ্রবণ করে এবং হেদায়েত লাভের উদ্দেশ্যে শ্রবণ করে।

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ

তারা বলে আল্লাহ পাক সন্তান গ্রহণ করেছেন, তিনি পাক পবিত্র ও মহান, তিনি বে-নিয়াজ, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। এ আয়াতে খৃষ্টানদের ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিবাদ রয়েছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় কেননা, খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে। (নাউজুবিল্লাহে মিন জালেক) এর চেয়ে বড় মিথ্যা কথা পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। তিনি পবিত্র, মহান, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি এ সমস্ত সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং পবিত্র। খৃষ্টানরা যেমন ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে, ইহুদীরাও হযরত ওজায়ের (আঃ) সম্পর্কে এমন নির্জলা মিথ্যা কথা বলেছে। অথচ আল্লাহ পাক সন্তান-সন্ততির সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, তিনি এক, অদ্বিতীয়, তাঁর কোন দৃষ্টান্ত নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই রিয্কদাতা। সন্তান-সন্ততির মুখাপেক্ষী তারা হয় যারা মনে করে রোগে শোকে বার্ধক্যে কে আমাকে সাহায্য করবে? তাই বৃদ্ধকালে সন্তানের বড় প্রয়োজন। কিন্তু আল্লাহ পাকের কোন প্রয়োজনই নেই, কারো কাছে কোন ঠেকা নেই। আসমান জমিনে,

[১]। তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা-৪৩৯

দ্যুলোক ভুলোকে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর, নিখিল বিশ্বের বিশাল সাম্রাজ্যের একমাত্র সত্ত্বাধিকারী আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন।

هُوَ الْغَنِيُّ

তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। কারো কাছে তাঁর কোন ঠেকা নেই; বরং সমগ্র সৃষ্টি জগৎ তাঁর রহমতেরই মুখাপেক্ষী।

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

আসমান জমিনে যা কিছু আছে সবই তাঁর অর্থাৎ সব কিছুর মালিকানাই আল্লাহ পাকের। অতএব, তাঁর সন্তান-সন্ততির কথা চিন্তা করার মত অন্যায় অযৌক্তিক, অসুন্দর এবং অলিক কল্পনা আর কিছুই হতে পারে না।

اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍۢ بِهٰذَا

তোমাদের নিকট এমন কথার কি কোন দলিল আছে?

اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ.

অথবা তোমরা আল্লাহ পাকের শানে এমন কথা বল যে সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই। তোমরা কি আল্লাহ্ পাকের ব্যাপারে এমন অপবাদ রচনা কর যার কোন প্রমাণ তোমাদের নিকট নেই। এ বাক্যে মুশরেকদের মূর্খতার উপর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। আকিদা ও বিশ্বাসের ব্যাপারে এমন মূর্খতাপ্রসূত কথা বলা অমার্জনীয় অপরাধ।

যারা এমন অমার্জনীয় অপরাধ তথা আল্লাহ পাকের নামে মিথ্যা রচনা করে তাদের শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ.

(হে রসূল!) আপনি বলুন, নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ পাকের ব্যাপারে মিথ্যা কথা রচনা করে তারা যত সমৃদ্ধশালী ও শক্তিশালীই হোক না কেন, তারা কোন দিন সফলকাম হবেনা। দোযখ থেকেও আত্মরক্ষা করতে পারবে না এবং বেহেশতেও প্রবেশ করতে পারবে না তথা তারা চির বঞ্চিত হবে।

কাফের মুশরেকদের ব্যাপারে চিরন্তন ঘোষণা

যারা আল্লাহ পাকের নামে মিথ্যা কথা রচনা করে, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সর্বশেষ রসূল হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, যারা পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণে আপত্তি করে, তারা কোনদিন সফলকাম হবেনা।

প্রশ্ন হতে পারে যে এমন লোকদের হাতেইতো দুনিয়ার সম্পদ ও শক্তি, এতে কি তাদের সাফল্য প্রমাণিত হয় না? এর জবাবে পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ.

তাদের এ সুখ-সম্পদ, আনন্দ-উল্লাস দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনেই, দুনিয়ার এ কয়েকটি দিনই তারা আনন্দ উল্লাস করবে। এরপর আল্লাহ্ পাকের নিকটই তাদের ফিরে যেতে হবে। তখন তারা নিজেদের কীর্তিকলাপের কঠিন কঠোর শাস্তি ভোগ করবে আর সেই শাস্তি সাময়িক হবেনা; বরং হবে চিরস্থায়ী।

বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য পন্থী অনেকে একথা বলে যে, পাশ্চাত্যবাসীরা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলকে মানেনা ঠিকই, কিন্তু তারা অনেক উন্নতি করেছে। অথচ তাদের উন্নতি প্রকৃতপক্ষে অবনতি ব্যতীত আর কিছুই নয়। মানবতার উৎকর্ষ সাধনে তাদের কোন ভূমিকা নেই, তাদের অবৈধ, অপবিত্র জীবন ধারা, তাদের মদ্য পানের অবস্থা, তাদের সুদখোরী, প্রতারণা, ছলচাতুরী এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কার্য-কলাপ এবং এইডস সহ অন্যান্য মারাত্মক রোগ সমূহের অবস্থা, তাদের সমাজ জীবনের দুর্গতি, অধিক পরিমাণে তালাকের হাল, অনাচার এবং ব্যাভিচারের প্রসার সহ অন্যান্য দুরবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে একথা প্রমাণিত হয় যে, তারা সফলকাম হয়নি এবং আলোচ্য আয়াতে পবিত্র কোরআনের চিরন্তন ঘোষণা তাদের ব্যাপারে বাস্তবায়িত হয়েছে। পবিত্র কোরআন একথাই ঘোষণা করছে যে, পৃথিবীর যে জাতি বা সম্প্রদায়ই আল্লাহ্ পাকের প্রতি ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনবে না এবং পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষাকে গ্রহণ করবেনা, তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করবেনা তারা সাফল্য লাভ করতে পারবে না। তারা সত্যিকার কল্যাণ লাভ থেকে চির বঞ্চিত হবে। প্রকাশ্যে তাদের উন্নতি লক্ষ্য করা গেলেও প্রকৃতপক্ষে তারা অবনতি এবং অধঃপতনের সর্বনিম্নস্তরে পৌঁছবে। পবিত্র কোরআন বিবর্জিত জাতি সমূহের জীবন-চিত্রের প্রতি লক্ষ্য করলে এ সত্য উপলব্ধি করতে বিলম্ব হয়না এবং আলোচ্য আয়াতের মর্মবাণী উপলব্ধি করা যায় অতি সহজে।[১]

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৪৮

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَٰقَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ
مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَٰتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ
وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا
تُنْظِرُونِ ﴿٧١﴾ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا
عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَٰهُ
وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَٰهُمْ خَلَٰٓئِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَٰتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٧٣﴾

তরজমা

(৭১) (হে রসূল!) তাদেরকে নূহের অবস্থা শুনিয়ে দিন। যখন সে তার জাতিকে বলেছিলো, আমার অবস্থান এবং আল্লাহ পাকের আয়াত দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ প্রদান যদি তোমাদের নিকট অসহনীয় হয় (তবে জেনে রাখ) আমি আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করলাম। অতএব, তোমরা সম্মিলিতভাবে আমার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর, তোমাদের সকল শরীককে একত্রিত কর। পরে যেন তোমাদের করণীয় কাজে কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ না থাকে, এরপর তোমরা যা ইচ্ছা আমার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত কর এবং আমাকে অবকাশ দিওনা।

(৭২) এরপর তোমরা যদি বিমুখ হও (হতে পার) আমিতো তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাইনি। আমার পারিশ্রমিক শুধু আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে। আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি অনুগতদের অন্তর্গত থাকি।

(৭৩) তারা নূহকে মিথ্যাজ্ঞান করে, এরপর তাকে ও তার সঙ্গে যারা তরীতে ছিল তাদের সকলকে আমি উদ্ধার করি এবং তাদেরকে আমি স্থলাভিষিক্ত করি। আর যারা আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করেছিলো তাদেরকে আমি নিমজ্জিত করি। অতএব, দেখ যাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিলো তাদের পরিণাম কি হয়েছে?

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাকের একত্ববাদ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালত এবং কেয়ামতের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে এবং দ্বীন ইসলামের দুশমনদের তরফ থেকে উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে।

আলোচ্য আয়াত থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে এবং কাফের মুশরেকদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করার লক্ষ্যে পূর্বকালের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে যাতে করে আরববাসী এসব ঘটনা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে এবং তারা এ সত্য উপলব্ধি করে যে, দুনিয়ায় শক্তি-সামর্থ্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ধন-সম্পদের প্রাচুর্য এক কথায় কোন কিছুই মানুষকে আল্লাহ পাকের আযাব থেকে রক্ষা করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, দুনিয়ার জীবন নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী, এখানকার সুখ-সামগ্রী অবশেষে মানুষকে চিরতরে ছেড়ে যেতে হয়। কোন কিছুই মানুষের চিরসাথী হয়না। যারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করে আম্বিয়ায়ে কেরামের বিরোধিতা করে, আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয় তাদের শাস্তি অবধারিত। শাস্তি আসতে হয়তো বিলম্ব হয় কিন্তু শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার কোন পন্থা থাকে না।

হযরত নূহ (আঃ)-কে "আদমে সানী" বলা হয়। মানব জাতির ইতিহাসে সর্বপ্রথম তাঁর যুগেই মানুষ মূর্তি পূজা শুরু করে। যদিও হযরত আদম (আঃ)-ই সর্বপ্রথম মানুষ, সর্বপ্রথম নবী রসূল, আল্লাহ পাক সরাসরি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন তবে হযরত আদম (আঃ)-এর জমানায় কুফর ও নাফরমানী ছিলনা। হযরত আদম (আঃ)-এর দশ যুগ পর কুফরী এবং নাফরমানী শুরু হয়। তখন আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আঃ)-কে প্রেরণ করেন যেন তিনি কাফেরদেরকে তৌহিদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের দিকে আহ্বান জানান। কিন্তু হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নে রাজী হয়নি। সুদীর্ঘ হাজার বছর ধরে নূহ (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে সত্য পথের নির্দেশনা দিতে থাকেন কিন্তু তারা তাঁর হেদায়েত কবুল করতে প্রস্তুত হয়নি। এরপর হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের জন্যে এসেছে আল্লাহ্‌র আযাব। প্রলয়ংকরী বন্যা এসে তাদেরকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ

(হে রসূল!) মক্কাবাসীকে আপনি নূহ (আঃ) সম্প্রদায়ের অবস্থা শুনিয়ে দিন। তারা আল্লাহ্‌র নবীর বিরোধিতা করার যে পরিণাম ভোগ করেছে, সত্যদ্রোহীতার কারণে তারা যে শাস্তি ভোগ করেছে তা মক্কাবাসীর সম্মুখে তুলে ধরুন। নূহ (আঃ)-এর বিরোধিতা করার কারণে তাঁর যুগের কাফেরদের যে কঠোর শাস্তি হয়েছে, (হে রসূল!) মক্কাবাসীও যদি আপনার বিরোধিতা পরিহার না করে তবে তাদের শাস্তিও অনিবার্য। অসত্যের পূজারীদের ধ্বংস আসন্ন।

(হে রসূল!) কাফেরদের অন্যায় আচরণে আপনি মর্মাহত হবেন না। কেননা, যুগে যুগে দূরাত্মা কাফেররা আম্বিয়ায়ে কেরামের সাথে এমন আচরণই করেছে। কিন্তু শেষ রক্ষা তাদের হয়নি; বরং তাদের অন্যায় আচরণের কারণে তাদেরকে আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত হতে হয়েছে।

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يٰقَوْمِ ۔

স্মরণ কর সে সময়কে যখন নূহ (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেনঃ

إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِيْ.

হে আমার সম্প্রদায়! যদি সুদীর্ঘ কাল যাবত তোমাদের মাঝে আমার অবস্থান দুঃসহ মনে হয়, তোমাদেরকে যে আমি আল্লাহ্র আয়াত সমূহ দ্বারা নসিহত করি তা যদি তোমাদের নিকট বিরক্তিকর মনে হয়, যদি তোমরা আমার সত্যের প্রচার সহ্য করতে না পার, আল্লাহ পাকের বিধান অমান্য করতে থাক, তবে তাতে আমার কোন ক্ষতি নেই। আমি শুধু আমার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করলাম। তোমাদের নিকট আল্লাহ পাকের বাণী পৌঁছে দিলাম, তোমরা আমার ক্ষতি করতে চাইলেও তাতে সক্ষম হবেনা এবং আমার কর্তব্য পালনে বাধা দিতে পারবেনা, কেননা, فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করেছি।

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ.

আর যে আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করে, তিনিই তার জন্যে যথেষ্ট, আল্লাহ পাকের উপর আমার এ অবিচলিত ভরসাই তোমাদের যাবতীয় চক্রান্তকে ব্যর্থ করার জন্যে যথেষ্ট মনে করি।

فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ.

অতএব, তোমরা সম্মিলিতভাবে আমার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর, আর তোমাদের সকল শরীককে একত্রিত কর, আমার ক্ষতি সাধনের ব্যবস্থা গ্রহণ কর। আর আমার বিরুদ্ধে যা কিছু ইচ্ছা কর, গোপনে নয় প্রকাশ্যেই তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য সাধনে সচেষ্ট হও।

ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ.

এরপর আমার বিরুদ্ধে তোমাদের কর্ম পন্থা কার্যকর কর, আমাকে মোটেই অবকাশ দিওনা।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর কথাটির মধ্যে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমরা শত চেষ্টা করেও আমার কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হবেনা, যদি পার তবে ক্ষতি করার চেষ্টা কর।

হযরত নূহ (আঃ)-এর কথাটির উদ্ধৃতির উদ্দেশ্য হল এ তথ্য প্রকাশ করা যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর পূর্ণ এবং সুদৃঢ় ও অবিচল বিশ্বাস ছিল আল্লাহ পাকের প্রতি, আল্লাহ পাকের সাহায্যের প্রতি, এজন্যে তিনি তাদের ব্যাপারে ভীত ছিলেন না। তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর সম্প্রদায় এবং তাদের উপাস্যরা তাঁর কোন প্রকার ক্ষতি করতে সক্ষম হবেনা, যেমন কোন প্রকার উপকারও করতে পারবেনা। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এ বিষয়টি উল্লেখ করে বিশ্ববাসীকে একথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা দেখে নাও আল্লাহ পাকের প্রতি তাঁর নবীর ভরসা কেমন হয়। আল্লাহ ব্যতীত তিনি আর কাউকে ভয়

করেন না। ভয় করেন শুধু এক আল্লাহ পাককে, আর কোন কিছুকে নয়। কেননা আল্লাহ পাক সাহায্য করলে, আল্লাহ্ পাকের হেফাজত থাকলে পৃথিবীর কোন শক্তি তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা।[১]

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে তফসীরকারগণ একথাও লিখেছেন, হযরত নূহ (আঃ) প্রায় সুদীর্ঘ হাজার বছর ধরে তবলিগ করার পর যখন তাঁর সম্প্রদায় সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেলেন, তখন তিনি এসব কথা বলেছিলেন। আর সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন, তোমরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পার, আমি তোমাদের বিরোধিতা এবং ষড়যন্ত্রকে ভয় করিনা। কেননা, আমি এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ ভরসা করেছি।

মূলতঃ কোন সৃষ্টির ভয় হলে তা দূরীভূত করার একমাত্র পন্থাই হল আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করা। আর মানুষ যখন আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ ভরসা করে তখন সে নির্ভীক চিত্তের অধিকারী হয়।

فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ

তোমরা সকলে মিলে মিশে আমার বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ কর এবং আমার ক্ষতি সাধনের ষড়যন্ত্রকে সুদৃঢ় কর।

আলোচ্য আয়াতে اَمْرٌ অর্থ হল কাফেরদের ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা আর যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্র শরীক মনে কর (নাউজুবিল্লাহ মিন জালেক) তাদেরকেও একত্রিত কর। কিন্তু যা বাস্তব, যা সত্য তা হল সারা পৃথিবীর মানুষ একত্রিত হয়ে আল্লাহ্র নবীর কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

এ ঘটনায় হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে সান্ত্বনা রয়েছে এ মর্মে যে, পূর্বকালে আম্বিয়ায়ে কেরামের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে এবং তাঁরা কি ভাবে সবর অবলম্বন করেছেন তার দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় হযরত নূহ (আঃ)-এর এ ঘটনায়।[২]

فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র নবী আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করেন না, ভয় শুধু আল্লাহ্র প্রতি। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে আল্লাহ্র নবী যে শুধু কোন সৃষ্টিকে ভয় করেন না তাই নয়; বরং কারো কাছে কোন আশাও করেন না। আম্বিয়ায়ে কেরাম আশা করেন শুধু আল্লাহ পাকের নিকট আর ভয়ও করেন শুধু তাঁকে। তাই এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, নবীর মন লোভ-লালসা এবং বন্দার নিকট কোন প্রকার আশা করা থেকে পবিত্র। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যদি তোমরা বিমুখ হও–

[১]। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫২৯
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৯০
[২]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৪৮

فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ

মনে রেখ, আমি তোমাদের নিকট আমার সত্য-সাধনার জন্যে কোন পারিশ্রমিক চাইনা। কোন প্রকার অর্থ-সম্পদের সাহায্য কামনা করিনা। তাই তোমরা আমার বিরোধিতা করার কারণে আমার কোন প্রকার দৈহিক বা আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতির আশঙ্কা নেই। আমি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাইনা।

اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ.

দ্বীন ইসলামের তবলিগের জন্যে আমার পারিশ্রমিক আল্লাহ্ পাক দান করবেন। তিনি নিজেই এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আর আমার প্রতি আদেশ হয়েছে আমি যেন আল্লাহ পাকের অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত থাকি।

মূলতঃ আমার এ সত্য-সাধনার লক্ষ্য অর্থ লিপ্সা, একথা বলার সুযোগ কারোই থাকবে না; বরং আমার প্রতি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে দ্বীন ইসলামের তবলিগের যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে আমি শুধু সে দায়িত্বই পালন করে যাচ্ছি। তোমাদের বিরোধিতায় আমার ক্ষতি হবে এমন দুশ্চিন্তা আমার নেই। আল্লাহ পাকের দয়া এবং করুণা যে আমার প্রতি বর্ষিত হবে– এ বিশ্বাস এবং ভরসা আমার রয়েছে।

فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ.

হযরত নূহ (আঃ) শতাব্দীর পর শতাব্দী তাঁর সম্প্রদায়কে সত্যের দিকে আহ্বান করেছেন। কুফর ও নাফরমানী পরিত্যাগ করার জন্যে অনুরোধ করেছেন। দ্বীন ইসলাম গ্রহণের জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কিন্তু তাঁর শত চেষ্টা সত্ত্বেও তারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়নি এবং তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে। হযরত নূহ (আঃ) এবং তাঁর প্রতি যাঁরা ঈমান এনেছে তাদেরকে উপহাস করেছে। অবশেষে তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের আযাবের আদেশ হয়। প্রলয়ংকরী বন্যা এসে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এ ঐতিহাসিক বন্যার আক্রমণ থেকে শুধু হযরত নূহ (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গী মোমেনগণই রক্ষা পেয়েছিলেন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَنَجَّيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ.

অতঃপর আমি নূহ এবং তাঁর সঙ্গের মোমেনদেরকে রক্ষা করি। আর অবাধ্য কাফেররা সকলেই ধ্বংস হয়ে যায়।

وَجَعَلْنٰهُمْ خَلٰٓئِفَ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا

যারা সেদিন আসমানী গজব থেকে রক্ষা পেয়েছিল সমগ্র বিশ্বমানব তাদেরই বংশধর। যারা সেদিন নিমজ্জিত হয়েছিল তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল এই মোমেনগণ। বলাবাহুল্য, কয়েকজন মোমেনের ঈমানের বরকতেই সেদিন মানব জাতির বংশ সংরক্ষিত থাকে।

অতএব, বিশ্ববাসীর জন্যে রয়েছে এতে বিরাট শিক্ষা যারা সত্যের মোকাবেলা করেছে, আল্লাহ্‌র নবীকে যারা মিথ্যা জ্ঞান করেছে তারা ধ্বংস হয়েছে। আল্লাহ্‌র নবীর মোকাবেলায় কাফের মুশরেকদের অগাধ ধন-সম্পদ এবং ক্ষমতা-প্রভাব-প্রতিপত্তি কোন কিছুই কাজে লাগেনি; বরং তাদের অহংকার ভূলুণ্ঠিত হয়েছে।

নূহ (আঃ)-এর তুফান কোথায় হয়েছে

তফসীরকারগণ উল্লেখ করেছেন, এ ঐতিহাসিক প্লাবন হয়েছে ইরাকের দজলা এবং ফোরাত নদীর মধ্যবর্তী এলাকায়। ঐতিহাসিকগণ ঐ এলাকায় জরিপ কার্য চালিয়েছেন এবং পরিমাপ করেছেন। প্রায় চারশ' মাইল দৈর্ঘে এবং প্রস্থে একশ' মাইল এলাকায় এই প্লাবন এসেছিলো। হযরত নূহ (আঃ)-কে আল্লাহ পাক যে তরী প্রস্তুত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তা দৈর্ঘে তিনশত হাত এবং প্রস্থে ছিল পঞ্চাশ হাত এবং উচ্চতা ছিল ত্রিশ হাত। এর অর্থ হল বর্তমান যুগে বৃটেন এবং আমেরিকার মধ্যে যে সব নৌ-যান চলাচল করে তার সমানই ছিল হযরত নূহ (আঃ)-এর জাহাজ। যারা আল্লাহ্‌র রহমতে আল্লাহ্‌র নবীর অনুসরণের বরকতে সেদিন প্রলয়ংকরী বন্যার শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন তারাই পুনরায় সেই এলাকায় আবাদ হয়েছিলেন। ঐতিহাসিকগণ এ সত্য স্বীকার করেছেন যে, তদানীন্তকালে নূহ (আঃ)-এর জাতি ব্যতীত পৃথিবীতে আর কোন সম্প্রদায় ছিলনা।[১]

যারা রক্ষা পেয়েছিলেন তাদের সংখ্যা

وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا

এ বাক্যটির তফসীরে আল্লাহ আলুসী (রহঃ) লিখেছেন, যারা হযরত নূহ (আঃ)-কে মিথ্যা জ্ঞান করেছিলো আল্লাহ পাক তাদের সকলকে ধ্বংস করেছিলেন। কিন্তু যারা হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন তাদেরকে আল্লাহ পাক প্রলয়ংকরী বন্যা থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ জন পুরুষ এবং চল্লিশ জন নারী।[২]

অতএব, লক্ষ্য কর যাদেরকে আল্লাহ পাকের আযাবের ভয় দেখানো হয়েছিল সেই অবাধ্য কাফেরদের পরিণাম কত ভয়াবহ হয়েছে। ক্ষণিকের মধ্যে তাদেরকে কিভাবে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে। এটি অবশ্যই শিক্ষনীয় বিষয়।

جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں = یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں

"দুনিয়া মন বসাবার স্থান নয়, এটি হল শিক্ষা গ্রহণের স্থান, খেল-তামাশার স্থান এটি নয়"।

---

[১]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৪৯

[২]। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১৬০

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهٖ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا
كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ
الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٧٤﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى
فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿٧٥﴾
فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْۤا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ
﴿٧٦﴾ قَالَ مُوْسٰۤى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ؕ اَسِحْرٌ هٰذَا ؕ وَلَا
يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ ﴿٧٧﴾ قَالُوْۤا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ
اٰبَآءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِى الْاَرْضِ ؕ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا
بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٨﴾

তরজমা

(৭৪) আমি নূহের পর পুনরায় রসূলগণকে তাদের সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করি, তারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে উপস্থিত হন, কিন্তু তারা পূর্বে যা প্রত্যাখ্যান করেছিলো তাতে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত হয়নি। এভাবেই আমি সীমা লঙ্ঘনকারীদের অন্তরকে মোহরাঙ্কিত করে দেই।

(৭৫) পরে আমি মূসা এবং হারুনকে সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়ে ফেরাউন ও তার পারিষদের নিকট প্রেরণ করি, কিন্তু তারা অহংকার করতে থাকে মূলতঃ তারা ছিল পাপীষ্ঠ সম্প্রদায়।

(৭৬) এরপর যখন তাদের নিকট সত্য উপস্থিত হল, তখন তারা বললো এটি নিঃসন্দেহে সুস্পষ্ট যাদু।

(৭৭) মূসা বললেন, তোমাদের নিকট সত্য উপস্থিত হওয়ার পরও কি তোমরা বলতে চাও এটি কি যাদু? আর যাদুকররা তো সফলকাম হয়না।

(৭৮) তারা বললো, আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি, তুমি তা থেকে আমাদেরকে বিচ্যুত করার জন্যেই আমাদের নিকট এসেছ এবং তোমরা দু'জন দেশের নেতৃত্ব লাভ করতে চাও, এ উদ্দেশ্যে? আমরা কিন্তু তোমাদের প্রতি বিশ্বাসী নই।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত নূহ (আঃ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে হযরত নূহ (আঃ)-এর পর যে আম্বিয়ায়ে কেরাম তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত হন তাঁদের উল্লেখ রয়েছে। যদিও আলোচ্য আয়াতে তাঁদের নামোল্লেখ করা হয়নি কিন্তু অন্যত্র তাঁদের নামও ঘোষিত হয়েছে। হযরত নূহ (আঃ)-এরপর হযরত হুদ (আঃ) আদ জাতির নিকট এবং হযরত সালেহ (আঃ) সামুদ জাতির নিকট প্রেরিত হন। আর হযরত ইব্রাহিম (আঃ), লুত (আঃ), শোয়ায়েব (আঃ) নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত হন এবং আম্বিয়ায়ে কেরাম তাঁদের নবুওয়্যতের দলিল স্বরূপ সুস্পষ্ট নিদর্শন তথা বিস্ময়কর মোজেযা নিয়ে আসেন। কিন্তু যেভাবে হযরত নূহ (আঃ)-কে তাঁর সম্প্রদায় মিথ্যাজ্ঞান করেছিল এবং অবশেষে আল্লাহ্ পাকের কোপগ্রস্ত হয়েছিলো, ঠিক তেমনি এই আম্বিয়ায়ে কেরামের সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাঁদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে এবং তাঁদের ঈমানী আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা আল্লাহর নাফরমানী শেরক, অনাচার-অবিচারে লিপ্ত ছিল, সত্যকে তারা শুধু যে গ্রহণ করেনি তাই নয়, বরং সত্যকে মিথ্যা জ্ঞান করার ধৃষ্টতাও তারা দেখায়। তাদের নিকট আল্লাহ্ পাকের প্রেরিত রসূলের আগমন এবং পরকালীন জিন্দেগী সম্পর্কে তাঁদের সতর্কবাণী সত্ত্বেও তাদের অন্যায়-অনাচার তারা অব্যাহত রাখে। তাদের জুলুম অত্যাচার পরিহার করার ব্যাপারে তারা ইতিপূর্বে যেমন অস্বীকৃতি জানায়, আম্বিয়ায়ে কেরামের শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের অন্যায় আচরণ ও দুর্নীতি বর্জন করতে তারা প্রস্তুত হয়নি। পরিণামে হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতির ন্যায় তারাও ধ্বংস হয়। তাই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ.

অর্থাৎ-নূহ (আঃ)-এর পর আমি কত নবীকে তাদের জাতির নিকট প্রেরণ করেছি, তারা তাদের জাতির নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন তথা মোজেযা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। আল্লামা আলুসী (রহঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ اِلٰى قَوْمِهِمْ শব্দটি দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, তখন আম্বিয়ায়ে কেরামকে তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করা হয়। সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট অন্য কোন নবীকে প্রেরণ করা হয়নি। সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট শুধু একজন নবীই প্রেরিত হয়েছেন, তিনি হলেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا.

"(হে রসূল!) আপনি বলুন! হে মানব জাতি! আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহর রসূল"। আরো এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ.

"(হে রসূল!) আপনাকে সমগ্র বিশ্ব-সৃষ্টির জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি"। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শ বিশ্ব জনীন। তাঁর আহ্বান সমগ্র বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে। এটি তাঁরই বৈশিষ্ট্য।[১]

كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ.

অর্থাৎ-যেভাবে ইতিপূর্বে আমি নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় এবং তারপর অন্যান্য নবীগণের সম্প্রদায়ের অন্তরকে মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছিলাম ঠিক এভাবে (হে রসূল!) আপনার উম্মতের যে সব লোক সীমালঙ্ঘন করে, তাদের অন্তরকেও আমি মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছি। আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে তফসীরকারগণ বলেছেন, যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে তথা যারা সত্যের বিরোধিতা করে, এ বিরোধিতা বৃদ্ধি পেয়ে তা শত্রুতায় পরিণত হয়, তখন মানব অন্তরে জেদ সৃষ্টি হয়। আর সেই জেদ রক্ষা করার জন্যে মানুষ অন্যায়-অনাচার, প্রতারণা ও হঠকারিতার আশ্রয় গ্রহণ করে আর এটি মানুষের কু-অভ্যাসে পরিণত হয়। পরিণামে মানব অন্তরের সকল কল-কব্জা বিনষ্ট হয়ে যায়। হৃদযন্ত্র বন্ধ হলে মানুষের মৃত্যু হয়। কিন্তু হৃদযন্ত্র এক্ষেত্রে বন্ধ না হলেও বিকল হয়ে যায়। এর প্রতিক্রিয়ায় মানুষটি জীবিত থাকলেও মানবতার মৃত্যু হয়। অর্থাৎ সেই মানুষটি সত্য গ্রহণের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। মানুষের মনের এ অবস্থাকে আলোচ্য আয়াতে "نَطْبَعُ" (মোহরাঙ্কিত) শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[২]

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কয়েকজন নবীর ঘটনাবলীর বিবরণ ছিল। এ আয়াত থেকে হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনার বিবরণ স্থান পেয়েছে, তাঁকে আল্লাহ পাক ফেরাউনের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। কেননা, ফেরাউন অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েছিল, এমনকি খোদায়ী দাবী করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছিল। ফেরাউন তার সম্পদ এবং শক্তির কারণে অত্যন্ত অহংকারী ছিল। ফেরাউনের এ অহংকারই অবশেষে তার পতনের কারণ হয়। ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায় ছিল অপরাধপ্রবণ, তারা ছিল পাপীষ্ঠ। হযরত মূসা (আঃ)-কে যখন আল্লাহ পাক তার নিকট সুস্পষ্ট দলিল এবং অলৌকিক শক্তি নিয়ে প্রেরণ করলেন, ফেরাউন এবং তার দলবল হযরত মূসা (আঃ)-এর মোজেযা প্রত্যক্ষ করেও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো না; বরং অহংকার করলো এমনকি, দাম্ভিক ফেরাউন হযরত মূসা (আঃ)-কে সম্বোধন করে বলেছিলঃ

اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا

"আমি কি তোমাকে প্রতিপালন করিনি"?

হযরত মূসা (আঃ) তাঁর "আসা" এবং "শুভ্র হস্ত" মোজেযা স্বরূপ প্রকাশ করলেন। কিন্তু ফেরাউন ঈমান আনা তো দূরের কথা, বরং সে মোজেযাকে অস্বীকার করলো এবং বললো, এসব হল যাদু। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

---

[১]। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১০৭
তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৪৯

[২]। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-২৮০

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ بِاٰيٰتِنَا

فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ.

"পুনরায় আমি মূসা এবং হারুনকে আমার নিদর্শন সমূহ সহ ফেরাউন এবং তার পারিষদের নিকট প্রেরণ করি, কিন্তু তারা অহংকার করতে থাকে। মূলতঃ তারা ছিল পাপীষ্ঠ সম্প্রদায়"।

তাদের অপরাধ প্রবণতার কারণেই তারা হযরত মূসা (আঃ)-এর কথা মানতে রাজি হয়নি। তাদের পাপ প্রবৃত্তি তাদেরকে সত্য গ্রহণে বিরত রাখে। আল্লাহর নবীর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করতে তারা দ্বিধা-বোধ করেনি।

তফসীরকারগণ উল্লেখ করেছেন যে, ফেরাউন খেতাব ছিল মিশরের কিবতী রাজার। ফেরাউন বনী ইসরাঈল জাতিকে গোলাম করে রেখেছিল এবং তাদের প্রতি চরম জুলুম অত্যাচার করছিলো। বনী ইসরাঈল ফেরাউনের প্রজা ছিল। আর তাদের মধ্য থেকেই আল্লাহ পাক তাঁর নবী মনোনীত করেছেন। তিনি হলেন মূসা এবনে এমরান। কিন্তু ফেরাউন হযরত মূসা (আঃ)-এর নবুওয়্যতকে কোন অবস্থাতেই মেনে নিতে রাজি ছিল না। এতদ্ব্যতীত একটি মূর্খ এবং অত্যাচারী সম্প্রদায় আল্লাহর নবীর নৈতিক গুণাবলীর মূল্যায়ন কি করে করবে? তাই হযরত মূসা (আঃ)-এর মোজেযাকে তারা যাদু বলে আখ্যা দিয়েছে।[১] এরশাদ হয়েছেঃ

فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْٓا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ.

যখন তাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে সত্য পৌছল, তখন তারা বললো, নিশ্চয় এটি সুস্পষ্ট যাদু। অথচ হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ পাক প্রদত্ত মোজেযা দেখিয়েছিলেন, তাই হযরত মূসা (আঃ) তাদের কথার জবাবে বলেছিলেনঃ

قَالَ مُوْسٰٓى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ؕ اَسِحْرٌ هٰذَا

হযরত মূসা (আঃ) তাদেরকে বললেন, তোমাদের নিকট যখন সত্য এসেছে, সত্য দ্বীনের আহ্বান তোমরা পেয়েছ। আল্লাহ পাকের সত্য নবী তোমাদের নিকট এসেছেন, তাঁর মোজেযা তথা নবুওয়্যতের দলিল এবং জীবন্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছ তারপরও তোমরা তাঁকে যাদু বলেছো? অথচ যাদুকরী ধোকাবাজী এবং প্রতারণা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এটিই কি তাদের বুদ্ধির দৌড়?

যাদুকরীর সাথে মোজেযার কোনই সম্পর্ক নেই, যেমন পিতলের সঙ্গে স্বর্ণের কোন সম্পর্ক থাকেনা।

وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ.

---

[১]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৪৯

আর যাদুকররা কখনও সফলকাম হয়না। কেননা, আখেরাতের সাফল্য ঈমান এবং তাকওয়া পরহেযগারীর উপর নির্ভর করে। আর যাদু অন্যায় অনাচার এবং শেরক ও কুফরের দিকে মানুষকে নিয়ে যায়। তাই যাদু কোন দিনও সাফল্যের উপকরণ হয়না।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, যদি আলোচ্য বাক্যটি হযরত মূসা (আঃ)-এর কথা হয়ে থাকে তবে তার এ ব্যাখ্যাই হবে যা লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু যদি এ বাক্যটি ফেরাউনের পক্ষ থেকে উচ্চারিত হয়ে থাকে বলে মনে করা হয় তবে এর অর্থ হবে যেন ফেরাউন বলেছে, হে মূসা, তুমি কি যাদু দেখিয়ে সাফল্য লাভ করতে চাও? অথচ যাদুকররা কখনও সফলকাম হয়না।[১]

قَالُوٓا اَجِئۡتَنَا لِتَلۡفِتَنَا عَمَّا وَجَدۡنَا عَلَيۡهِ اٰبَآءَنَا.

তারা হযরত মূসা (আঃ)-কে বললো, তোমরা কি এজন্যে এসেছো যে, আমাদেরকে আমাদের পূর্ব পুরুষের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করবে। অর্থাৎ মূর্তিপূজা এবং ফেরাউনের পূজা থেকে আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও?

وَتَكُوۡنَ لَكُمَا الۡكِبۡرِيَآءُ فِى الۡاَرۡضِ.

আর মনে হয় তোমরা দেশের নেতৃত্ব চাও ধর্মের ছদ্মবেশে। তোমরা রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করতে প্রয়াসী হয়েছ। তোমরা ধর্মের কথা বলে মিশরের ক্ষমতা অর্জন করতে চাও?

وَمَا نَحۡنُ لَكُمَا بِمُؤۡمِنِيۡنَ.

তবে মনে রেখ তোমাদের স্বপ্ন সফল হবেনা, কেননা আমরা তোমাদের প্রতি বিশ্বাস করবো না।

অর্থাৎ আমরা তোমাদের অনুসারী হবোনা, আমরা তোমাদের কথায় বিশ্বাস করবোনা।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, যারা পার্থিব জগতের ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে, এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের মায়া মোহে মুগ্ধ থাকে তারা অন্যদেরকেও নিজেদের মতই মনে করে। এজন্যেই ফেরাউন এবং তার দলবল হযরত মূসা (আঃ)-এর ব্যাপারে আপত্তিকর মন্তব্য করেছে। "মনে হয় তোমরা দেশের ক্ষমতা অর্জন করতে চাও"। অথচ আল্লাহর নবীর আবির্ভাব হয় মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণের জন্যে, দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের শান্তির জন্যে।[২]

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৩২

[২]। তফসীরে মাজেদী খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৫০

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيمٍ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ
قَالَ لَهُمْ مُّوسٰى اَلْقُوا مَا اَنْتُمْ مُّلْقُونَ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُوسٰى
مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ
﴿٨٢﴾ فَمَا اٰمَنَ لِمُوسٰى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ
وَمَلَا۟ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْاَرْضِ وَاِنَّهٗ لَمِنَ
الْمُسْرِفِينَ ﴿٨٣﴾ وَقَالَ مُوسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ
فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ ﴿٨٤﴾ فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا
رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ ﴿٨٥﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ
الْقَوْمِ الْكٰفِرِينَ ﴿٨٦﴾

তরজমা

(৭৯) আর ফেরাউন বললো, তোমরা আমার নিকট অভিজ্ঞ যাদুকরদেরকে উপস্থিত কর।

(৮০) এরপর যখন যাদুকররা উপস্থিত হলো, মূসা তাদেরকে বললেন, "তোমাদের যা নিক্ষেপ করার নিক্ষেপ কর"।

(৮১) যখন তারা নিক্ষেপ করলো তখন মূসা বললেন, "তোমরা যা এনেছো, তাতো যাদু, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তা বিনষ্ট করে দেবেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক দূবৃত্তদের কাজকে সার্থক করেন না"।

(৮২) আর দূরাত্মারা যতই বিরক্তিবোধ করুক না কেন আল্লাহ্ পাক তাঁর বাণী মোতাবেক সত্যকে সু-প্রতিষ্ঠিত করবেন।

(৮৩) ফেরাউন ও তার দলের লোকদের নির্যাতনের ভয়ে মূসার সম্প্রদায়ের কতিপয় লোক ব্যতীত তার প্রতি আর কেউ ঈমান আনেনি, দেশে ফেরাউন ছিল অত্যন্ত পরাক্রমশালী, আর সে ছিল সীমা লঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

(৮৪) এবং মূসা বলেছিলেন, "যদি তোমরা আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান এনে থাক, যদি তোমরা তাঁর প্রতি অনুগত হয়ে থাক, তবে তাঁর প্রতিই ভরসা কর।

(৮৫) তারা বললো, আমরা আল্লাহ পাকের প্রতিই ভরসা করলাম, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে জালেম সম্প্রদায়ের নির্যাতনের পাত্র করোনা।

(৮৬) আর আমাদেরকে তোমার দয়ায় কাফের সম্প্রদায় থেকে রক্ষা করো।

তফসীরুল কোরআন

ফেরাউন এবং তার দলের লোকেরা হযরত মূসা (আঃ)-কে যে জবাব দিয়েছিল তার বিবরণ রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতে। এরপর মূসা (আঃ)-এর মোকাবেলা করার জন্যে ফেরাউন সুদক্ষ এবং অভিজ্ঞ যাদুকরদের একত্রিত করার জন্যে আদেশ দিল, এরশাদ হয়েছেঃ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ.

(আর ফেরাউন বলল, আমার নিকট সুদক্ষ যাদুকরদেরকে উপস্থিত কর) এ সম্পর্কে সূরা আরাফে বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে। যাদুকররা হযরত মূসা (আঃ)-কে বলল আপনি আগে কোন প্রকার কৃতিত্ব দেখাবেন না আমরা দেখাব? হযরত মূসা (আঃ) বললেনঃ

مَا أَنتُم مُّلْقُونَ.

তোমরাই যা দেখাবার তা দেখিয়ে দাও, এ প্রসঙ্গে তফসীরকারগণ লিখেছেন, মিথ্যা এবং ধোকার সর্বপ্রকার স্বরূপ প্রকাশিত হওয়ার পরই তার উপর সত্যের আক্রমণ যুক্তিযুক্ত মনে করা হয়। যাতে করে সত্য প্রকাশিত হবার পর মিথ্যের বেসাতি আর অবশিষ্ট না থাকে এবং সত্য সু-প্রতিষ্ঠিত হয়।

فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ.

হযরত মূসা (আঃ)-এর জবাব পেয়ে যাদুকররা তাদের লাঠি এবং দড়ি মাটিতে নিক্ষেপ করে যা সাপে পরিণত হয়। ক্ষণিকের মধ্যে মাঠ সাপে পূর্ণ হয় এবং এক ভয়াবহ দৃশ্যের অবতরণা করে। কিন্তু হযরত মূসা (আঃ) তখন বললেন,

إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ

তোমরাতো শুধু যাদুই দেখিয়েছ, ইতিপূর্বে তোমরা আল্লাহর নবীর মোজেযাকে যাদু বলেছিলে, অথচ প্রকৃতপক্ষে তা যাদু ছিল না। এখন তোমরা মোজেযার মোকাবেলায় যাদুকরদেরকে হাযির করেছ, তারা যাদু দেখিয়েছে, কিন্তু মনে রেখ নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের যাদুকে নির্ঘাত বিনষ্ট করে দেবেন। তোমরা এখনই তা দেখে নেবে কেননা,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ.

নিশ্চয় আল্লাহ পাক অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কাজকে সার্থক করেন না। যারা সমাজের দুর্বৃত্ত, যারা অশান্তি সৃষ্টিকারী, যারা সীমা লঙ্ঘনকারী তাদের ব্যর্থতা অবধারিত। আল্লাহ পাক এমন লোকদেরকে ব্যর্থ মনোরথ করেন এবং

وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ.

আল্লাহ পাক তাঁর মহান বাণী অনুযায়ী সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, যদিও পাপীষ্ঠরা তা অপছন্দ করে।

অবশেষে ঘটনা তাই হয়েছিল, হযরত মূসা (আঃ) যখন আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে তাঁর হাতের লাঠি ছেড়ে দিয়েছিলেন, তখন তা এক বিরাট অজগর সর্পে পরিণত হয়েছিল এবং যাদুকরদের প্রদর্শিত লক্ষাধিক সাপকে মুহূর্তের মধ্যে গিলে ফেলেছিল। এ ভয়ংকর দৃশ্য দেখে ফেরাউন ও তার পান্ডা প্রধানরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছিল। আর যাদুকররা সেজদারত হয়ে বলেছিলঃ

اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى.

(আমরা হারুন ও মূসার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি।) এভাবে সেদিন সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বাতিল ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল।

فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰى

যেহেতু বনী ইসরাঈল জাতির উপর ফেরাউন চরম নির্যাতন করছিল, তাই তার ক্ষমতার অবসান ছিল তাদের অতি কাম্য বিষয়। এমন অবস্থায় হযরত মূসা (আঃ)-এর আবির্ভাবকে বনী ইসরাঈল জাতি আন্তরিকভাবে স্বাগত জানায় এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি তারা ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে। কিন্তু ফেরাউনের জুলুমের ভয়ে হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট সরাসরি হাযির হতে এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনতে অনেকেই সাহস করছিল না। এতদসত্ত্বেও বনী ইসরাঈলের কিছু যুবক এবং কিবতী সম্প্রদায়েরও কিছু লোক হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনে, তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰٓى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ.

অর্থাৎ মূসার সম্প্রদায়ের সামান্য সংখ্যক যুবকই তাঁর প্রতি ঈমান আনে। ফেরাউন ও তার পান্ডা প্রধানদের নির্যাতনের ভয়ে অনেকেই ঈমান আনতে পারেনি।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেনঃ من قومه এ শব্দের সর্বনামটি হযরত মূসা (আঃ)-এর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হল তদানীন্তনকালে মিশরে বনী ইসরাঈলের যে সব লোক বাস করত, তাদের কিছু লোক হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনে।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, বনী ইসরাঈলের যে সব লোকের হেদায়েতের জন্যে হযরত মূসা (আঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন, তাদের সন্তানদের মধ্য থেকে কিছু লোক

ঈমান এনেছিল। ذُرِّيَّةٌ শব্দটি দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়। কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, ফেরাউন যখন বনী ইসরাঈলের সন্তানদের হত্যা করার আদেশ দিয়েছিল, তখন প্রাণ রক্ষার তাগিদে অনেক বনী ইসরাঈলী মা তাদের নবজাত শিশুকে ফেরাউনের সম্প্রদায় কিবতীদেরকে দিয়ে দিয়েছিল।

ঐ শিশুরা কিবতীদের মাঝেই লালিত পালিত হয়। যেদিন হযরত মূসা (আঃ) যাদুকরদের বিরুদ্ধে জয় লাভ করেন, সেদিন অনেক লোক হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনে, এরা বংশের দিক থেকে বনী ইসরাঈলী ছিল, আর প্রকাশ্যে তারা কিবতীদের সন্তান ছিল।

কোন কোন তফসীরকার قَوْمِهٖ শব্দের সর্বনামটির উদ্দেশ্য ফেরাউনকে করেছেন। আতিয়্যা (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর এ অভিমতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, ফেরাউনের সম্প্রদায়ের সামান্য সংখ্যক লোক হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল। ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া, ফেরাউনের কোষাধ্যক্ষ ও তার স্ত্রী এবং ফেরাউনের স্ত্রীর খাদেমা তাদের অন্তর্গত ছিলেন।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে সামান্য সংখ্যক লোকের ঈমান আনয়নের কথা রয়েছে, তারা হলেন সেই সত্তরজন যাদের পিতা ছিলেন কিবতী, মা ছিলেন বনী ইসরাঈলী। তারা হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন।

وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ.

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, ফেরাউন ও তার দলবলের নির্যাতনের ভয়ে খুব কম সংখ্যক লোকই হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। এ আয়াতে তার কারণ বর্ণিত হয়েছে, নিশ্চয় ফেরাউন তখন পৃথিবীতে অত্যন্ত ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী ব্যক্তি ছিল। সে ছিল সীমা লঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। আর এ কারণেই সে শুধু যে ক্ষমতার দাপট দেখাত তাই নয়; বরং "খোদায়ী" দাবী পর্যন্ত করত এবং নবীগণের বংশধরদেরকেও গোলাম বাঁদী বানিয়ে রাখত।

وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ.

যারা ফেরাউনের জুলুম-অত্যাচার সত্ত্বেও হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন, তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দেখে সান্ত্বনা দিয়ে হযরত মূসা (আঃ) বলেছিলেন, তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়োনা, যদি তোমরা প্রকৃত মোমেন হও, আর আল্লাহ পাকের প্রতি অনুগত হও, তবে এক আল্লাহ পাকের প্রতিই ভরসা কর। নিজেকে আল্লাহ পাকের দরবারে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ কর। যে পর্যন্ত মানুষ এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে কাজ না করে তথা এখলাসের গুণ অর্জন না করে এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে পূর্ণ আত্মসমর্পণ না করে, সে পর্যন্ত তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা

করতে পারেনা। আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে এবং তাঁর যাবতীয় বিধি-নিষেধ পালনের মাধ্যমে তাওয়াক্কুলের বহিঃপ্রকাশ হয়।

فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا

যেহেতু হযরত মূসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের মোমেনদেরকে আল্লাহর প্রতি ভরসা করার আদেশ দিয়েছিলেন, যেহেতু তারা ছিলেন হযরত মূসা (আঃ)-এর খাঁটি অনুসারী, তাই তারা বলেছেন, আমরা এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি ভরসা করেছি। এটি ছিল তাদের ঐকান্তিক ঈমান বা এখলাসের প্রকাশ। এরপর তারা আল্লাহ্ পাকের দরবারে এভাবে ফরিয়াদ করেছেনঃ

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ.

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে জালেমদের জুলুমের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করোনা। আমাদের প্রতি জালেমদেরকে শক্তি প্রয়োগের সুযোগ দিওনা।

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.

হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার বিশেষ রহমতে, দয়ায় আমাদেরকে কাফের সম্প্রদায়ের জুলুম অত্যাচার থেকে, তাদের ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্ত থেকে নাজাত দিও।

তফসীরকারগণ বলেছেন, যেহেতু দোয়ার উল্লেখের পূর্বে তাওয়াক্কুলের নির্দেশ রয়েছে, এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করার পূর্বে তাঁর প্রতি ভরসা করা অবশ্য কর্তব্য যাতে করে দোয়া কবুল হয়।

কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একথাও বলেছেন, ইসরাঈলী মোমেনগণ আল্লাহ্ পাকের প্রতি তাদের ভরসার কথা প্রকাশ করে এভাবে মোনাজাত করেছেনঃ হে আল্লাহ্! এই জালেমরা যেন আমাদের প্রতি জুলুম করতে না পারে তার তওফিক দিও এবং তোমার বিশেষ দয়ায় তাদের ক্ষমতার আওতা থেকে আমাদেরকে নিষ্কৃতি দিও।

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا
بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۸۷﴾ وَقَالَ
مُوْسٰى رَبَّنَآ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ
عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿۸۸﴾

তরজমা

(৮৭) আর আমি মূসাকে এবং তার ভাইকে আদেশ প্রদান করি, তোমাদের জাতির জন্যে শহরেই গৃহ তৈরী কর এবং তোমাদের গৃহগুলোকে এবাদত গৃহ কর, আর নামায কায়েম কর এবং মোমেনদেরকে সুসংবাদ দান কর।

(৮৮) মূসা বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি ফেরাউন ও তার দলের লোকদেরকে এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে ঐশ্বর্য এবং সম্পদ দান করেছ, যা দ্বারা হে আমাদের প্রতিপালক! তারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের ধন-সম্পদ নিশ্চিহ্ন করে দাও, তাদের অন্তর মোহর করে দাও, যে পর্যন্ত তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি না দেখে সে পর্যন্ত যেন ঈমান আনয়ন করতে না পারে।

তফসীরুল কোরআন

আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ) এবং তাঁর ভাই হারুন (আঃ)-কে এই নির্দেশ দান করলেন, তোমাদের জাতির জন্যে তোমরা শহরেই গৃহ নির্মাণ কর এবং কোন কোন ঘরকে নামাযের জন্যে নিদৃষ্ট কর। আল্লামা বগভী লিখেছেন, অধিকাংশ তফসীরকারদের বর্ণনা হল, বনী ইসরাঈলরা ইতিপূর্বে গির্জায় এবাদত করতো এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর আবির্ভাবের পর ফেরাউনের আদেশক্রমে তাদের সমস্ত এবাদতখানাগুলো ধ্বংস করা হয়। এমন অবস্থায় আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-এর মাধ্যমে বনী ইসরাঈলকে এই আদেশ দেন যে, তোমাদের গৃহগুলোকেই মসজিদ তথা উপাসনালয়ে রূপান্তরিত কর বা তন্মধ্যে কোন কোন গৃহকে মসজিদ হিসাবে ব্যবহার কর তথা নামাযের জন্যে নিদৃষ্ট করে লও। ইব্রাহীম নখয়ী (রহঃ) এ ব্যাখ্যাই করেছেন। একরামা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-ও এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

মুজাহেদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, হযরত মূসা (আঃ) এবং তাঁর সাথীরা ফেরাউনের নির্যাতনের কারণে ভয় করতেন যে, যদি তারা নামাযের জন্যে মসজিদে গমন করেন তবে ফেরাউনের লোকেরা তাদের প্রতি অত্যাচার করবে। তাই আদেশ হয়েছে যে তোমরা গৃহে নামায আদায় কর এবং গোপনে নামায আদায় কর।

وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً.

অর্থাৎ তোমাদের গৃহগুলোকে নামাযের জন্যে কেবলারোখ কর। এবনে জোরায়েয হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর কেবলা ছিল কা'বা শরীফ।[১]

আলোচ্য আয়াতের তফসীরে কোন কোন তফসীরকার একথাও লিখেছেন, যেহেতু ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায়ের উপর আযাব অতি আসন্ন ছিল তাই আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে এ আদেশ দিয়েছেন, যে জাতি সম্পর্কে আল্লাহ পাকের আযাবের সিদ্ধান্ত

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৩৫

হয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে সহাবস্থান তোমাদের জন্যে উচিত হবে না। তাই বনী ইসরাঈলকে নিয়ে তুমি আলাদা বসতি স্থাপন কর। সেখানেই কোন কোন ঘরকে নামাযের জন্যে নিদৃষ্ট করে লও, যাতে করে নামাযের ব্যাপারে কোন প্রকার অসুবিধা না হয়।[১]

কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য আয়াতের এ অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ) এবং তাঁর ভাই হারুন (আঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা বনী ইসরাঈলের জন্যে শহরেই গৃহ নির্মাণ কর, যা বাসগৃহ হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং এবাদতের স্থান হিসেবেও নিদৃষ্ট থাকবে। যাতে করে তোমাদেরকে শহরের বাইরে যেতে না হয় এবং দুশমনদের নিকট তোমাদের খবর না পৌঁছে।[২]

অথবা আলোচ্য আয়াতের অর্থ হল তোমরা নিজেদের গৃহে অবস্থান কর, দুশমনের নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষা মূলক ব্যবস্থা হিসেবে গৃহ থেকে বের হয়োনা। আল্লাহ্ পাক তোমাদের রক্ষাকর্তা এবং নেগাহবান। অথবা এর অর্থ হল, হে মূসা এবং হারুন! তোমরা শহরেই নতুন বাড়ী-ঘর নির্মাণ কর এবং বাড়ীগুলো যেন কেবলারোখ হয় যাতে করে বাড়ীগুলোকে আবাসস্থল এবং এবাদতের স্থল হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এভাবে ফেরাউনের জুলুম অত্যাচারের ভয়ের কারণে মসজিদের উপস্থিতি মাফ করা হয়েছে এবং নিজেদের বাড়ী-ঘরে গোপনে নামায আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেভাবে ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় সাহাবায়ে কেরামকে গোপনে নামায আদায় করতে হত।

বিপদ-মুক্তির জন্যে নামায

যেহেতু ফেরাউনের লোকেরা মসজিদে নামায আদায়ে বনী ইসরাঈলকে বাধা দিত তাই তাদেরকে গৃহে নামাযের অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং যখন বনী ইসরাঈলের উপর ফেরাউনের লোকেরা চরম নির্যাতন-উৎপীড়ন শুরু করে তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এই আদেশ হয় যে, তোমরা অধিক পরিমাণে নামায আদায় কর, যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا

"আর মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা (এই বিপদ মুহূর্তে) আল্লাহ পাকের সাহায্য কামনা কর এবং সবর কর"। আরো এরশাদ হয়েছেঃ

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

"হে মোমেনগণ! তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর সবর এবং নামাযের মাধ্যমে"।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন কোন প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হতেন তখন তিনি নামাযে রত হতেন। (আবু দাউদ শরীফ)

---

[১]। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-২৮২

[২]। তফসীরুর রহমান কৃত মোল্লা মাখদুম মোহয়মী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৩৪

বস্তুতঃ অধিক নামাযের মাধ্যমে বালা-মসিবত দূরীভূত হয় এজন্যে পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ.

আর তোমরা নামায কায়েম কর (কেননা নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ হয়। আর যে আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভে ধন্য হয় তার কোন বিপদ থাকে না। আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকেই তার হেফাজত করা হয়)!

হযরত শাহ আবদুল কাদের (রঃ) এ আয়াতের আরো একটি ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। ফেরাউনের ধ্বংসের সময় যখন ঘনিয়ে আসে তখন আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর ভাই হারুন (আঃ)-এর প্রতি এই আদেশ হয় যে, তোমরা ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায় থেকে আলাদা অবস্থান গ্রহণ কর। নিজেদের বসতিতে ফেরাউনের লোকদেরকে স্থান দিওনা যাতে করে যখন ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের উপর আযাব আসবে তখন তোমরা আত্মরক্ষা করতে পার। আর নিজেদের বাড়ী-ঘরগুলোকে কেবলারোখ করে তৈরী কর যাতে করে তোমাদের বাড়ী-ঘরে কেবলার নূর এবং বরকত পৌঁছতে থাকে। আর তোমাদের বাসস্থান সমূহে অধিক পরিমাণে নামায আদায় করতে থাক। নামাযের বরকতে আল্লাহ্ পাক বালা-মসিবত দূরীভূত করেন। অধিকাংশ তফসীরকার আলোচ্য আয়াতের (وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً) এ তফসীরই করেছেন।

অর্থাৎ তোমরা নিজেদের ঘর সমূহকে কেবলারোখ বানাও। আর হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ), সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ), কাতাদা (রঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ) قِبْلَةً অর্থ مُتَقَابِلَةً করেছেন।

অর্থাৎ মুসলমানদের বাড়ী-ঘর একটি আরেকটির মুখোমুখি হবে। একজন মুসলমানের বাড়ীর সম্মুখে আরেকজন মুসলমানের বাড়ী থাকবে। কোন কাফের মুশরেকের বাড়ী থাকবে না যেন কুফর ও শেরকের দুর্গন্ধ এসে ঈমানী পরিবেশকে বিনষ্ট না করে। কেননা আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

(মুশরেকরা অপবিত্র) .اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

হে মূসা! মোমেনদেরকে সুসংবাদ দাও যে, আল্লাহ্ পাক তোমাদের দুশমনকে ধ্বংস করবেন। আর তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং আখেরাতে তিনি তোমাদেরকে জান্নাত দান করবেন। আয়াতের শুরুতে সম্বোধন করা হয়েছে হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারুন (আঃ)-কে। এরপর সম্বোধন করা হয়েছে তাঁদের দু'জনসহ সমগ্র জাতিকে, এরপর নামাযের তাগিদ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের সর্বশেষ বাক্যে শুধু হযরত মূসা (আঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা তাঁর প্রতিই তৌরাত নাযিল হয়েছে এবং জাতিকে সুসংবাদ দেয়ার কর্তব্য তাঁর প্রতিই অর্পিত হয়েছে।[১]

---

[১]। তাফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৩৬

وَقَالَ مُوسٰى رَبَّنَآ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً .

আর মূসা বললেন, "হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ফেরাউন এবং তার দলের লোকদেরকে অনেক ঐশ্বর্য ও সম্পদ দান করেছ"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে زِيْنَةً (জিনাত) শব্দটির ব্যাখ্যা হলো সৌন্দর্যের উপকরণ, মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছদ, অলংকার, ফার্নিচার, যান-বাহন, চাকর-বাকর এক কথায় সবকিছু। হযরত মূসা (আঃ) এভাবে দোয়া করেছেনঃ হে আল্লাহ! তুমি ফেরাউন ও তার দলবলকে ভোগ-বিলাসের অনেক উপকরণ এবং অনেক অর্থ সম্পদ দান করেছ। ফলে তারা আরো পথভ্রষ্ট হয়েছে। শক্তি, সম্পদ, সমৃদ্ধি, ক্ষমতা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ করার কারণে তারা হয়েছে দিশেহারা। এসবই তাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, আয়াতের অর্থ হলো হে আল্লাহ! তুমি ফেরাউন ও তার দলের লোকদেরকে বিশাল ঐশ্বর্য দান করে তাদেরকে গাফলতের আবর্তে নিপতিত রেখেছ। ফলে তারা পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে। তোমার কুদরতের খেলা বুঝবার ক্ষমতা কার রয়েছে? তোমার প্রতিটি কাজ হেকমত পূর্ণ, তাৎপর্যবহ।[১]

হযরত মূসা (আঃ) কখন বদদোয়া করেছেন

কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের হেদায়েত সম্পর্কে হযরত মূসা (আঃ) যখন নিরাশ হলেন, ওহীর মাধ্যমে অথবা নূরে নবুওয়্যতের দ্বারা তিনি অবগত হলেন যে, তাদের কল্যাণের পথ রুদ্ধ, তখন তিনি বদদোয়া করলেন এই বলে–

رَبَّنَآ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ

হে আমাদের পরওয়ারদেগার! তুমি ফেরাউন ও তার দলের লোকদেরকে অগাধ অর্থ-সম্পদ এবং বিশাল ঐশ্বর্য দান করেছ যেন তারা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কিন্তু তারা সম্পদের মালিক হয়ে তোমার শোকর গুজারী তো দূরের কথা, বরং তারা তোমার অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েছে, অতএব, তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দাও। কেননা তারা নেয়ামতের যোগ্য নয়, তাই

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ .

হে পরওয়ারদেগার! তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দাও যাতে করে অহংকারের উপকরণ শেষ হয়ে যায়।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৩৬

২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৯৯

কাতাদা (রঃ) বলেছেন, হযরত মূসা (আঃ)-এর এ বদদোয়ার কারণে ফেরাউন ও তার দলের ক্ষেত-খামার, ধন-সম্পদ, ফল-ফলারী সবই পাথরে পরিণত হয়। বিস্ময়কর বিষয় এই যে, আকৃতিতে ছিল ফল এবং অন্যান্য বস্তু, কিন্তু প্রকৃতিতে সবই ছিল পাথর।

হযরত ওমর এবনে আবদুল আজিজ (রঃ) তাঁর খেলাফত কালে একটি থলে আনালেন। ঐ থলের মধ্যে ফেরাউনের যুগের কিছু জিনিসপত্র ছিল। যেমন ডিম ছিল ভাঙ্গা, আখরোট বের করলেন তাও ছিল ফাটা। আর সবই ছিল পাথরের।[১]

وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ

"তাদের অন্তরকে পাষাণ করে দাও যেন কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেখা ব্যতীত তারা ঈমান আনতে না পারে"।

তফসীরকারগণ লিখেছেন যে, সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায়কে হেদায়েত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তারা হেদায়েত গ্রহণ করাতো দূরের কথা, তাদের দৌরাত্ম, অহমিকা, জুলুম অত্যাচার, কুফরী ও নাফরমানী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতেই থাকে। হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউন ও তার দলের হেদায়েতের ব্যাপারে নিরাশ হওয়ার পর এ বদদোয়া করেন। বদদোয়ার কয়েকটি কথা হলো এই–

১. হে আল্লাহ! তাদের অর্থ-সম্পদ ধ্বংস করে দাও কেননা, অর্থ-সম্পদের কারণেই তারা অহংকারী হয়েছে।

২. হে আল্লাহ! তাদের অন্তরকে পাষাণ করে দাও যাতে করে তাদের অপকর্মের শোচনীয় পরিণাম, কঠিন শাস্তি দেখা পর্যন্ত তারা ঈমান আনতে না পারে।

হযরত মূসা (আঃ) কেন বদদোয়া করেছেন?

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউন ও তার দলবলের জন্যে বদদোয়া কেন করেছেন?

তফসীরকারগণ এর জবাব দিয়েছেন, ১. যেহেতু হযরত মূসা (আঃ) তাদের হেদায়েতের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করলেও তারা হেদায়েত গ্রহণ করেনি; তাদের হেদায়েতের ব্যাপারে নিরাশ হয়েই তিনি ফেরাউনের বিরুদ্ধে বদদোয়া করেছেন।

তফসীরকারগণ একথাও লিখেছেন, যখন হযরত মূসা (আঃ) উপলব্ধি করলেন যে হেদায়েত এদের তকদীরেই নেই, এরা পৃথিবীতে থাকলে আল্লাহ পাকের নাফরমানীই বৃদ্ধি পেতে থাকবে। অতএব, তাদের ধ্বংস হওয়াই উচিত। তাদের ধ্বংসের জন্যে আকাঙ্খা করার দৃষ্টান্ত হল এমন, যেমন বিষাক্ত সর্পের ধ্বংস হওয়ার আকাঙ্খা করা কেননা, তাদেরকে সুপথে আনার সর্বশেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছিল।[২]

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৩৭
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১১, পৃষ্ঠা-৭৬
[২]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৫২

২. অথবা হয়তো হযরত মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাকের তরফ থেকেই বদদোয়া করার আদেশ দেয়া হয়, তিনি সে আদেশ পালনার্থেই বদদোয়া করেছেন।[১]

৩. ফেরাউনের বিরুদ্ধে হযরত মূসার (আঃ) বদদোয়ার দৃষ্টান্ত হল এমন, যেমন আমরা শয়তানকে লা'নত দিয়ে বলে থাকি, "তার উপরে আল্লাহ্র লা'নত হোক"। অথবা কোন কাফের সম্পর্কে আমরা বলে থাকি "আল্লাহ পাক তাকে রহমত থেকে মাহরুম করুন"। অথচ একথা সর্বজনবিদিত যে, শয়তানের অভিশপ্ত হওয়া বা কাফেরের আল্লাহর রহমত থেকে মাহরুম হওয়া আমাদের দোয়ার পরিণতিতে নয়; বরং আল্লাহ পাকের ইচ্ছাতেই হয় এবং এর সিদ্ধান্ত বহু পূর্বেই হয়েছে। ঠিক এভাবে, হযরত মূসা (আঃ)-এর বদদোয়ার কারণেই যে জালেম ফেরাউন এবং তার দলবল ধ্বংস হয়েছে তা নয়; বরং তাদের কুকীর্তির কারণেই তারা সর্বস্বান্ত হয়েছে। আর তাদের ব্যাপারে এ সিদ্ধান্তও বহু পূর্বে হয়েছে।[২]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এ বদদোয়া করেছেন অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে (কেননা, তিনি তাদের হেদায়েতের জন্যে প্রাণপন চেষ্টা করেছেন। অত্যন্ত বিস্ময়কর, অলৌকিক মোজেযা প্রদর্শন করেছেন, কিন্তু তারপরও তারা হেদায়েত গ্রহণ করেনি)।

যখন হযরত মূসা (আঃ)-এর অন্তরে এই একীন বদ্ধমূল হয়েছে যে, তারা কোনদিন হেদায়েত গ্রহণ করবে না এবং তাদের মধ্যে কল্যাণকর কোন চরিত্র অবশিষ্ট রয়নি এবং হেদায়েত গ্রহণের যোগ্যতাই তাদের মধ্যে নেই তখন তিনি এ বদদোয়া করেছেন। এ ঘটনার দৃষ্টান্ত দেখা যায় হযরত নূহ (আঃ)-এর জীবনেও। হযরত নূহ (আঃ) প্রায় হাজার বছর ধরে তাঁর সম্প্রদায়কে হেদায়েতের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তারা হেদায়েত গ্রহণ করেনি। তখন তিনি বদদোয়া করে বলেছিলেন, পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا.

হে পরওয়ারদেগার! এ কাফেরদের কাউকে পৃথিবীতে জীবিত রেখোনা। যদি তাদেরকে জীবিত রাখ তবে তারা তোমার অন্য বন্দাদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করলে তারাও কাফেরই হবে।

যাহোক, অবশেষে আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-এর দোয়া কবুল করেছেন। পরবর্তী আয়াতে রয়েছে তার ঘোষণা।[৩]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৩৭
২। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-১৮২
৩। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১১, পৃষ্ঠা-৭৬

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَاءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ
وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ
إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَاءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾ آلْآنَ
وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٩١﴾ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ
بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا
لَغَافِلُونَ ﴿٩٢﴾

তরজমা

(৮৯) তিনি বললেন, তোমাদের দু'জনের দোয়া কবুল হল। অতএব তোমরা সুদৃঢ় থাক আর অজ্ঞ লোকদের অনুসরণ করোনা।

(৯০) আর আমি বনী ইসরাঈলকে সাগর পার করে দিলাম। এরপর ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী বিদ্বেষ ও দৌরাত্মের কারণে ন্যায়ের সীমালঙ্ঘন করতঃ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। অবশেষে যখন নিমজ্জিত হতে থাকে তখন সে বলে বনী ইসরাঈলরা যাঁর প্রতি ঈমান এনেছে তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, আমি তাঁর প্রতি বিশ্বাস করলাম এবং আমিও মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।

(৯১) এখন! অথচ ইতিপূর্বে তুমি অবাধ্য ছিলে এবং অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

(৯২) আর আমি তোমার দেহরক্ষা করবো, যেন পরবর্তী লোকদের জন্যে তুমি নিদর্শন হয়ে থাক। আর নিশ্চয় মানুষের মধ্যে অনেক লোকই আমার নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে গাফেল।

তফসীরুল কোরআন

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا.

আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ হে মূসা ও হারুন! তোমাদের উভয়ের দোয়া কবুল করা হয়েছে। যদিও দোয়া শুধু হযরত মূসা (আঃ)-ই করেছিলেন। কিন্তু হযরত হারুন (আঃ) দোয়ার পর আমীন বলেছিলেন। এজন্যে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)

বলেছেন, আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে উভয়ের দোয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। কেননা, কোন ব্যক্তি মোনাজাত করলে যদি কেউ আমীন বলে অর্থাৎ "কবুল কর" বলে তবে সেও মোনাজাতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। অথবা হতে পারে উভয়েই এ দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ পাক শুধু হযরত মূসা (আঃ)-এর নাম এ পর্যায়ে উল্লেখ করেছেন।[১]

فَاسْتَقِيْمَا

অতএব, "তোমরা উভয়ে তোমাদের দায়িত্ব পালনে অবিচলিত থাক"। নবুওয়্যত, রেসালত, দাওয়াত ও তবলীগের কাজ অব্যাহত রাখ। নিশ্চিত থাক তোমাদের দোয়া আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়েছে। তবে এর বাস্তবায়ন হবে তার জন্যে নিদৃষ্ট সময়ে, যথাসময়ে তোমরা এর ফল দেখতে পাবে।

وَلَا تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ.

তোমরা নিশ্চিত থাক যে তোমাদের দোয়া কবুল হয়েছে। তোমাদের দুশমনদের উপর আল্লাহর আযাব নাযিল হবে আর তা সঠিক সময়েই হবে। অতএব, তোমরা দোয়ার ফল প্রকাশে বিলম্ব হলে অজ্ঞ লোকদের মত অস্থির হয়োনা। কোন ব্যাপারে অস্থির ও ব্যাকুল হওয়া অজ্ঞ লোকেরই কাজ। হে মূসা ও হারুন, তোমরা অজ্ঞ লোকদের মত আযাব নাযিলকে ত্বরান্বিত করার জন্যে অস্থির হয়োনা। আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা রাখ। আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত মূসা (আঃ)-এর এ দোয়া চল্লিশ বছর পর কবুল হয়েছে।[২] এবনে যোরায়েয লিখেছেন, এ দোয়ার পরও ফেরাউন ৪০ বছর জীবিত ছিল।[৩]

وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ.

যখন হযরত মূসা (আঃ)-এর দোয়া কবুল হওয়ার সময় ঘনিয়ে এল, আল্লাহ পাক ফেরাউনকে ধ্বংস করার এবং তার জুলুম থেকে বনী ইসরাঈলকে নাজাত দেয়ার ইচ্ছা করলেন তখন মূসা (আঃ)-কে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিশর থেকে বের হয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন। হযরত মূসা (আঃ) ছয় লক্ষ বনী ইসরাঈলকে নিয়ে রাতের শেষ প্রহরে মিশর থেকে বের হলেন। এ খবর পেয়ে ফেরাউন তার লক্ষ লক্ষ সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো।

হযরত মূসা (আঃ)-এর নেতৃত্বে বনী ইসরাঈলরা লোহিত সাগরের তীরে উপস্থিত হলো। এদিকে পেছন পেছন ফেরাউনের সৈন্য বাহিনীও এসে পড়লো প্রায়। সম্মুখে সমুদ্রের ঢেউ, পেছনে শত্রু বাহিনী। মূসা (আঃ)-এর সঙ্গীরা প্রমাদ গুণলো। ঐ সংকটময় মুহূর্তে হযরত মূসা (আঃ) বললেন, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

---

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১৫২
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৩৮

[২]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৩৮

[৩]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-১৫৩

إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ.

"(মূসা বললেন) কখনও নয়; আমার প্রতিপালক যে আমার সঙ্গেই রয়েছেন, তিনি অতি সত্বর আমাকে পথ দেখাবেন"। অবশেষে তাই হলো। আল্লাহ পাকের নির্দেশ-ক্রমে সমুদ্রের পানি বিদীর্ণ হলো। বনী ইসরাঈলের বারটি দলের জন্যে সমুদ্র মাঝে বিরাট পথ তৈরী হলো। পানি স্থবির হয়ে পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে গেল। এভাবে আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমতে বনী ইসরাঈল জাতি নিরাপদে সমুদ্র পার হয়ে গেল। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَجٰوَزْنَا بِبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ الْبَحْرَ.

"আর আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করে দিলাম"।

فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهٗ.

ফেরাউনের সৈন্যবাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো যেন তাদেরকে পাকড়াও করে শাস্তি দিতে পারে। এটি ছিল জালেম ফেরাউনের দৌরাত্ম। যাহোক, ফেরাউন সমুদ্র তীরে উপস্থিত হয়ে দেখে সমুদ্রের মাঝে পথ তৈরী হয়ে আছে। তাই তারাও বনী ইসরাঈলের অনুসরণে সমুদ্র পথে অগ্রসর হলো। যখন তার সমস্ত বাহিনী সমুদ্রের মাঝে প্রবেশ করলো তখন আল্লাহ পাকের আদেশক্রমে দু'ধারের দন্ডায়মান পানির প্রাচীর হঠাৎ ভেঙে পড়লো। ফেরাউন এবং তার দলবল লোহিত সাগরের অথৈ পানিতে ডুবতে লাগলো। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

حَتّٰىٓ إِذَآ أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ أَنَّهٗ.

ডুবন্ত অবস্থায় ফেরাউন বললো আমি বিশ্বাস করি বনী ইসরাঈল যে মা'বুদকে মানে সে মা'বুদই সত্য, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, আমি তাঁর প্রতি বিশ্বাস করি। আমিও মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত জীব্রাইল (আঃ) তখন সঙ্গে সঙ্গে কাঁদা মাটি দিয়ে তার মুখ পুরে দিলেন। আর ঐ অবস্থায় তার মৃত্যু হলো।

আল্লাহ পাকের তরফ থেকে জবাব আসলো–

آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ.

এখন তুমি বিশ্বাস করছো? অথচ সারা জীবন তুমি ছিলে অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ নিজেও পথভ্রষ্ট ছিলে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করেছ।

আলোচ্য আয়াতের বর্ণনা-ধারা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, ফেরাউন তখন ঈমানের কথা প্রকাশ করে যখন সে উপলব্ধি করে যে তার সলিল সমাধি ঘটতে যাচ্ছে। তখন আলমে বরজখের কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে। আর এমন সময়ের ঈমান আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য হয়না।

আল্লামা বগভী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) সূত্রে লিখেছেন, আল্লাহ পাকের হুকুমে যখন ফেরাউন নিমজ্জিত হচ্ছিল তখন সে এক আল্লাহর প্রতি ঈমানের কথা স্বীকার করে, কিন্তু তখনকার ঈমান অসময়ের কান্না ব্যতীত আর কিছুই ছিলনা। হযরত জীব্রাইল (আঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেছিলেনঃ হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! যদি আপনি সে দৃশ্য দেখতেন যখন আমি ফেরাউনের মুখে সমুদ্রের কাঁদা মাটি ঢুকিয়ে দিচ্ছিলাম।[১] আমার ভয় হচ্ছিল তার প্রতি আল্লাহ পাকের রহমত না হয়ে যায়। (তিরমিজী)

আল্লাহ্ পাকের কুদরত

আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরতের নমুনা বুঝবার ক্ষমতা কারোই নেই। হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউনের সম্পর্কে দোয়া করেছিলেনঃ হে আল্লাহ! তোমার কঠিন আযাব না দেখে এই জালেম যেন ঈমানের কথা না বলে এবং বাস্তবে তাই হয়েছে। ফেরাউন যখন ডুবন্ত প্রায়, যখন সে আল্লাহ পাকের আযাবকে দেখে ফেলেছে তখনই ঈমানের কথা বলেছে, তার আগে নয়। এভাবে হযরত মূসা (আঃ)-এর দোয়া অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

একটি ঘটনা

বর্ণিত আছে যে, হযরত জীব্রাইল (আঃ) একবার মানবরূপ ধারণ করে ফেরাউনের নিকট একটি বিষয় লিখিতভাবে জানতে চান। বিষয়টি ছিল এই, বাদশাহর কোন গোলাম যদি শাহী নেয়ামত দ্বারা লালিত-পালিত হয়, পরে উক্ত গোলাম বাদশাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করে বিদ্রোহী হয় এমনকি, উক্ত গোলাম নিজেই বাদশাহ হওয়ার দাবী করে বসে, এমন গোলাম সম্পর্কে শাহী আদেশ কি?

ফেরাউন নিজ হাতে এ প্রশ্নের জবাব লিখেছে যে, উক্ত গোলামের শাস্তি হল তাকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়া। এরপর ফেরাউন নিজের দস্তখত দিয়ে লিখেছে, এটি সেই জবাব যা আবুল আব্বাস ওয়ালিদ এবনে মাসআব তথা ফেরাউন লিখেছে।

যখন ফেরাউন নিমজ্জিত হতে লাগল এবং ঈমানের কথা প্রকাশ করল, তখন হযরত জীব্রাঈল (আঃ) তার ঐ লেখাটি দেখিয়ে দিলেন এবং বললেন, তুমি বিদ্রোহী গোলামের যে শাস্তির কথা লিখেছিলে, আজ তোমার ব্যাপারে তাই বাস্তবায়িত হচ্ছে।[২]

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ط

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৩৯
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১১, পৃষ্ঠা-৭৮
এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৯৯-৩০৩
[২]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লাম ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫০৩

"অতএব, আজ পরবর্তী কালের লোকদের দৃষ্টান্ত স্বরূপ তোমার দেহ আমি রক্ষা করছি"। ফেরাউনের ঈমানের কথা ছিল অসময়ে, তাই তা গ্রহণযোগ্য হয়নি; তবে বনী ইসরাঈল তাদের চিরশত্রুর এ দুরবস্থা দেখে সুখী হবে এবং আল্লাহর নবীর মোজেযা দেখে, আল্লাহ পাকের কুদরতের মহিমা লক্ষ্য করে ঈমানকে মজবুত করবে এবং পরবর্তীকালের লোকেরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে, আল্লাহর নাফরমানীর ব্যাপারে সতর্ক হবে, এজন্যে আল্লাহ পাক ফেরাউনের লাশকে রক্ষা করেন এবং ঐ লাশটি আজও মিশরের রাজধানী কায়রোর যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। প্রায় ছয় হাজার বছর পূর্বে মৃত ফেরাউনের লাশ আজও অবিকৃত রয়েছে, পবিত্র কোরআনের ঘোষণার সত্যতার এটি একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।[১]

আল্লামা বগভী লিখেছেন, যখন হযরত মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনের ধ্বংস হওয়ার কথা জানালেন, তখন তারা একথাটি বিশ্বাস করতে পারেনি; তাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও ছিল যারা এ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করত যে, ফেরাউনের মত লোকের মৃত্যু হবেনা। কিন্তু আল্লাহ পাক সকল ভুল এবং ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত করেছিলেন যখন ফেরাউনের লাশটি আল্লাহ পাকের হুকুমে সমুদ্র উপকূলে ফেলে দেয়া হল এবং বনী ইসরাঈলরা দেখে তাকে চিনতে পারল। তখন সত্য উদ্ভাসিত হলো। আলোচ্য আয়াতে آيَةً শব্দটির অর্থ হল শিক্ষণীয় বিষয় বা এমন নিদর্শন যার দ্বারা আল্লাহ পাকের তৌহিদের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আলোচ্য আয়াতের خَلْفَكَ শব্দটির অর্থ হল অনাগত ভবিষ্যতের লোকেরা যখন এ ঘটনা শ্রবণ করবে এবং ফেরাউনের লাশ দেখবে, তখন শিক্ষা গ্রহণ করবে। যাদের অন্তরে ফেরাউনের অসাধারণ প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিল যে, কখনো ফেরাউনের মৃত্যু হবেনা, তাদের জন্যে এ ঘটনা হয়েছিল শিক্ষণীয়।

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ.

আর অনেক লোকই আমার কুদরতের নিদর্শন সমূহ থেকে গাফেল তথা আল্লাহর নাফরমানীর ভয়াবহ শাস্তি দেখেও তারা শিক্ষা গ্রহণ করেনা।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনা এবং ফেরাউনের শাস্তির বিবরণে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মতের জন্যে রয়েছে সতর্কবাণী কেননা, অতীতকালের ঘটনা পবিত্র কোরআনে শুধু এজন্যেই বর্ণিত হয়েছে যেন তা দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করা হয়, যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ.

"নিশ্চয় তাদের ঘটনাবলীতে রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্যে উপদেশ"।[২]

---

[১]। এই লেখক স্বচক্ষে ফেরাউনের লাশটি দেখেছেন।
[২]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-১৫৭

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَّرَزَقْنٰهُم مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ فَمَا
اخْتَلَفُوا حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٣﴾ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ
فَسْـَٔلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتٰبَ مِن قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِن
رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِـَٔايٰتِ اللّٰهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿٩٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ
كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتّٰى يَرَوُا
الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٩٧﴾

তরজমা

(৯৩) নিশ্চয় আমি বনী ইসরাঈলকে উত্তম আবাস-ভূমিতে বসবাস করার সুযোগ দান করি এবং আমি তাদেরকে উত্তম রিয্ক দান করি। এরপর তাদের নিকট যখন জ্ঞান আসলো তখন তারা বিভেদ সৃষ্টি করলো। (হে রসূল!) নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক তাদের মধ্যে কেয়ামতের দিন ফয়সালা করে দেবেন।

(৯৪) আমি আপনার প্রতি যা নাযিল করেছি তাতে যদি সন্দিহান হন তবে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন যারা আপনার পূর্বে কিতাব পাঠ করেছে। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে আপনার নিকট সত্য বিষয়ই এসেছে। অতএব, কখনও সন্দেহকারী হবেন না।

(৯৫) এবং আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে যারা মিথ্যা জ্ঞান করেছে তাদের দলভুক্ত হবেনা, অন্যথায় সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে।

(৯৬) নিশ্চয় যাদের ব্যাপারে আপনার প্রতিপালকের সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে রয়েছে, তারা কখনই ঈমান আনবেনা।

(৯৭) যে পর্যন্ত তারা মর্মান্তিক শাস্তি না দেখবে তাদের নিকট যাবতীয় নিদর্শন আসলেও (তার ঈমান আনবেনা)।

তফসীরুল কোরআন

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈলকে সেই নেয়ামত সমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যা তিনি তাদেরকে দান করেছেন। বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ পাকের নেয়ামতের অন্ত নেই। আল্লাহ পাক জালেম ফেরাউনকে ধ্বংস করে তার জুলুম থেকে বনী

ইসরাঈলকে নাজাত দিয়েছেন এবং তাদেরকে মিশরের ক্ষমতা দান করেছেন। এরপর আমালেকা জাতিকে ধ্বংস করে সিরিয়াকেও বনী ইসরাঈলের কর্তৃত্বাধীন করে দিয়েছেন। মিশর এবং সিরিয়া উভয় দেশই সুজলা সুফলা এবং খাদ্য দ্রব্যে সমৃদ্ধ ছিল এবং বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ পাক উত্তম রিয্‌ক দান করেছেন। উত্তম বাসস্থান দান করেছেন। তাদের অপমানকে সম্মানে পরিবর্তন করে দিয়েছেন এবং অভাব-অনটন দূরীভূত করে তাদেরকে সম্পদশালী করেছেন, যেন তারা একত্রিত হয়ে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করে এবং আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। কিন্তু তারা তখন পরস্পর কলহ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হল। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَّرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ

"আর আমি বনী ইসরাঈলকে উত্তম আবাস-স্থলে বসবাস করার সুযোগ দান করি"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে উত্তম স্থান বলতে মিশর অথবা জর্ডান এবং ফিলিস্তিনকে বোঝানো হয়েছে।

যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, উত্তম স্থান বলতে, মিশর এবং সিরিয়াকে বোঝানো হয়েছে।[১]

আর ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন, উত্তম আবাস-স্থল বলতে এখানে সিরিয়া এবং বায়তুল মোকাদ্দাসকে বোঝনো হয়েছে।

وَّرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ.

"আর তাদেরকে আমি উত্তম রিয্‌ক দান করেছি"। অর্থাৎ সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য তাদেরকে দান করেছি। এ সমস্ত দানের কারণে বনী ইসরাঈলের কর্তব্য ছিল, তৌহিদ ও রেসালতে বিশ্বাসে সুদৃঢ় থাকা, আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা এবং আল্লাহর রসূলের অনুসারী হওয়া, ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহর বিধান কায়েম করা।

فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ.

কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা দলাদলি এবং ফেরকাবন্দীতে মেতে ওঠে, আর এ দলাদলি তখন করে যখন আসমানী কিতাবের মাধ্যমে তাদের নিকট এলম এসেছে, তারা জ্ঞান অর্জন করেছে। এরপরও তারা ফেরকাবন্দীতে মগ্ন হয়েছে।

যাঁরা নাজাত লাভে ধন্য হবেন

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ইহুদীরা ৭১টি ফেরকায় বিভক্ত হয়েছে আর নাসারাদের মধ্যে ৭২ ফেরকা হয়েছে এবং আমার উম্মতের মধ্যে ৭৩ ফেরকা হবে। তাদের মধ্যে শুধু একটি ফেরকাই নাজাত পাবে আর সবই দোযখী হবে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে জিজ্ঞাসা করা হয়, কোন্ ফেরকা নাজাত পাবে? তিনি এরশাদ করেনঃ

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৪০

ما انا عليه واصحابي.

"যে পথে আমি এবং আমার সাহাবায়ে কেরাম রয়েছে, যারা এ পথের অনুসারী হবে"।

অর্থাৎ শুধু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের অনুসারীগণই নাজাত পাবে। এজন্যে পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

"নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক কেয়ামতের দিন তাদের মতবিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে ফয়সালা করবেন"।[১]

তফসীরকারগণ বনী ইসরাঈলের ফেরকাবন্দী ও দলাদলির বহু দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। জালেম ফেরাউনের জুলুম থেকে নাজাত লাভের পর বনী ইসরাঈলের কর্তব্য ছিল, হযরত মূসা (আঃ)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা। কিন্তু তারা হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথেও বিতর্ক করতে দ্বিধাবোধ করেনি। তাদের এক ব্যক্তি নিহত হলে হযরত মূসা (আঃ) তাদেরকে গাভী জবেহ করতে বলেছিলেন (এ সম্পর্কে তাদের মতবিরোধের বিবরণ সূরা বাকারায় বিস্তারিতভাবে স্থান পেয়েছে)।

বনী ইসরাঈল ময়দানে তীহে

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ বনী ইসরাঈল সর্বদা হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট বায়তুল মোকাদ্দাসের কর্তৃত্ব লাভের জন্যে দাবী করত। কেননা, এটিই ছিল হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আবাস-স্থল। তখন আমালেকা জাতি বায়তুল মোকাদ্দাস নিয়ন্ত্রণ করছিল। বনী ইসরাঈলকে বলা হল তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে, কিন্তু তারা তাতে অস্বীকৃতি জানাল। আল্লাহ পাক তাদেরকে ঐ নাফরমানীর শাস্তি স্বরূপ ময়দানে তীহে দিশেহারা অবস্থায় রাখলেন। তারা সকালে তাদের যাবতীয় আসবাবপত্র নিয়ে রওয়ানা হত, সন্ধ্যার সময় দেখত, যেখান থেকে রওয়ানা হয়েছিল সেখানেই ফিরে এসেছে। এ অবস্থায় সুদীর্ঘ ৪০টি বছর অতিবাহিত হয়েছে। এরই মধ্যে হযরত মূসা (আঃ) এবং হারুন (আঃ)-এর ইন্তেকাল হয়। এরপর ইউশা এবনে নূন এর নেতৃত্বে বনী ইসরাঈল ময়দানে তীহ থেকে বের হল এবং আল্লাহ পাক তাদেরকে বায়তুল মোকাদ্দাসের বিজয় দান করলেন। অনেক দিন বায়তুল মোকাদ্দাস তাদের দখলে ছিল। কিন্তু পরে বখতে নসর নামক এক জালেম বাদশাহ বায়তুল মোকাদ্দস দখল করে। এর অনেক দিন পর পুনরায় বনী ইসরাঈল বয়তুল মোকাদ্দাসের নিয়ন্ত্রণ পায়। পরবর্তীতে বনী ইসরাঈলের হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-কে প্রেরণ করলেন। কিন্তু ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গে শত্রুতা করল এমনকি, তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল। আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-কে আসমানে তুলে নিলেন এবং তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১১, পৃষ্ঠা-৭৯

এর প্রায় তিনশ' বছর পর সম্রাট কনষ্টানটাইন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করল। এ লোকটি ছিল দার্শনিক প্রকৃতির। সে মুনাফেকী করেই এ নতুন ধর্ম গ্রহণ করল। পাদ্রীরা তার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশ করল। তার সন্তুষ্টির জন্যে পাদ্রীরা আসমানী গ্রন্থে অনেক পরিবর্তন করল। তাদের ধর্মের অনেক নিয়ম-কানুন বদলে দিল। তারা ক্রুশের পূজা, পূর্বদিকে মুখ করে নামায আদায় করা, গীর্জায় হযরত ঈসা (আঃ)-এর মূর্তি স্থাপন করা এবং পূজা করা, শুকরের গোশ্ত খাওয়া হালাল করা প্রভৃতি অন্যায়-অনাচারের মাধ্যমে খৃষ্টধর্মের প্রকৃত রূপ পরিবর্তন করে দিল। সম্রাটের আদেশক্রমে নতুন নতুন আইন জারী হত এবং তা তাদের শরীয়তের বিধানে পরিণত হত।

এভাবে তারা নিজেদের আসমানী কিতাবে রদবদল করার ধৃষ্টতা দেখায়। এমনকি, যখন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয়, তখনও তারা তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করে। অথচ তৌরাত ইঞ্জিলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলীর বিবরণ তারা দেখতে পেয়েছে।

এরপরও তারা তাঁর বিরোধিতা করতে দ্বিধাবোধ করেনি। এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ.

অর্থাৎ তাদের নিকট যখন সেই মহান ব্যক্তি আগমন করেছেন, যাঁর সম্পর্কে তারা পূর্বাহ্নে সবকিছু জানত, অর্থাৎ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের সু-সংবাদ তৌরাত ইঞ্জিলের মাধ্যমে তারা পেয়েছে, তাঁর আগমনের পূর্বে তারা তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করত এবং আরবের পৌত্তলিকদেরকে বলত, অদূর ভবিষ্যতে শেষ নবীর আবির্ভাব হলে আমরা হব তাঁর সাথী। কিন্তু এরপরও বনী ইসরাঈলরা তাঁর বিরোধিতা করল। হিংসা-প্রসূত এ বিরোধিতা এবং শত্রুতা তারা অব্যাহত রাখল। মদীনা শরীফের ইহুদী গোত্র বনু নজীর, বনু কোরায়জা এবং বনু কিনকা সর্বদা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে, অবশেষে তাদেরকে মদীনা শরীফের উপকণ্ঠ থেকে বহিষ্কার হতে হয়। বায়তুল মোকাদ্দাস তখনো বণী ইসরাঈলের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তবে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর আমলে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে বায়তুল মোকাদ্দাসের বিজয় দান করলেন।[১]

এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে বনী ইসরাঈলের কথা বলা হয়েছে কিন্তু কোন্ বনী ইসরাঈলকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? হযরত মূসা (আঃ)-এর জমানার বনী ইসরাঈল? নাকি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগের বনী ইসরাঈল? তফসীরকারদের মধ্যে এ সম্পর্কে যারা হযরত মূসা (আঃ)-এর জমানার কথা বলেন, তাঁদের বক্তব্য হল যেহেতু হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনা পূর্ব থেকে বর্ণিত হয়ে আসছে, তাই এর পরবর্তী আয়াতে–

---

[১]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১১, পৃষ্ঠা-৭৯
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৪০-৫৪১
তফসীরে কবীর খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-১৫৯

(وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِىٓ إِسْرَآءِيلَ).

সে যুগের বনী ইসরাঈলকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে এবং তাদের বাসস্থান ছিল সিরিয়া এবং মিশর। এ এলাকাটি শষ্য শ্যামলিমায়, ফল-ফলারীতে ছিল পরিপূর্ণ। আর ফেরাউনের নিপাত যাওয়ার পর আল্লাহ্ পাক বনী ইসরাঈলকেই মিশরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। মূসা (আঃ)-এর জাতি বনী ইসরাঈল এক ও অভিন্ন ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তাদের মধ্যে মতভেদ এবং দলাদলি হয়েছে।

তফসীরকারদের মধ্যে যারা এ মত পোষণ করেন যে, আলোচ্য আয়াতে বনী ইসরাঈল বলতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগের ইহুদীদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)। তিনি বলেন, এরা বনু নজীর, বনু কোরায়জা এবং বনু কিনকা গোত্র। এ ইহুদীরা মদীনা শরীফে এবং সিরিয়ায় বাস করত। আর এটি বাসস্থান হিসেবে উত্তম এবং খেজুর সহ অন্যান্য ফল-ফলারীও এ স্থান সমূহে বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন হত। তাই তারা যেমন উত্তম স্থানে বাস করত তেমনি উত্তম রিয্ক লাভ করত।

فَمَا اخْتَلَفُوا حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ.

"এলম আসার পর তারা মতভেদ করেছে"। একথার তাৎপর্য হল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার পর ইহুদীরা এ সম্পর্কে মতভেদ করেছে। অথচ এ ইহুদীরাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর শুভাগমনের সুসংবাদ দিত। তৌরাত ইঞ্জিলে তাঁর সম্পর্কে যে সুসংবাদ রয়েছে তার উদ্ধৃতি দিত। এমনকি, তৌরাত ইঞ্জিলে তাঁর যেসব গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণিত রয়েছে, তার বিবরণও ইহুদীরা পেশ করত। কিন্তু যখন তাঁর আবির্ভাব হলো এবং পবিত্র কোরআন নাযিল হলো তখন তারা তাঁর প্রতি হিংসা পোষণ করে শত্রু হলো।[১]

فَإِنْ كُنْتَ فِىْ شَكٍّ مِّمَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ.

অতএব, তোমার প্রতি যা নাযিল করেছি, তাতে যদি তোমার সন্দেহ থাকে তবে তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর যারা তোমার পূর্বে কিতাব পাঠ করত।

فَإِنْ كُنْتَ فِىْ شَكٍّ.

"যদি তুমি সন্দিহান হও," এ আয়াতে কাকে সম্বোধন করে একথাটি বলা হয়েছে? তফসীরকারগণ এ সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করেছেন। কোন কোন তফসীরকার এ মত পোষণ করেছেন, আলোচ্য আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে প্রত্যেকটি মানুষকে, এমন অবস্থায় অর্থ হবে–

---

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৫৮-৫৯

فان كنت ايها الانسان فى شك مما نزلنا.

হে মানুষ! আমি যা নাযিল করেছি সে সম্পর্কে তুমি যদি সন্দেহ পোষণ কর তবে যারা ইতিপূর্বে আসমানী গ্রন্থ পাঠ করেছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর। যারা আহলে কেতাব এবং আলেম তারা ইতিপূর্বে তৌরাত ইঞ্জিল পাঠ করেছে, পবিত্র কোরআন ও সর্বশেষ নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং যাহ্যাক (রহঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে আহলে কেতাব বলতে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা আহলে কিতাবদের মধ্যে ঈমানদার ছিলেন অর্থাৎ আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তারা সাক্ষ্য দেবেন যে, তৌরাত ইঞ্জিলে সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী উল্লেখিত হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে খাঁটি ঈমানদারদের একদল ছিল এবং ইসলামের চরম বিরোধিতাকারীও আরেক দল ছিল। আর তৃতীয় আরেকটি দল ছিল যারা খাঁটি মোমেনও ছিলনা এবং চরম শত্রুও ছিলনা। তবে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে তারা সন্দেহ পোষণ করতো। আলোচ্য আয়াতে তৃতীয় দলকেই সম্বোধন করা হয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার বলেন, আলোচ্য আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে। যদিও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে তবে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এভাবেঃ "মনে করুন, যদি আপনার সন্দেহ হয়"। একথার সমর্থন পাওয়া যায় এভাবে যে এবনে জরীর বর্ণনা করেছেন কাতাদা (রহঃ) বলেছেন, আমরা জানতে পেরেছি এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমার কোন সন্দেহ নেই আর আমি কাউকে জিজ্ঞাসাও করবো না"।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যদিও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে তবে উদ্দেশ্য হল অন্য লোক। এটি সব ভাষারই সর্বজন স্বীকৃত নিয়ম যে, বিশেষ কোন ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয় উদ্দেশ্য হয় অন্য লোক। পবিত্র কোরআনে এর দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ.

আলোচ্য আয়াতে নবীকে সম্বোধন করা হয়েছে। (হে নবী! আল্লাহকে ভয় কর) কিন্তু এই খেতাবের উদ্দেশ্য হল মোমেনগণ। কেননা, পরবর্তী বাক্যে সমস্ত মোমেনদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا.

---

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫০৬
তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৪৫

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত রয়েছেন"। আয়াতে বহু বচনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরো একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যায়ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ.

(হে নবী! যখন তোমরা স্ত্রীলোকদেরকে তালাক প্রদান কর) এ আয়াতেও সম্বোধন করা হয়েছে নবীকে আর আদেশ দেয়া হয়েছে মোমেনদেরকে। আরবী ভাষার ব্যাকরণবিদ "ফররা" বলেছেনঃ আল্লাহ পাক জানেন যে, তাঁর রসূলের কোন সন্দেহ নেই কিন্তু আরবদের ভাব প্রকাশের প্রথা মোতাবেক বর্ণনা-শৈলী অবলম্বন করা হয়েছে। যেমন কোন ব্যক্তি তার পুত্রকে বলে- "যদি তুমি আমার পুত্র হও তবে এ কাজ কর"। একথা সুস্পষ্ট যে পুত্রের বা পিতার এ পর্যায়ে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু কোন বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করার প্রয়োজনে এমন বর্ণনা ভঙ্গি গ্রহণ করা হয়।[১]

আর কোন কোন তফসীরকার আয়াত খানির ব্যাখ্যা এভাবে করেছেনঃ

قل يا محمد للكافر فان كنت فى شك.

হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনি কাফেরকে বলুন, যদি তুমি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ কোরআনে করীমের ব্যাপারে সন্দিহান হও তবে আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা ইতিপূর্বে আসমানী কিতাব পাঠ করতো তাদেরকে পবিত্র কোরআনের সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর।

لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ.

"(হে রসূল!) আপনার নিকট সত্য গ্রন্থ এসেছে, অতএব, সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না"।[২]

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, শেরক কুফর বা আল্লাহর নবীগণকে মিথ্যাজ্ঞান করার মূল উৎস হলো সন্দেহ।

এ সন্দেহ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে শেরক ও কুফরীতে রূপান্তরিত হয়। সেজন্যে আলোচ্য আয়াতে সন্দেহবাদ পরিহার করার নির্দেশ রয়েছে। যদি কোন বিষয়ে সন্দেহ হয় তবে অবিলম্বে অভিজ্ঞ লোকদেরকে তথা যারা কিতাব সম্পর্কে জ্ঞান রাখে তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, অজানাকে জানার চেষ্টা কর। তখন তারা বলবে সর্বশেষ নবী বর্ণিত সব বিষয় অক্ষরে অক্ষরে সত্য, তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ.

অতএব, তুমি কখনও সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা। আরো এরশাদ হয়েছেঃ

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৪৩

[২]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৫৪

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

আর তুমি সে সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা যারা আল্লাহ পাক পাকের আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, তাহলে তুমি চরম ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ আয়াতেও সম্বোধন করা হয়েছে প্রতিটি মানুষকে, যার ব্যাপারে সন্দিহান হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাকে লক্ষ্য করেই এ সতর্কবাণী।

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ.

"যাদের ব্যাপারে আপনার প্রতিপালকের স্থির সিদ্ধান্ত হয়ে আছে তারা ঈমান আনবে না"। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

অর্থাৎ "মানুষ এবং জ্বীনদের দ্বারা আমি দোযখ ভর্তি করবো"। আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয়ে আছে যে, তারা হবে দোযখের ইন্ধন, তারা কখনও ঈমান আনবে না।

আলোচ্য আয়াতের "কালেমাতু রাব্বিক" বাক্যটির অর্থ হলো আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্ত, যা তিনি সৃষ্টির প্রথম দিন গ্রহণ করেছেন।

মুসলিম এবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত হাদীস তিরমিযী ও আবু দাউদ শরীফে সংকলিত হয়েছে যে, হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট–

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ.

আয়াতের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ আমি নিজে শুনেছি যখন এ আয়াতের অর্থ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তাঁর পৃষ্ঠদেশে দক্ষিণ হস্ত বুলিয়ে দিয়ে আদম (আঃ)-এর কিছু বংশধরকে বের করে বললেনঃ আমি তাদেরকে জান্নাতের জন্যে সৃষ্টি করেছি। তারা জান্নাতীদের কাজ করবে। এরপর পুনরায় আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠ দেশে হাত বুলিয়ে আরো কিছু বংশধর সৃষ্টি করে বললেনঃ আমি তাদেরকে দোযখের জন্যে তৈরী করেছি। তারা দোযখীদের কাজ করবে।

ইমাম আহমদ (রঃ) আবু নাসরার সূত্রে সাহাবী আবু আবদুল্লাহর (রাঃ) বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আবু আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেনঃ আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ পাক নিজের দক্ষিণ হস্তের এক মুষ্ঠি গ্রহণ করেছেন এবং দ্বিতীয় হাত দিয়ে আরেক মুষ্ঠি গ্রহণ করেছেন এবং (প্রথম মুষ্ঠি সম্পর্কে বলেছেন) এটি তার জন্যে অর্থাৎ জান্নাতের জন্যে। আর এটি তার জন্যে অর্থাৎ দোযখের জন্যে। আর আমি কারো পরোয়া করিনা।[১]

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৪৩

وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ.

যদি তাদের নিকট যাবতীয় নিদর্শনও আসে কিন্তু কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আযাব না দেখা পর্যন্ত তারা ঈমান আনবেনা। অর্থাৎ অনবরত কুফরী ও নাফরমানীর কারণে তাদের অন্তরে মোহর পড়ে যাবে। তারা সত্যকে গ্রহণের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে, দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ তাদের সম্মুখে মূর্ত হয়ে দেখা দেবে, কিন্তু তাদের অন্তরে তা প্রবেশ করবে না। তাদের নাফরমানীর ভয়াবহ পরিণতি স্বরূপ যখন কঠিন আযাব স্বচক্ষে দেখবে তখন তারা ঈমানের কথা বলবে। কিন্তু তখন সে ঈমান তাদের কোন কাজে লাগবেনা। জীবন সায়াহ্নে যখন মৃত্যুর পরোয়ানা আসে তখন ঈমান আনলে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। অথবা মৃত্যুর পর কবরে বা কেয়ামতের দিন দোযখের শাস্তি দেখবে। এমন সময় ঈমান আনলে তা গ্রহণযোগ্য হয়না, যেমন ফেরাউনের ঈমান তার জন্যে উপকারী হয়নি।[১]

فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ ۚ لَمَّآ اٰمَنُوْا
كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ
﴿٩٨﴾ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ۭ اَفَاَنْتَ
تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ
اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٠﴾ قُلِ
انْظُرُوْا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۭ وَمَا تُغْنِي الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ
قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠١﴾ فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ
الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ قُلْ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ
﴿١٠٢﴾ ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ
الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾

তরজমা

(৯৮) তবে ইউনুসের জাতি ব্যতীত কোন জনপদবাসী কেন এমন হলোনা যারা ঈমান আনয়ন করত এবং তাদের ঈমান তাদের জন্যে উপকারী হত, তারা যখন ঈমান আনল, আমি তখন তাদের থেকে দুনিয়ার এ জীবনে লাঞ্ছনার আযাব দূরীভূত করি এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদেরকে জীবন উপভোগ করার সুযোগ দান করি।

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৪৩

(৯৯) (হে রসূল!) যদি আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন, তবে পৃথিবীতে যত লোক আছে সকলেই ঈমান আনত, তবে কি আপনি মানুষকে ঈমানদার হওয়ার জন্যে জবরদস্তি করবেন?

(১০০) আর আল্লাহ পাকের অনুমতি ব্যতীত কেউ ঈমান আনতে পারেনা। আর যারা ভেবে দেখেনা, বিবেক-বুদ্ধি ব্যয় করেনা, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে কলুষ লিপ্ত করেন।

(১০১) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আসমান জমীনে যা কিছু আছে, তোমরা তার প্রতি লক্ষ্য কর, অবশ্য অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন সমূহ এবং ভীতি প্রদর্শন উপকারে আসেনা।

(১০২) তাদের পূর্বে যারা অতীত হয়েছে, তারা কি তাদের পূর্বে যা ঘটেছে তার অনুরূপ ঘটনারই অপেক্ষা করছে? (হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম।

(১০৩) এরপর আমি আমার রসূলগণকে এবং তাদের সঙ্গী মোমেনগণকে রক্ষা করি, মোমেনদেরকে এভাবে রক্ষা করা আমারই দায়িত্ব।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

এ আয়াত সমূহে আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য নাফরমানদেরকে তওবা করার এবং ঈমান আনয়নের জন্যে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। যেভাবে হযরত ইউনুস (আঃ)-এর জাতি কুফরী ও নাফরমানীর পর ঈমান এনেছিল কিন্তু অপরাধ থেকে খাঁটি তওবা করেছিল, ফলে তারা আল্লাহ্ পাকের আযাব থেকে অবশেষে রক্ষা পেয়েছে। ঠিক এমনিভাবে যদি তোমরাও কুফরী ও নাফরমানী বর্জন কর এবং ঈমানের মহামূল্যবান সম্পদ অর্জন কর তবে তোমাদের নসীবও বুলন্দ হবে। হযরত ইউনুস (আঃ)-এর জাতি আল্লাহর গজবের প্রাথমিক আলামত লক্ষ্য করেই তওবা করে পানাহার পরিহার করে পুরাতন ছেড়াফাড়া পোষাক পরিধান করে ছোট-বড় সকলেই উন্মুক্ত ময়দানে সমবেত হয় এবং আল্লাহ পাকের দরবারে খাঁটি তওবা করে ক্রন্দন করতে থাকে। তখন আল্লাহ্ পাক উপস্থিত আযাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ

ইউনুস (আঃ)-এর জাতি ব্যতীত এমন কোন বসতি কেন নেই? যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমান উপকারী হয়েছে। মূলতঃ আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত নবী রসূলগণকে যারা মিথ্যাজ্ঞান করেছে এবং তাঁদের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তারা আল্লাহর আযাবের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে, অবশেষে আযাব এসে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে, এমন বহু ঘটনা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। তবে একটি ব্যতিক্রমও রয়েছে সেই ব্যতিক্রমী ঘটনা হলো হযরত ইউনুস (আঃ)-এর। তাঁর সম্প্রদায় যখন হেদায়েত গ্রহণ করেনি, তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে তখন তিনি তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, যদি তোমরা সতর্ক না হও, যদি তোমরা আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান

না আন তবে তিন দিনের মধ্যেই তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব আপতিত হবে। তৃতীয় দিনের রাতের শেষ প্রহরে তিনি ঐ এলাকা থেকে অন্যত্র গমন করলেন। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ পাকের আযাব পরিলক্ষিত হয়। তখন হযরত ইউনুস (আঃ)-এর জাতি খাঁটি তওবা করলো, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে রক্ষা করেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীস তিরমিজী ও এবনে মাজা শরীফে সংকলিত হয়েছে। এই হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক বন্দার তওবা কবুল করেন যতক্ষণ তার মধ্যে মৃত্যুর আলামত প্রকাশ না পায়।

হযরত আবুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক বন্দাকে মাগফেরাত দান করেন যতক্ষণ তার উপর আবরণ না পড়ে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ আবরণ কি? তিনি এরশাদ করছেনঃ শেরকের অবস্থায় মৃত্যু। (আহমদ, বায়হাকী)

لَمَّآ اٰمَنُوْا

অর্থাৎ-যখন ইউনুস (আঃ)-এর জাতি ঈমান আনে, তখন আমি তাদের ঈমানকে গ্রহণ করি এবং তাদের তওবা কবুল করি এবং তাদের উপর থেকে আযাব দূরীভূত করি। এরশাদ হয়েছেঃ

كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

অর্থাৎ- তাদের থেকে আমি পার্থিব জীবনে অপমানজনক আযাব দূরীভূত করি এবং একটি নিদৃষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে জীবনের উপকরণ ভোগ করার সুযোগ দান করি।

আল্লামা বগভী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এর অর্থ হলো ইউনুস (আঃ)-এর জাতি ব্যতীত আর কোন সম্প্রদায় এমন হয়নি যারা আযাবের আলামত প্রত্যক্ষ করার পর ঈমান এনেছে এবং সে ঈমান তাদের জন্যে উপকারী হয়েছে।

এ পর্যায়ে তফসীরকারগণ দু' প্রকার অভিমত পোষণ করেছেন। হযরত ইউনুস (আঃ)-এর জাতি বাস করতো ইরাকের মোসেল প্রদেশের নাইনুয়া এলাকায়। অধিকাংশ তফসীরকারগণ এ মত পোষণ করেন যে, সেখানে প্রকৃত আযাব আসেনি তবে আযাবের লক্ষণ ও আলামত পরিলক্ষিত হয়। ঐ আলামত লক্ষ্য করেই নাইনুয়াবাসী খাঁটি তওবা করে এবং আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে। আল্লাহ পাক তাদের তওবা কবুল করেন এবং আযাবকে দূরীভূত করেন।

আর তত্ত্বজ্ঞানীদের অন্য এক দল বলেন যে, তারা আল্লাহর আযাবকে স্বচক্ষে দেখেছিল এবং এর পর ঈমান এনেছিল, কেননা আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ

(তাদের থেকে অপমানজনক আযাব দূরীভূত করেছি) আযাব উপস্থিত হওয়ার পরই তা দূর করা যেতে পারে। যারা বলেছেন,, সে আযাব নাযিল হয়নি, বরং তার আলামত পরিলক্ষিত হয়েছিল তাদের মধ্যে জুযাজ (রঃ) অন্যতম।[১]

তফসীরকারদের মধ্যে এ সম্পর্কেও একাধিক মত রয়েছে যে, নাইনুয়াবাসী শুধু দুনিয়াতেই আযাব মুক্ত হয়েছে, নাকি আখেরাতেও আযাব মুক্ত থাকবে?

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বলেছেনঃ দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের জন্যেই তারা আযাব মুক্ত হয়েছে। তিনি বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে নাইনুয়াবাসীর ঈমান আনয়নের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, ফলে তারা নিশ্চিত আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছে। আর ঈমানের বরকতে আখেরাতের আযাব থেকেও রক্ষা পাবে–এটিই স্বাভাবিক।[২]

কখন ঈমান গ্রহণযোগ্য হয় না

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা দেখার পর ঈমান গ্রহণযোগ্য হয়না তা হলো, আখেরাতের আযাব যা মৃত্যুর সময় মৃত্যুর ফেরেশতাদের আকৃতিতে মৃত্যুপথ যাত্রীর সম্মুখে দেখা দেয়। ঐ আযাব দেখার পর আর ঈমান গ্রহণযোগ্য হয়না।

দুনিয়ার আযাব দেখার পর তওবা করে ঈমান আনলে তা কবুল হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, বদরের যুদ্ধের দিন কাফেরদের উপর হত্যা বন্দী হওয়ার আকৃতিতে আযাব এসেছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর যারা ঈমান এনেছে তাদের ঈমান কবুল করা হয়েছে। ঠিক এ অবস্থাই হয়েছিল হযরত ইউনুস (আঃ)-এর জাতির। তারা আখেরাতের আযাব দেখার পূর্বে দুনিয়ার আযাব দেখেছিল এবং আযাব দেখেই ঈমান এনেছিল। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের ঈমান গ্রহণযোগ্য হয়েছে। ফলে আল্লাহ পাক তাদের উপর থেকে আযাব সরিয়ে দিয়েছেন। তবে ফেরাউনের ঈমান গ্রহণযোগ্য হয়নি তার কারণ হলো এই যে, সে লোহিত সাগরে ডুবন্ত অবস্থায় প্রাণ বায়ু বের হবার মুহূর্তে ঈমানের কথা প্রকাশ করেছিল। আর ঐ সময় কারো ঈমান গ্রহণযোগ্য হয়না। অথবা এর কারণ হলো এই, সে মৌখিক ঈমানের কথা প্রকাশ করেছিল কিন্তু আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত যে, সে অন্তর থেকে ঈমান আনেনি। কেননা হযরত মূসা (আঃ) তার ব্যাপারে বদদোয়া করেছিলেন, এজন্যে ফেরাউন অন্তর থেকে ঈমান আনেনি। এতদ্ব্যতীত, ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায়ের অভ্যাস এই ছিল যে, যখনই তারা আল্লাহর আযাব দেখতো তখন বলতো হে মূসা! আপনার প্রতি ঈমান আনবো এবং বনী ইসরাঈলকে আপনার সাথে যেতে দেব, কিন্তু যখন আল্লাহ পাক তাঁর আযাবকে দূর করে দিতেন তখন তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতো, পূর্বের ন্যায় শেষবারও হয়তো তাই করেছিল।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫০৯
তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৪৫

২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১১, পৃষ্ঠা-৮১

হযরত ইউনুস (আঃ)-এর ঘটনা

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ), সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) এবং ওয়াহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত ইউনুস (আঃ)-এর জাতি নাইনুয়া এলাকার অধিবাসী ছিল। আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েতের জন্যে হযরত ইউনুস (আঃ)-কে প্রেরণ করেন। তিনি তাদেরকে ঈমান আনয়নের জন্যে আহ্বান জানান। কিন্তু তারা হযরত ইউনুস (আঃ)-এর আহ্বানে সাড়া দেয়নি। হযরত ইউনুস (আঃ) একাধারে সাত বছর যাবত তাদেরকে হেদায়েত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা মূর্তিপূজা পরিহার করেনি, কোন অবস্থাতেই পৌত্তলিকতা বর্জন করতে প্রস্তুত হয়নি। এমন অবস্থায় আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হযরত ইউনুস (আঃ)-এর প্রতি এই আদেশ হলঃ তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তিনদিনের মধ্যেই তাদের উপর আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আযাব আপতিত হবে।

নাইনুয়াবাসীদের মধ্যে কিছু লোক বললো, এই ব্যক্তি কোনদিনও মিথ্যা কথা বলেনি, এজন্যে অপেক্ষা কর এবং দেখ, যদি সে আজ রাত তোমাদের সাথে থাকে তবে বুঝতে হবে যে সকালে কিছু হবে না। আর যদি রাতে সে তোমাদের সাথে না থাকে তবে সকালে আযাব অবশ্যই আসবে। তৃতীয় দিনের শেষ রাতে হযরত ইউনুস (আঃ) ঐ এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন। এদিকে অতি প্রত্যুষে নাইনুয়াবাসীর উপর আকাশে ভয়ংকর কালো মেঘ দেখা গেল এবং তা থেকে ধূম্র নির্গত হতেও দেখা গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐ কালো মেঘ তাদের বাড়ীর ছাদ পর্যন্ত পৌঁছে গেল এবং ছাদের উপর পর্যন্ত সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। তখন নাইনুয়াবাসী বুঝলো যে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। তাই তারা হযরত ইউনুস (আঃ)-এর সন্ধানে বের হল। যখন তাকে পাওয়া গেলনা তখন তারা স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, আবাল বৃদ্ধ-বণিতাকে নিয়ে উন্মুক্ত ময়দানে ফকিরের বেশে সমবেত হয় এবং তওবা করে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনে আসন্ন আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে ক্রন্দন করতে থাকে। মায়ের কোল থেকে শিশুদেরকে আলাদা রাখা হল। এমনকি চতুঃস্পদ জন্তু থেকেও তাদের বাচ্চাগুলোকে দূরে রাখা হল।

ফলে মা শিশু সকলের মাঝে কান্নার রোল পড়লো। এই কান্নাকাটির কারণে আল্লাহ পাকের দয়া হল। তিনি তাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং আযাবকে দূরে সরিয়ে দিলেন। এ ঘটনা ঘটে দশই মহররম তথা আশুরার তারিখে। এবনে আবি হাতেম হযরত আলী (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত ইউনুস (আঃ)-এর জাতির তওবা আশুরার দিন কবুল হয়েছিল। হযরত ইউনুস (আঃ) অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন এবং আযাব নাযিল হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু যখন দেখলেন আযাব আসেনি তখন সে যুগের নিয়ম মোতাবেক তিনি চিন্তিত হলেন (কেননা তখনকার নিয়ম ছিল এই, যদি কেউ মিথ্যা কথা বলতো তবে তাকে হত্যা করা হত)। হযরত ইউনুস (আঃ) ভাবলেন, আমিতো আমার জাতির নিকট যা বলেছি তা মিথ্যা প্রমাণিত হল। এমন অবস্থায় তাদের নিকট কিভাবে প্রত্যাবর্তন করবো, তাই তিনি সমুদ্র উপকূলে উপস্থিত হলেন। কিছু লোককে দেখলেন, তারা তরীতে আরোহন করছে। লোকেরা তাঁকে চিনতে পারলো এবং তরীতে আরোহন করিয়ে নিল। তরী যখন ঠিক সমুদ্রের মাঝখানে তখন তা থেমে গেল। সামনের দিকেও অগ্রসর হয়না এবং পেছনের দিকেও যায়না। লোকেরা বললো, এর কারণ কি?

হযরত ইউনুস (আঃ) বললেনঃ এর কারণ আমার জানা আছে। এই তরীতে কোন বড় গুনাহগার আরোহণ করেছে। লোকেরা বললো, কে সেই গুনাহগার? হযরত ইউনুস (আঃ) বললেন, আমিই সেই অপরাধী, আমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ কর। লোকেরা [illegible] যতক্ষণ আমরা কোন বিশেষ কারণ সম্পর্কে অবগত না হবো ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে আমরা সমুদ্রে ফেলতে পারিনা। অবশেষে লটারী করা হল কিন্তু তিনবারই হযরত ইউনুস (আঃ)-এর নাম আসলো। হযরত ইউনুস (আঃ) বললেন, তোমরা আমাকে পানিতে ফেলে দাও, অন্যথায় তোমরা সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। অবশেষে লোকেরা বাধ্য হয়ে তাঁকে পানিতে ফেলে দিল, এরপর তরী পুনরায় চলতে লাগলো, তরীর নিচে একটি বড় মাছ তার মুখ উন্মুক্ত করে আল্লাহ পাকের আদেশের অপেক্ষা করছিল, হযরত ইউনুস (আঃ) নিক্ষিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে তাঁকে মুখে নিয়ে নিল।

মাছের উদরে ইউনুস (আঃ)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত ইউনুস (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বের হয়ে পড়েন এবং সমুদ্রের উপকূলে পৌঁছে দেখেন যে, একটি জাহাজ যাত্রী বোঝাই হয়ে আছে, তিনি তাতে আরোহন করেন। জাহাজটি সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হল। সমুদ্রের মধ্যস্থলে পৌঁছার পর জাহাজের গতি আপনা আপনিই থেমে গেল। জাহাজের কাপ্তান বলল, আমাদের জাহাজে কোন গুনাহগার ব্যক্তি অথবা কোন পলাতক গোলাম আরোহণ করেছে, যার কারণে জাহাজের গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে। এসব অবস্থায় আমাদের প্রথা হল এই, আমরা লটারীর মাধ্যমে অপরাধীকে চিহ্নিত করি এবং তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করি কেননা, একজনকে নিমজ্জিত করা জাহাজ সহ সমস্ত আরোহী ধ্বংস হওয়ার চেয়ে শ্রেয়। তিনবার লটারী করা হল, প্রতিবারই হযরত ইউনুস (আঃ)-এর নাম এসেছে। তখন তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, আমিই গুনাহগার ব্যক্তি এবং পলাতক গোলাম। তখন তিনি নিজেই সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলল। এরপর ঐ মাছের চেয়ে আরো একটি বড় মাছ এসে তাকে গিলে ফেলল। আল্লাহ পাক মাছকে আদেশ দিলেন, ইউনুসের যেন সামান্যতম কষ্টও না হয়, আমি তোমার উদরকে তার জন্যে কারাগার বানিয়েছি, কিন্তু তাকে তোমার আহার্য বানাইনি।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে, মাছকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে একথা বলে সতর্ক করা হয়েছে যে, ইউনুসকে তোমার খাদ্যবস্তু বানাইনি; বরং তোমার উদরকে তার জন্যে সংরক্ষিত স্থান এবং এবাদতখানা বানিয়েছি।

অন একটি বর্ণনায় রয়েছে, লটারী করার পূর্বেই হযরত ইউনুস (আঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, আমিই গুনাহগার, আমিই পলাতক গোলাম। লোকেরা তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বললেন, আমি ইউনুস এবনে মাতা।

লোকেরা তাঁকে চিনতে পারলো এবং বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনাকে সমুদ্রে ফেলবনা; বরং আমরা লটারী করব। লটারীতে হযরত ইউনুস (আঃ)-এর নামই আসল। তখন তিনি নিজেই সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, মাছটি তাঁকে গিলে ফেলার পর জমিনের সপ্তম স্তরে নিয়ে যায় এবং ৪০ রাত পর্যন্ত তিনি মাছের পেটে ছিলেন। তিনি সেখানে প্রস্তর খন্ডের তসবীহ পাঠের শব্দ শ্রবণ করেছেন এবং ঐ অন্ধকারেই তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে ফরিয়াদ করে এ দোয়া পাঠ করেছেন যা দোয়ায়ে ইউনুস নামে বিখ্যাত।

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক মাছ তাঁকে সমুদ্রের উপকূলে এনে ফেলে দিল। তাঁর দেহ তখন কোন পশম তোলা ছোট মুরগীর নরম দেহের মত হয়ে গিয়েছিল।

আল্লাহ পাক সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থানে কদু তরকারীর গাছ তৈরী করে দিলেন। যার ছায়ায় হযরত ইউনুস (আঃ) বিশ্রাম করলেন এবং একটি পাহাড়ী বকরীকে আদেশ দিলেন যেন তাঁকে দুধ পান করায়। কিছুদিন পর যখন কদু গাছটি শুষ্ক হয়ে গেল, তখন তিনি ক্রন্দন করলেন। আল্লাহ পাক এই বলে ওহী প্রেরণ করলেন যে, একটি গাছের শুষ্ক হওয়াতে তুমি ক্রন্দন করলে, অথচ লক্ষাধিক লোকের ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে ক্রন্দন করলে না। এরপর হযরত ইউনুস (আঃ) সেখান থেকে রওয়ানা হলেন। পথে একজন গোলামের সঙ্গে সাক্ষাত হয় যে গৃহপালিত জন্তু চরায়। গোলামকে তিনি তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, আমি ইউনুস (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের লোক, তখন তিনি তাকে বললেন, যখন তুমি তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট যাবে তখন তাদেরকে বলবে যে, আমি হযরত ইউনুস (আঃ)-এর সাক্ষাত পেয়েছিলাম। গোলাম বলল, আপনি অবগত আছেন যে, আমার কথার সত্যতার কোন স্বাক্ষ্য প্রমাণ যদি আমি পেশ না করতে পারি তবে মিথ্যা কথা বলার জন্যে আমাকে হত্যা করা হবে। তখন হযরত ইউনুস (আঃ) বললেন, জমিনের এ খন্ডটি এবং এ গাছটি তোমার পক্ষে স্বাক্ষ্য দেবে। গোলাম বলল, তাহলে আপনি তাদেরকে আমার পক্ষে স্বাক্ষ্য প্রদানের আদেশ দিন। হযরত ইউনুস (আঃ) বললেন, যখন এ গোলাম তোমাদের নিকট আসবে, তোমরা উভয়ে তার পক্ষে স্বাক্ষ্য দিও। জমিন এবং গাছ বলল, অবশ্যই।

গোলাম তখন দেশের বাদশাহর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আমি হযরত ইউনুস (আঃ)-এর সাক্ষাত পেয়েছি। বাদশাহ গোলামকে হত্যা করার আদেশ দেয়। গোলাম বলল, একথার সত্যতার স্বাক্ষী আমার নিকট রয়েছে, আমার সঙ্গে কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করুন। গোলাম লোকদেরকে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে আসে এবং বলে, আমি তোমাদের উভয়কে আল্লাহ পাকের নামে শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি যে, হযরত ইউনুস (আঃ) কি তোমাদের উভয়কে সাক্ষী বানিয়ে ছিলেন? যমিনের খন্ড এবং গাছ উভয়ে বলল, হ্যাঁ। একথা শ্রবণ মাত্র লোকেরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করল এবং বাধশাহর নিকট এসে বলল, গাছ এবং যমিন এ গোলামের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে। তখন বাদশাহ গোলামের হাত ধরে তার নিজের স্থানে তাকে বসিয়ে দিলেন এবং বললেন, তুমি এ স্থানে আমার চেয়ে অধিকতর উপযুক্ত। এরপর গোলাম ৪০ বছর যাবত সে দেশের শাসন কার্য পরিচালনা করে।[১]

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৪৮

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا.

আর যদি আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন, তবে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ঈমান আনতো। (অর্থাৎ) যদি এটি আল্লাহ্ পাকের মর্জি হতো যে সকলেই ঈমান আনুক তবে সকলেই ঈমান আনতো। কেউ এ সম্পর্কে মতভেদ করত না। কিন্তু আল্লাহ্ পাক কোন ব্যক্তিকে ঈমান আনয়নের জন্যে বাধ্য করেন না এবং সুস্পষ্ট ভাষায় তিনি ঘোষণা করেছেনঃ

فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ.

"যে ইচ্ছা করে ঈমান আনতে পারে, আর যার ইচ্ছা কাফের থাকতে পারে"। এভাবে আল্লাহ্ পাক পৃথিবীকে পরীক্ষার স্থল করে রেখেছেন, যে তার বিবেক বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করে পরিণামদর্শী হয়ে আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনবে, পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে নেক আমলের সম্বল সংগ্রহ করবে, সে জীবন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, লাভ করবে বিরাট সাফল্য।

ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

এটিই হলো বিরাট সাফল্য।

পক্ষান্তরে, যে এ ক্ষণভঙ্গুর জীবন নিয়ে ব্যস্ত-মুগ্ধ থাকবে, স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনবেনা, আখেরাতের জন্যে সম্বল সংগ্রহ করবেনা, তাকে তার শোচনীয় পরিণাম অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ.

(হে রসূল!) সকলে যেন মোমেন হয়, এজন্যে কি আপনি বল প্রয়োগ করবেন? তা নিশ্চয় করবেন না কেননা, এটি বিচার-বিবেচনা বিরুদ্ধ কাজ। তফসীরকারগণ বলেছেন, এ আয়াত দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে এ মর্মে যে, (হে রসূল!) সকলে ঈমান আনেনি এজন্যে আপনি চিন্তিত ও ব্যথিত হবেন না কেননা, ঈমান আনতে কাউকে বাধ্য করা আল্লাহ্ পাকের অভিপ্রায় নয়।[১]

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ.

আর আল্লাহ্ পাকের অনুমতি ব্যতীত ঈমান আনয়নের সাধ্য কারোই নেই, যারা বিবেক বুদ্ধি দ্বারা কাজ নেয়না, তাদের উপরই তিনি কুফরী ও নাফরমানীর অপবিত্রতা ফেলে দেন, যেহেতু ঈমানের মোকাবেলায় رِجْسٌ ব্যবহার করা হয়েছে, তাই এর ব্যাখ্যা হলো কুফরী, নাফরমানী।

---

[১]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৫৫

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ এ শব্দটির এ স্থলে অর্থ হলো, আল্লাহর আযাব বা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া। অবশ্য এসবই ঈমান না আনার পরিণাম। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, কারো ঈমান আনয়নের পথে আল্লাহ্ পাক কোন বাঁধা সৃষ্টি করেন না। তবে এজন্যে আল্লাহ্ পাক কাউকে বাধ্য করাও পছন্দ করেন না, মানুষ যদি নিজের বিবেক-বুদ্ধি সঠিকভাবে প্রয়োগ করে তবে সে অবশ্যই সত্যকে গ্রহণ করে, অসত্যকে বর্জন করে। আর পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য হলো আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। এজন্যেই পরবর্তী আয়াতে সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করে চিন্তা ও গবেষণা করে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ.

সৃষ্টি মাত্রই আল্লাহ্ পাকের কুদরতের জীবন্ত সাক্ষী

(হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারাকে দেখ এবং চিন্তা কর। পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, বৃক্ষ-তরুলতা, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ এক কথায় সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতি লক্ষ্য কর, চিন্তা কর, নিখিল বিশ্ব স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের কত বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত রয়েছে। মূলতঃ সৃষ্টি মাত্রই আল্লাহ্ পাকের কুদরত হেকমতের জীবন্ত সাক্ষী, জ্বলন্ত প্রমাণ।

وَمَا تُغْنِى الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ.

কিন্তু যারা ঈমান আনবেনা, যারা হেদায়েত কবুল করবেনা, তাদের জন্যে কোন নিদর্শনই উপকারী হয়না এমনকি, আল্লাহর হেদায়েত এবং সতর্কবাণীও উপকারী হয়না। আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়, তার শারীরিক শক্তি ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়ে যায়, যখন আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে তখন সে উপলব্ধি করতে পারে অবশেষে একদিন আমাকেও এ পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে। অতএব, আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান এনে আখেরাতের জন্যে সম্বল সংগ্রহ করাই আমার কর্তব্য।

কিন্তু যারা হতভাগা, তারা এভাবে চিন্তা করেনা, এ পথে আসেনা, কোন নিদর্শন থেকেই তারা শিক্ষা গ্রহণ করেনা।

فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ.

ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ হতভাগ্য দুবৃত্তরা আল্লাহর নবীর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে (মক্কার মুশরেক)। যারা নিদর্শন দেখেও দেখেনা, কোনভাবেই হেদায়েত কবুল করেনা তারা আসলে তাদের ধ্বংসের অপেক্ষা করছে। ইতিপূর্বে আদ, সামুদ জাতি, ফেরাউন, নমরুদ এবং তাদের দলবল আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য হওয়ার কারণে নিশ্চিহ্ন হয়েছে, ঠিক তেমনি এ কাফেররাও শুধু তাদের ধ্বংসেরই অপেক্ষা করছে।

قُلْ فَانْتَظِرُوْا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ.

সত্য অবশ্যই জয়ী হবে

(হে রসূল!) আপনি কাফেরদেরকে বলুনঃ তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি। একদিন অবশ্যই সত্য মিথ্যার নিষ্পত্তি হবে, সত্য অবশ্যই জয়ী হবে, বাতিল অবশ্যই পরাজিত হবে। আর একথাও সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, কে সত্যের আহ্বায়ক আর কে অসত্যের বাহক?

ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا.

এরপর আমি আমার রসূলগণকে এবং তাদের সঙ্গী মোমেনগণকে এভাবেই রক্ষা করি, মোমেনদেরকে এভাবে রক্ষা করা আমারই দায়িত্ব।

যারা আল্লাহর নবীগণকে মিথ্যাজ্ঞান করে এবং আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয় তাদেরকে ধ্বংস করা এবং নবীগণকে ও তাদের সঙ্গী মোমেনদেরকে রক্ষা করা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের চির-শাশ্বত নিয়ম। তাদেরকে আখেরাতের আযাব থেকে তো অবশ্যই রক্ষা করা হবে এমনকি, দুনিয়াতেও মোমেনদেরকে কাফেরদের জুলুম অত্যাচার থেকে রক্ষা করা আল্লাহ পাকের দায়িত্ব বলে আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا.

এরপর আমি আমার রসূলগণকে এবং তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী মোমেনদেরকে রক্ষা করি (এবং কাফেরদেরকে ধ্বংস করি)। এটি পূর্বকালের অবস্থা।

كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

এভাবে অর্থাৎ যেভাবে পূর্বকালের আম্বিয়ায়ে কেরামগণকে রক্ষা করেছি ঠিক এভাবে আযাব নাযিল হওয়ার সময় আমি মোহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর সাথী মোমেনদেরকে রক্ষা করবো। এটি আমার দায়িত্ব।[১]

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَآ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ
تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ ۚ وَاُمِرْتُ
اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٤﴾ وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ
وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٥﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا
يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৫৫

তরজমা

(১০৪) (হে রসূল!) আপনি বলুন হে মানব জাতি! যদি আমার দ্বীনের ব্যাপারে তোমরা সন্দিহান হও তবে জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহ পাক ব্যতীত যাদের বন্দেগী কর আমি তাদের বন্দেগী করিনা। আমিতো শুধু আল্লাহ পাকেরই বন্দেগী করি যিনি তোমাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত করেন এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন মোমেনদের অন্তর্ভুক্ত হই।

(১০৫) আর আমার প্রতি এ নির্দেশও হয়েছে যে, তুমি একনিষ্ঠভাবে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত হও, আর কখনও মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।

(১০৬) আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য এমন কাউকে ডেকোনা, যারা তোমাদের উপকারও করতে পারে না এবং অপকারও করতে পারেনা। যদি তা কর তবে এমন অবস্থায় তুমিও জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

তফসীরুল কোরআন

এ সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত দ্বীন ইসলামের মৌলিক বিষয় সমূহ যথা তৌহিদ, রেসালত, হাশর-নশর, কেয়ামত প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে দলিল প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এরপর আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ হে নবী! আপনি সকলকে জানিয়ে দিন যে, আমি যে ধর্মের দাওয়াত তোমাদেরকে দিয়েছি সে সম্পর্কে তোমরা যদি এখনও সন্দিহান থাক বা বুঝতে অপারগ হও তবে একথা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আমি তোমাদের মনগড়া হাতের তৈরী উপাস্যদের মানিনা, কোন দিনও মানবো না। আমি সেই আল্লাহ পাকেরই বন্দেগী করি যিনি জীবন মরণের মালিক, যিনি আমাদেরকে জীবন দান করেছেন এবং যার আদেশেই হয় মৃত্যু, বন্দেগীর যোগ্য একমাত্র তিনিই।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে জীবন ও মৃত্যু উভয়টিই যে আল্লাহ পাকের আদেশে হয় একথা বলাই উদ্দেশ্য। তবে শুধু মৃত্যুর উল্লেখ এজন্যে করা হয়েছে যেন শ্রোতার অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়।

আয়াতের মর্মকথা হলো এই, যদি তোমরা দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে তোমাদের কোন প্রকার সন্দেহ থাকে তবে সে সম্পর্কে চিন্তা চর্চা করে সন্দেহ দূরীভূত কর। মনে রেখো আমি এই পাথরের সম্মুখে মাথা নত করি না যা কোন উপকার করতে পারেনা, অপকারও করতে পারে না। এমন কিছুর বন্দেগী করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়; বরং আমি বন্দেগী করি এক, অদ্বিতীয়, লা-শরীক আল্লাহ পাকের, যাঁর হাতে রয়েছে আমাদের জীবন ও মরণ, আমার উপর এ আদেশ হয়েছে যেন আমি মোমেনদের অন্তর্ভুক্ত হই। আর একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহর বন্দেগী করি, শেরক ও কুফর থেকে দূরে থাকি।[১]

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৫০

ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের পার্থক্য

আলোচ্য আয়াতে দ্বীন ইসলাম এবং জাহেলিয়াতের যুগের ধর্ম বিশ্বাসের পার্থক্য বর্ণিত হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ হে অবিশ্বাসী! যদি দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে এখনও তোমাদের কোন প্রকার সন্দেহ থাকে তবে তোমরা জেনে রাখ যে, দ্বীন ইসলামের মধ্যে এবং তোমাদের ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো এই যে, তোমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের সাথে শেরক কর। আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কিছুকে তোমরা উপাস্য মনে কর। দ্বীন ইসলামের মূল বক্তব্য হলো তৌহিদ বা আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা। আমি এক আল্লাহ্ পাকের বন্দেগী করি যাঁর হাতে রয়েছে তোমাদের জীবন ও মরণ।

দ্বিতীয়তঃ প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান, মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে রয়েছে এর নিয়ম-কানুন, জীবনের কোন দিক ইসলামের আওতার বাইরে নয়।

তৃতীয়তঃ ইসলামের দৃষ্টিতে জীবনের উদ্দেশ্য হলো এক আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভ, আর কিছু নয়। এমনিভাবে ইসলাম আখেরাতের জীবনের সাফল্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে। এ জীবনের সাফল্য আখেরাতের সাফল্যের উপরই নির্ভরশীল। এমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণই হলো জীবন-সাধনার সার্থকতার পূর্বশর্ত। অন্যান্য ধর্মে এসব কিছুই নেই। এ পর্যায়ে আরও বহু কথা আছে। সবার উপরে, আল্লাহ পাকের নিকট ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন বিধান, এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ.

"আল্লাহ্ পাকের দরবারে ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন বিধান"।

কোন কোন মূর্খ মুশরেক স্রষ্টা মনে করতো একজনকে এবং মৃত্যুর দেবতা মনে করতো অন্য জনকে, তাই সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছেঃ

الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ.

যিনি তোমাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত করেন আমি তাঁরই বন্দেগী করি। অতএব, তোমরাও শুধু তাঁরই বন্দেগী কর এবং শুধু তাঁকেই ভয় কর।[১]

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ.

আর আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য এমন কিছুর বন্দেগী করোনা যা তোমাদের উপকারও করতে পারেনা, অপরকারও করতে পারেনা। এতে একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, উপকার এবং অপকার করার ক্ষমতা আল্লাহ্ পাক ব্যতীত আর কারো হাতে নেই। অতএব, আশা করতে হবে একমাত্র আল্লাহ্ পাকের দরবারে এবং ভয় করতে হবে শুধু

[১]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৫৬

তাঁকে এবং ভরসা রাখতে হবে শুধু আল্লাহ পাকের প্রতি। আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী করার মত নির্বুদ্ধিতা আর কিছুই হতে পারেনা। নবী রসূলের ন্যায় মহামানব এমন কাজ করতে পারেন না। যদি কারো দ্বারা এমন কাজ হয়ে যায় তবে তাঁরও রক্ষা নেই।

হযরত আনাস এবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আজীবন কল্যাণের অন্বেষণ কর। আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহকে সম্মুখে রাখ। আল্লাহ পাকের রহমতের শীতল বাতাস যদি কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি লাভ করে তবে তা তার সৌভাগ্য। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তাঁর রহমত দানে ধন্য করেন। আল্লাহ পাকের নিকট মিনতি জানাও যেন তিনি তোমার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখেন এবং জমানার বালা-মসিবত থেকে এবং প্রবৃত্তির তাড়না থেকে রক্ষা করেন। তিনি করুণাময়, দয়াবান, আর গুনাহ যে প্রকারেরই হোক, তওবা করে নাও তিনি কবুল করবেন। কেননা তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব করুণাময়।

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا
رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
﴿١٠٧﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ
فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنَا
عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨﴾ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ
وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٠٩﴾

তরজমা

(১০৭) আর আল্লাহ পাক যদি তোমাকে কোন কষ্ট দেন তবে তিনি ব্যতীত আর কেউ তা দূরীভূতকারী নেই। আর যদি তিনি তোমার কল্যাণ সাধন করতে ইচ্ছুক হন তবে তাঁর দানকে প্রতিরোধ করতে পারে এমনও কেউ নেই। তাঁর বন্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি কল্যাণ দান করেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

(১০৮) (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, হে মানব জাতি! তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে সত্য এসেছে। অতএব যারা হেদায়েত গ্রহণ করবে সে তার নিজের কল্যাণই সাধন করবে। আর যে পথভ্রষ্ট হবে সে নিজেরই অকল্যাণে বিভ্রান্ত হয়ে থাকবে। (মনে রেখো) আমি কিন্তু তোমাদের কর্ম বিধায়ক নই।

(১০৯) (হে রসূল!) আপনার প্রতি যে ওহী নাযিল হয় আপনি তা মেনে চলুন, আর যে পর্যন্ত না আল্লাহ পাক ফয়সালা করেন আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। আর আল্লাহ পাকই উত্তম মীমাংসাকারী।

তফসীরুল কোরআন

বস্তুতঃ মানুষের লাভ-ক্ষতি, ভাল-মন্দ সবই এক আল্লাহ পাকের হাতেই রয়েছে। যদি স্বয়ং আল্লাহ পাক কাউকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে মর্জি করেন তবে তিনি ভিন্ন আর কেউ এমন নেই যে ঐ কষ্ট দূর করতে পারে। আর যদি আল্লাহ পাক কারো কল্যাণ সাধন করতে চান তবে তাকে বাধা দেয়ার শক্তিও কারো নেই। তিনি তাঁর বন্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার কল্যাণ সাধন করেন। অতএব, বন্দেগী শুধু তাঁরই করা উচিত আর কারো নয়, জীবনের মালিক তিনিই, আর কেউ নয়।

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ

ইতিপূর্বে দ্বীন ইসলামের মৌলিক নীতি সমূহের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ আয়াতে কাফেরদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ করা হয়েছে, তোমাদের নিকট সত্য দ্বীন এসেছে, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর মাধ্যমে তোমাদেরকে জীবনের সঠিক পথ প্রদর্শন করা হয়েছে। এখন তোমরা নিজেদের পথভ্রষ্টতার জন্যে কোন ওজর-আপত্তি পেশ করতে পারবে না। যদি তোমরা হেদায়েত গ্রহণ কর তবে তোমাদেরই উপকার। আর যদি তোমরা হেদায়েত গ্রহণ না কর তবে তাতে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যারা আল্লাহর পথে চলবে তাদের সাফল্য সুনিশ্চিত, আর যারা পথভ্রষ্ট হবে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। আল্লাহর রসূলের কাজ হল মানুষকে সৎ পথ দেখানো। আর সে কাজ তিনি করেছেন। আল্লাহ পাক রসূলকে সর্বময় কর্তারূপে প্রেরণ করেন না যে, তিনি মানুষকে হেদায়েত গ্রহণে বাধ্য করবেন, বরং রসূল আগমন করেন সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারীরূপে, তাই এরশাদ হয়েছে–

مَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ

"আর আমি তোমাদের কর্মের জন্যে দায়ী নই"।

এর পরবর্তী আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এরশাদ হয়েছেঃ

وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰٓ

(হে রসূল!) কাফেররা যদি সৎ পথে না আসে, আপনার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তবে আপনি মনক্ষুণ্ন হবেন না। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে নির্দেশ আসে তা মেনে চলুন আর কাফেরদের পক্ষ থেকে জুলুম-অত্যাচার করা হলে তাতে সবর অবলম্বন করুন যে পর্যন্ত না আল্লাহ পাক তাদের উপর বিজয় দান করেন, অথবা যে পর্যন্ত আল্লাহ পাক কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদের আদেশ প্রদান করেন এবং মোমেন ও কাফেরদের মধ্যে যে পর্যন্ত আল্লাহ পাক নিস্পত্তি না করে দেন সে পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে আপন কর্তব্য পালন করতে থাকুন।

وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَٰكِمِينَ

তিনি সর্বোত্তম মীমাংসাকারী। তাঁর নির্দেশে কোন ভুল-ভ্রান্তি হয়না, তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব বিষয়েই সম্পূর্ণ অবগত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা হূদ

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত-১২৩, রুকু-২০

سُوْرَةُ هُوْدٍ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ﴿١﴾
اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ ﴿٢﴾ وَّاَنِ
اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ
مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ؕ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ
عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ﴿٣﴾ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ ﴿٤﴾ اَلَآ اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ ؕ اَلَا
حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ ۙ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۚ اِنَّهٗ
عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٥﴾

পরম করুণাময় অনন্ত অসীম করুণাময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

তরজমা

(১) আলিফ লাম রা। এই কিতাব যার আয়াত সমূহ সুস্পষ্ট এবং সুবিন্যস্ত করা হয়েছে এবং পরে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে।

(২) তোমরা আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কারো বন্দেগী করবে না, নিশ্চয় আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে ভয় প্রদর্শক ও সু-সংবাদদাতা।

(৩) আর তোমরা যেন তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁর দিকে মনোনিবেশ কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত উত্তম জীবন উপভোগ করতে দেবেন আর যারা অধিক পরিমাণে নিষ্ঠাবান হবে তাদেরকে বেশী করে

দান করবেন। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে লও তবে আমি তোমাদের জন্যে এক মহা দিনের শাস্তির আশঙ্কা করি।

(৪) আল্লাহ্ পাকের নিকটই তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে। আর তিনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(৫) সাবধান! তারা তাঁর থেকে গোপন রাখার জন্যে তাদের বক্ষ দু' ভাজ করে। সাবধান! তারা যখন নিজেদেরকে পোষাকে আচ্ছাদিত করে তখন তারা যা গোপন করে ও প্রকাশ করে তিনি তা জানেন, তাদের অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে নিশ্চয় তিনি সম্পূর্ণ অবগত।

সূরা হূদ প্রসঙ্গে

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদা (রহঃ) বলেছেন, সূরা হূদ মক্কায় নাযিল হয়েছে, শুধু একখানি আয়াত নাযিল হয়নি। আর তা হল–

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ.

হযরত আবুবকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! কোন্ কারণে আপনার বার্ধক্য এসেছে? তিনি এরশাদ করলেনঃ সূরা হূদ, সূরা ওয়াকেয়াহ, সূরা নাবা এবং সূরা তাকবীর আমাকে বৃদ্ধ করে ফেলেছে।

বায়হাকী শোআবুল ঈমানে আবি আলী আসসতরীর বর্ণনা সংকলন করেছেন। তিনি স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দীদার লাভ করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! বর্ণিত আছে যে, আপনি বলেছেন, সূরা হূদ আমাকে বৃদ্ধ করেছে। সূরা হূদের কোন্ কথাটি আপনাকে বৃদ্ধি করেছে? তিনি এরশাদ করলেনঃ

فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ.

"আপনাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে তার উপর সুদৃঢ় থাকুন"।[১]

তফসীরুল কোরআন

এ সূরার শুরুতেই পবিত্র কোরআনের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নাযিল হয়েছে, একথা ঘোষিত হয়েছে। এরপর পবিত্র কোরআনের নাযিল হওয়ার উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে যে, তোমরা যেন সঠিকভাবে আল্লাহ্ পাকের এবাদত করতে পার।

[১]। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-২০২-০৩
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১১, পৃষ্ঠা-৮৪
তফসীরে ফতহুল কাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৭৯

এরপর একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত এবং তাঁর দায়িত্ব হল মানব জাতিকে সৎ কাজের সু-সংবাদ দেয়া এবং মন্দ কাজের ব্যাপারে সতর্ক করা। এরপর সমগ্র মানব জাতিকে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়ার এবং কৃত অন্যায়ের জন্যে তওবা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আখেরাত তথা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগী এবং কেয়ামতের দিনের হিসাব-নিকাশ, পুরস্কার ও শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, যাতে করে প্রত্যেকটি মানুষ দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের সম্বল সংগ্রহ করতে পারে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

الٓرٰ قف كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ.

আলিফ, লাম, রা। এ অক্ষরগুলোর অর্থ আল্লাহ পাকই জানেন।[১]

كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ.

পবিত্র কোরআনের বৈশিষ্ট্য

এই কিতাব তথা পবিত্র কোরআন অদ্বিতীয় মহান গ্রন্থ, এর প্রতিটি কথা সুস্পষ্ট, সু-পরীক্ষিত, অকাট্য দলিল প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। এ মহান গ্রন্থের প্রতিটি শব্দ, এর অর্থ সম্পূর্ণ নিখূঁত, নির্ভুল, ধ্রুব সত্য। এর প্রতিটি বক্তব্য যুক্তিপূর্ণ। এতে অবান্তর, অযৌক্তিক বা ত্রুটি বলতে কোন কিছুই নেই। এর আয়াত সমূহ সুবিন্যস্ত, ভাষার অলংকারে সু-সজ্জিত, বর্ণনা ধারা বৈশিষ্ট্য মন্ডিত।

آن کلامے زندہ قران حکیم = حکمتش لازوال است وقدیم

حرف اوراریب نی تبدیل نی = معنیش نہ گردو تاویل نی.

পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের মহান জীবন্ত বাণী, পবিত্র কোরআনের তাৎপর্য, মাহাত্ম চিরন্তন। এর প্রতিটি অক্ষর সন্দেহমুক্ত, অপরিবর্তনীয়। এর ভাষা অনুপম, সাবলীল, প্রাঞ্জল, বক্তব্য সুস্পষ্ট, যুক্তিপূর্ণ এবং অকাট্য। কালের আবর্তন-বিবর্তনে তাতে কোন পরিবর্তন হয় না, অথচ পবিত্র কোরআনের প্রতিটি কথা সর্বকালের জন্যে যুগোপযুগী, তত্ত্ব এবং তথ্য-পূর্ণ। তার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পবিত্র কোরআন সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অস্পষ্ট নয়। বিস্তারিত তবে এত সুদীর্ঘ নয় যাতে বাড়তি কিছু থাকে। পবিত্র কোরআনের প্রতিটি কথা বিস্ময়কর, অসাধারণ, অলৌকিক। কেননা, এটি–

مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ.

মহান স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের মহান বাণী যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, মহাজ্ঞানী, যাঁর নিকট পৃথিবীর কোন কিছুই গোপন নেই।

---

[১]। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯৩

পবিত্র কোরআন নাযিল করার উদ্দেশ্য

أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ.

অর্থাৎ তোমরা যেন এক আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কারো এবাদত না কর, শুধু মহান স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকেরই বন্দেগী কর– এ উদ্দেশ্যেই পবিত্র কোরআন নাযিল করা হয়েছে। আর এ লক্ষ্যেই আম্বিয়ায়ে কেরাম প্রেরিত হয়েছেন যুগে যুগে, বিভিন্ন দেশ ও পরিবেশে।

إِنَّنِى لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ.

পবিত্র কোরআনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনার পর যাঁর প্রতি পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে, তাঁর কথা ঘোষণা করা হয়েছে এ আয়াতেঃ "হে মানব জাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্যে ভয় প্রদর্শনকারী এবং সুসংবাদ দাতা"। যারা কুফরী ও নাফরমানিতে লিপ্ত থাকবে, অন্যায় অনাচারের দ্বারা এ সুন্দর বসুন্ধরাকে অসুন্দর করে তুলবে, আমি তাদের জন্যে সতর্ককারী। পক্ষান্তরে, যারা এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনবে, তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামতের জন্যে শোকর গুজার হবে, তাঁর প্রদত্ত জীবন বিধান মেনে চলবে, আমি তাদের জন্যে সুসংবাদদাতা।

وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ.

পবিত্র কোরআন নাযিল করার আরেকটি উদ্দেশ্য হল এই যে, তোমরা তোমাদের কৃত অন্যায়ের জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হও, এরপর তাঁর দিকে মনোনিবেশ কর, তাঁর হুকুম পালনে তৎপর হও, অতীতের অন্যায় অনাচারের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মে সতর্কতা অবলম্বন করা হল বুদ্ধিমানের কাজ। যারা এভাবে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে এবং তাঁর বিধান সমূহ মেনে চলে এবং তাঁর রসূলের মহান আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসরণ করে, তাঁদের জন্যে রয়েছে পরবর্তী বাক্যে সুসংবাদ।

يُمَتِّعْكُم مَّتَٰعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى.

তাদেরকে আল্লাহ পাক দান করবেন এ জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, তারা লাভ করবে এক অনাবিল শান্তিপূর্ণ জীবন। যেহেতু তাদের প্রতিটি কাজই হয় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, যেহেতু তারা যাবতীয় অন্যায় অনাচার পরিহার করে চলে, যেহেতু তারা আল্লাহ পাকের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে, যেহেতু তাদের অন্তরে পরকালীন জিন্দেগীর মহান সাফল্যের কথা বদ্ধমূল থাকে, তাই তাদের অন্তরে কোন সময় কোন ব্যাপারে আক্ষেপ থাকেনা, থাকে প্রশান্তি এবং সন্তুষ্টি।

পাপাচার বিপদের কারণ হয়

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ জীবনে মানুষ কষ্ট পায়, বালা-মুছিবতে গ্রেপ্তার হয় গুনাহর কারণে, তাই যারা গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করে তারা শান্তি পূর্ণ জীবন লাভ করে কেননা, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ.

"তোমাদের কৃতকর্মের পরিণতিতেই আসে তোমাদের উপর বিপদ, আর আল্লাহ্ পাক অনেক গুনাহ্ মাফ করে দেন"। এরপরও কোন কোন গুনাহর শাস্তি স্বরূপ বিপদ আপতিত হয়। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের متاع حسن এর অর্থ হল অদৃষ্টে রাজী থাকা। আল্লাহ্ পাক যাকে যা দিয়েছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকার মধ্যেই রয়েছে শান্তি।

আর যেহেতু প্রত্যেকটি মানুষের জীবনের সময় নির্দিষ্ট, মৃত্যুর সময় নির্ধারিত, তাই আলোচ্য আয়াতের اجل مسمى এর অর্থ হলো, মৃত্যুকাল পর্যন্ত অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের বিধান মেনে জীবন-যাপন করবে, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ জীবন দান করবেন, আমৃত্যু তারা এ সুখ ভোগ করবে।

وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِىْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ.

"আর যারা অধিক পরিমাণে নেক আমল করে তাদেরকে অধিক পরিমাণে সওয়াব দান করা হবে"।

তফসীরকারগণ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অন্বেষণকারী, যারা থাকেন সাধনায় রত, তাদের সওয়াব বা শুভ পরিণতি হবে তাদের সাধনা মোতাবেক। মূলতঃ যেভাবে তাকওয়া পরহেযগারী এবাদত বন্দেগীর কোন সীমা নেই, ঠিক তেমনি আখেরাতের মর্তবার ব্যাপারেও কোন সীমা নির্দিষ্ট নেই। এ পথে যে যতখানি উন্নতি করবে, আখেরাতে সে ততখানিই উচ্চ মর্তবা লাভ করবে।[১]

বর্ণিত আছে যে, হযরত ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ৪০ বছর যাবত এশার নামাযের অজু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করেছেন। হযরত সাঈদ এবনুল মুসায়্যেব (রঃ) পঞ্চাশ বছর যাবত এশার নামাযের অজু দ্বারা ফজরের নামায পড়েছেন। হযরত ওসমান (রাঃ) এশার নামাযের পর থেকে ফজর পর্যন্ত কোরআন শরীফ এক খতম করতেন। হযরত শাহ আফাক (রঃ) প্রতিদিন পঞ্চাশ হাজার বার কলেমায়ে তৈয়্যেবা পাঠ করতেন, এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে এজামের জীবনের অনেক ঘটনা আছে, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আধ্যাত্মিক সাধনায়, এবাদত বন্দেগীতে বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁরা চরম ও পরম উন্নতি সাধন করেছেন। তাই আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের সাধনায় যে যত উন্নতি করবে, আল্লাহ্ পাক তার মর্তবা তত বৃদ্ধি করবেন।

---

[১]। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৫০

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হল আল্লাহর সন্তুষ্টির সাধনায় যে যত বেশী সচেষ্ট হবে, আল্লাহ পাক তাকে তত বেশী তওফিক দান করবেন। সে লাভ করবে মনের শান্তি, আল্লাহর স্মরণের স্বাদ, সৌভাগ্য, আখেরাতে তার নছীব হবে বুলন্দ, অধিক পরিমাণে সওয়াব, সবার উপরে সে আল্লাহ পাকের অধিকতর নৈকট্য লাভে হবে ধন্য।[১]

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّىٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ.

কিন্তু যদি তোমরা আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য থেকে বিমুখ হও, তবে আমি তোমাদেরকে এক অত্যন্ত কঠিন দিনের আযাব সম্পর্কে সতর্ক করছি। সেদিন হল কেয়ামতের দিন যার পরিমাণ হবে দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। আর কাফেরদের শাস্তি হবে চিরদিনের জন্যে। যারা দুনিয়াতে আল্লাহর অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হবে, আখেরাতে তারা অন্ধ হয়ে উঠবে, পবিত্র কোরআনেই রয়েছে এর ঘোষণা।

وَمَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى.

যে দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের বিধান সম্পর্কে, তাঁর অগণিত নেয়ামত সমূহ এবং তাঁর বিস্ময়কর কুদরত হেকমত সম্পর্কে চক্ষু বন্ধ করে রাখবে তথা অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয়ে জীবন-যাপন করবে, আখেরাতে সে অন্ধ হয়ে উঠবে।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, যে দুনিয়ার মায়া মোহে মুগ্ধ মত্ত হয়ে জীবন অতিবাহিত করে, আল্লাহর অবাধ্য নাফরমান হয়ে জীবন-যাপন করে, আখেরাতের জীবন সম্পর্কে থাকে উদাসীন, সে মৃত্যুর পর দুনিয়ার যথাসর্বস্ব থেকে হয় বঞ্চিত, আর আখেরাতের কোন নেয়ামতের সে সুগন্ধও পায়না, কঠিন কঠোর শাস্তিই হয় তার প্রাপ্য। আলোচ্য আয়াতে একথাই ঘোষণা করা হয়েছে।[২]

এজন্যে পরবর্তী বাক্যে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এরশাদ হয়েছেঃ

اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

আল্লাহ পাকের নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে অর্থাৎ দুনিয়ার এ জীবন যত চিত্তাকর্ষকই হোক না কেন, অবশেষে তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হতেই হবে এবং তোমাদের কৃতকর্মের পুরস্কার অথবা শাস্তি তোমাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। যে কোন স্থানে দুনিয়া বা আখেরাতে কাফেরদের শাস্তি বিধানে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম। এ আয়াত সম্পর্কে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ এ আয়াতে অবাধ্য অকৃতজ্ঞ লোকদের জন্যে রয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী এ মর্মে যে, আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সর্ব বিষয়ে তিনি সর্বশক্তিমান। অতএব, যারা এ জীবনে অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকে অবশেষে মৃত্যুর পর তাদের অবস্থা হবে

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৯

[২]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-১৮৩

অত্যন্ত শোচনীয় এবং তারা ভোগ করবে কঠোর শাস্তি। এর পাশাপাশি এ আয়াতে বিশেষ সুসংবাদ রয়েছে মোমেনদের জন্যে যে, আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে মহান পুরস্কার দান করবেন, তাঁর ইচ্ছা কার্যকর হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার বাধা থাকবে না।[১]

اَلَآ اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ

"হুশিয়ার! তারা তাঁর নিকট গোপন রাখার জন্যে তাদের বক্ষকে দ্বিভাজ করে"।

اَلَا حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ.

হুশিয়ার, তারা যখন নিজেদেরকে পোষাকে আচ্ছাদিত করে তখন তারা যা গোপন করে ও প্রকাশ করে, তা তিনি সবই জানেন। নিশ্চয় আল্লাহ পাক অন্তর সমূহের গোপন বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

শানে নুযুল

বোখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে যে, মুসলমানদের মধ্যে কিছু লোক অত্যন্ত বেশী লজ্জার কারণে শৌচক্রিয়া এবং স্ত্রী মিলনের সময় পোষাক অপসারণে অত্যন্ত বেশী অসুবিধা অনুভব করতেন। তাঁরা লজ্জা ঢাকার জন্য নিজেদের বুক দু'ভাজ করে রাখতেন। তাঁরা মনে করতেন আর কেউ না দেখলেও আল্লাহ পাকতো দেখছেন। তাঁদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। তাঁদের এ আচরণ মানুষের জন্য অত্যধিক কষ্টকর হতে পারে, এজন্যে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, তোমরা পোষাক পরিধান করে থাক বা নাই থাক তোমাদের বাইরের কোন আচরণ হোক অথবা তোমাদের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে গোপন কোন কথা হোক, আল্লাহ পাকের দরবারে কোন কিছুই অজানা নয়। অতএব, এ সম্পর্কে কোন প্রকার বাড়াবাড়ি করার কোন যুক্তি নেই।

এবনে জরীর, এবনুল মুনজের, এবনে আবি হাতেম, আবুশ শেখ, এবনে মরদবিয়া মোহাম্মদ এবনে এবাদ এবনে জাফরের সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত আখনাছ এবনে সোরায়েক সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এ ব্যক্তি অত্যন্ত সু-পুরুষ এবং মধুর কণ্ঠী ছিল। যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হতো তখন সে এমন কথা বলতো যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পছন্দ করতেন কিন্তু তার অন্তরে শত্রুতা থাকতো লুক্কায়িত। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

---

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-১০, পৃষ্ঠা ১৮৪

يَثْنُونَ صُدُوْرَهُمْ.

তারা তাদের বক্ষের গিলাফে কুফরী ও নাফরমানী এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি হিংসা এবং শত্রুতা গোপন করে রাখতো। কিন্তু আল্লাহ পাকের নিকট যে কোন কিছুই গোপন থাকে না।

اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ.

"তিনি মানুষের মনের সকল গোপন কথা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত"।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে আরো একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মুশরেকরা বলতো আমরা যখন ঘরের দরজা বন্ধ করি এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে কোন কথাবার্তা বলি, বাইরে এ সম্পর্কে কোন কথা আমরা বলি না। এতদসত্ত্বেও কে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দেয় তখন এ আয়াত নাযিল হয়। এতে এ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয় যে, তোমরা যত গোপন ষড়যন্ত্রই কর না কেন আল্লাহ পাক সবই জানেন, সবই দেখেন। তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই।[২]

সুফী সাধকগণ বলেছেনঃ যদি কোন মানুষ আলোচ্য আয়াতের মোরাকেবা করে তথা সর্বদা একথা মনে রাখে যে সব কিছু আল্লাহ পাক দেখছেন, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত তবে সে পাপাচারে লিপ্ত হতে সাহস করবে না আর তাকওয়া পরহেযগারীর মূল কথাই হলো এ সত্য সর্বদা মনে রাখা যে, আল্লাহ পাক সব কিছু দেখেন, সব কিছুই শোনেন, তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই।

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ১৮ জুন ১৯৯১ মোতাবেক ৫ই জিলহজ্ব ১৪১১ হিজরী রোজ মঙ্গলবার রাত ১২ টায় তফসীরে নূরুল কোরআনের একাদশ খন্ডের রচনা সমাপ্ত হলো।

হে আল্লাহ! কবুল কর, তোমার তওফিক ব্যতীত কোন কিছুই সম্ভব নয়। এ মহান তফসীর গ্রন্থ সম্পূর্ণ করার তওফিক দান কর এবং কবুল কর। আমীন।

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৯-২০

[২]। তফসীরে কবীর খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-১৭৫
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (র) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫১৮